184 2/171

সাধন-সমর

বা

দেবীমাহাত্ম্য

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ

LIBRARY
No.......
Shri Shri Ma A...
BANARAS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I
No. ~~2/19~~ 1/87
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

18.5.76
5-8-76
7.11.76

সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য

(শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় খণ্ড

মহিষাসুরবধ—বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ

—:*:—

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

অষ্টম সংস্করণ

PRESENTED

মাতৃচরণাশ্রিত
শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সাধন-সমর কার্য্যালয়
২০১/বি, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭
সন ১৩৭৮ সাল

সর্ব্বস্বত্ব গ্রন্থকারের সংরক্ষিত

মূল্য দশ টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

পরম মঙ্গলময়ী মায়ের যে মহতী ইচ্ছা, "ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের" পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে এতদিন আকুল আগ্রহরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, এই "বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ" সেই আগ্রহেরই সফলতাময় পরিণাম। যাঁহার কৃপায় এই গ্রন্থ এত শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, যাঁহার কৃপায় অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম সাধনমার্গগুলি দিন দিন প্রাণময় সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল ও সুগম হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার কৃপায় বহুসংখ্যক হতাশ প্রাণ সাধকের প্রাণে অভিনব আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে, তাঁহার সেই আমাদের একান্ত আশ্রয়-রূপিণী বিজ্ঞানময়ী মায়ের চরণে কোটি প্রণিপাত।

অতঃপর সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আমাদের অনবধানতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে, গ্রন্থে যে সকল অপরিহার্য ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে, তাহা ক্ষমার দৃষ্টিতে সহ্য করিবেন। আন্তরিক সহানুভূতি পাইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে উহার সংশোধনে যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি হইবে না। ইতি—

মাতৃচরণাশ্রিত
দীন-সন্তান
শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত

দশহরা, ১৮৪৪ শকাব্দা।
১৩২৯ সাল, ২১শে জ্যৈষ্ঠ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ ছিল, তাহা এই সংস্করণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনও কিছু কিছু হইয়াছে, তথাপি যে সকল ত্রুটি পাঠক মহোদয়গণের নিকট পরিলক্ষিত হইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে পুন সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে। ইতি।

শকাব্দা ১৮৪৮, ১৩৩৩ সাল
রাস পূর্ণিমা

বিনয়াবনত কার্য্যাধ্যক্ষ
সাধন সমর আশ্রম

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই অমৃতবর্ষী গ্রন্থের যিনি লেখক, তাঁহার পবিত্র নামটী জানিবার যে আগ্রহ পাঠকবৃন্দের অন্তরে পরিপুষ্ট ছিল, তাহা এতদিন আমরা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আজ তিনি লৌকিক চক্ষুর অন্তরালস্থ হইলেও, তাঁহার এই দান, তাঁহার এ আশীর্ব্বাদ, তাঁহার অন্তর, ভক্তিমান পাঠকবৃন্দের নিকট সুপ্রতিভাত, সুতরাং তিনি একান্ত অপরিচিত নহেন। তথাপি সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ বশতঃ এই সংস্করণে আমরা তাঁহার নামটী প্রকাশ করিলাম। ইতি—

শকাব্দা ১৮৫৪, ১৩৩৯ সাল।
চতুর্থ সংস্করণ
শকাব্দা ১৮৬১, ১৩৪৬ সাল।
পঞ্চম সংস্করণ
দ্বিষষ্ঠীতম সত্যাব্দ, ১৩৫২ সাল।
ষষ্ঠ সংস্করণ
নবষষ্ঠীতম সত্যাব্দ
মহাষ্টমী, সন ১৩৫৯ সাল।
সপ্তম সংস্করণ
ষষ্ঠসপ্ততিতম সত্যাব্দ
অক্ষয় তৃতীয়া
সন ১৩৬৭ সাল।

বিনয়াবনত
কার্য্যাধ্যক্ষ
সাধন-সমর কার্য্যালয়

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছায় বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদের অষ্টম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। মুদ্রণের দোষত্রুটী যথাসাধ্য সংশোধন করা সত্ত্বেও অনবধানতা-বশতঃ যাহা রহিয়া গেল, তাহা মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

অষ্টাশীতিতম সত্যাব্দ
ভৈমী একাদশী সন ১৩৭৮ সাল।
২০১বি, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭

বিনয়াবনত
কার্য্যাধ্যক্ষ
সাধন-সমর কার্য্যালয়

মুদ্রাকর :
তারা প্রেস
শ্রীজানকীনাথ চক্রবর্ত্তী
৪৪নং সুধীর চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—
সাধন-সমর আশ্রম
বরানগর :: কলিকাতা—৩৬

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

গুরো! বহুরূপধারী নারায়ণ-মূর্ত্তি তোমার সেবার জন্য এ আয়োজন তোমারই। তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও! একবার এই জড়ত্বের ভাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চৈতন্যময়—প্রাণময় স্বরূপে উদ্ভাসিত হও। জগৎ হইতে জড়ত্বের ধাঁধা অবসিত হউক। সেবকের আশা, পূর্ণ হউক!

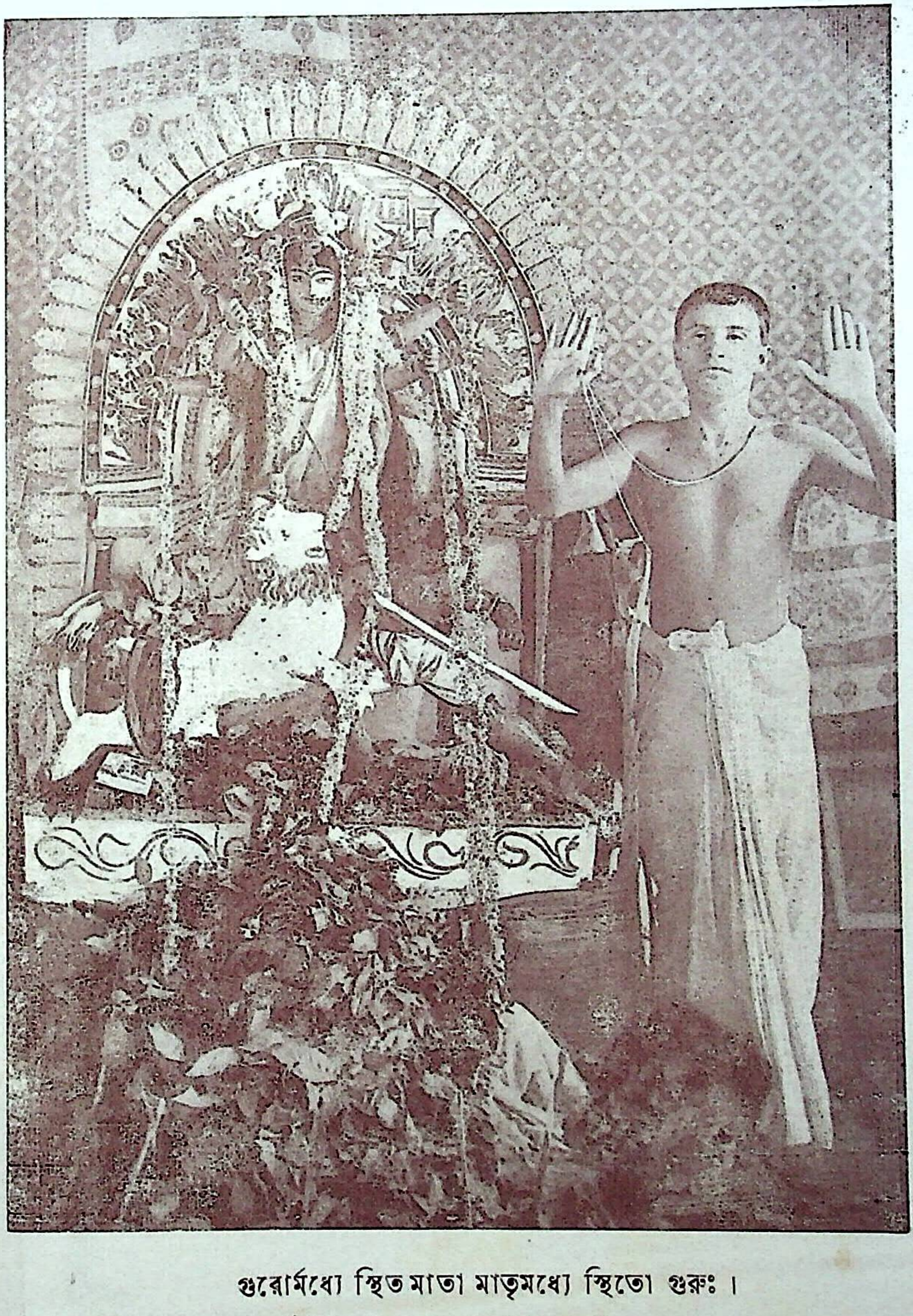

গুরোর্মধ্যে স্থিত মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ ।
গুরুর্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম্ ॥

LIBRARY
No. ....২৯১.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

৪৩১

মাতৃ-স্নেহ—উত্থান

—✻•✻—

PRESENTED

জানন্তু বিশ্বে অমৃতস্য সত্তাঃ।

স্নেহের সন্তান! সত্যের মঙ্গল আহ্বান তোমার কর্ণে পৌঁছিয়াছে? নিদ্রালস-নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া দূরাগত সত্যের আলোকরেখা দেখিতে পাইতেছ? বহু জন্ম জন্মান্তরের মোহনিদ্রা মায়ের আমার স্নেহ-শীতল করস্পর্শে বিদূরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে? জাগিয়াছ, উঠিতে পার নাই? নিদ্রার জড়তা এখনও দূর হয় নাই? তা হউক—বৎস! ঐ নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে অবস্থান করিয়াই উৎকর্ণ হইয়া থাক। অবিশ্রান্ত মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিতে থাক। আকর্ষণময় সে আহ্বান নিশ্চয়ই তোমাকে উঠাইবে—আহ্বান লক্ষ্যে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে। তোমার অনাদিকালের জড়তা বিদূরিত হইবে। শুধু একটু ব্যাকুলতা নিয়া শ্রবণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখ। যিনি তোমায় জাগাইয়াছেন, তিনিই তোমায় উঠিবার শক্তি দিবেন, তিনিই তোমার প্রাণে আকুলতা আনিয়া দিবেন। সে আকুলতার প্রবল আকর্ষণে, তোমাকে বিষয়রূপ কূল পরিত্যাগ করিয়া আমার দিকে—মায়ের দিকে ধাবিত হইতেই হইবে।

হায়! স্বেচ্ছাকল্পিত মোহমদিরামত্ত পুত্রগণ! তোমরা জড়ত্বের সংস্পর্শে যে সুখের আভসমাত্র ভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, মায়ের কোলে বসিয়া মাতৃ-লীলাদর্শনে, ইহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক—ভূমাসুখের অনুভূতি পাইবে, অমৃতময় মাতৃ-স্নেহ-ধারায় অভিষিক্ত হইবে, মায়ের আদরে আত্মহারা হইবে।

তাই বারংবার ডাকিতেছি,—এস সন্তান! এস অমৃতের পুত্রগণ! যদি জাগিয়াছ, যদি জগৎকে সত্যেরই মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়াছ, যদি জড়কে চিন্ময়রূপে আদর করিতে শিখিয়াছ, যদি সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তা দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, তবে এস, উঠিয়া দাঁড়াও! আমার দিকে তাকাও, দেখ অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রতিনিয়ত আমারই আরতি করিতেছে। অগণিত বিশ্ব আমারই অঙ্গে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শোভা পাইতেছে। অগণিত জীব কোন্ অনাদিকাল হইতে আমারই পূজার অর্ঘ্যসম্ভার মস্তকে বহন করিয়া ছুটিতেছে। দেখ—এ ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে প্রতি পরমাণু আমারই উদ্দেশ্যে প্রাণাহুতি অর্পণ করিতেছে। উদ্দেশ্য—আত্মনিবেদন। উদ্দেশ্য—একবারমাত্র আমাকে দেখিয়া 'আমি'ময় হওয়া।

রে বিন্দু বিন্দু প্রাণ আমার! আর কতদিন বিক্ষিপ্তভাবে থাকিয়া, সুখ দুঃখের জন্য মৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইবে? আয় আয় ছুটিয়া মহাপ্রাণ-সমুদ্রের অভিমুখে। ভয় নাই! আপনাকে হারাইবে না। আপনাকেই পাইবে। এখন যেটুকু পাইয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, উহা দুঃখমিশ্রিত, অতি অকিঞ্চিৎকর। উহাতে ইচ্ছার অভিঘাত আছে, অনভিলষিতের প্রাপ্তি আছে, জন্ম মৃত্যুর তাড়না আছে, রোগ শোকের অত্যাচার আছে। আর এখানে—কিছু নাই, অথচ সব আছে। পূর্ণ আনন্দ, কেবল অমৃত' কেবল স্নেহ—অফুরন্ত মাতৃ-করুণার ধারা। আর আছে—অব্যয় অচল জীবন—মহাসত্য।

পুত্রগণ! সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; এইবার চৈতন্যে—প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমাদের শিরে শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

———

মধ্যম চরিত

—ঃ●ঃ—

ঋষিচ্ছন্দঃ—উপোদ্‌ঘাত

মধ্যমচরিত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষির্মহালক্ষ্মীর্দেবতা
উষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তিঃ দুর্গা বীজং বায়ুস্তত্ত্বং
যজুর্ব্বেদস্বরূপং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগ।

—ঃ●ঃ—

মধ্যম-চরিত—মহিষাসুরবধ। ইহার ঋষি বিষ্ণু। যে সমষ্টি প্রাণ কর্ত্তৃক এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড পরিধৃত রহিয়াছে, তিনিই বিষ্ণু। রজোগুণের বহির্মুখ বিক্ষেপরূপ মহিষাসুর, এই মহাপ্রাণের অঙ্কেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাই বিষ্ণুই এই মধ্যমচরিতের দ্রষ্টা বা ঋষি। মহালক্ষ্মী দেবতা। লক্ষ্মী—প্রাণশক্তিরই অপর নাম। যতদিন দেহে প্রাণশক্তি বিরাজিত থাকেন, ততদিনই আমাদের নামের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর অপর পর্য্যায় শ্রীশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যষ্টি প্রাণশক্তির নাম লক্ষ্মী, এবং সমষ্টি প্রাণশক্তিই মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত। ইনিই পরাপ্রকৃতির রজোগুণাত্মিকা মহতীশক্তি। ইহাই রজোগুণের আত্মাভিমুখী ক্রিয়াশীলতা। বিষয়াসক্তিরূপ বিক্ষেপ ইহা দ্বারা নিহত হয়; তাই মহালক্ষ্মীই মধ্যমচরিতের দেবতা।

উষ্ণিক ইহার ছন্দঃ। এই চরিতে প্রবিষ্ট সাধকের প্রাণ প্রবাহ বা প্রাণায়াম, উষ্ণিক্ নামক বৈদিকচ্ছন্দের অনুরূপ স্পন্দনযুক্ত হইয়া থাকে। শাকম্ভরী শক্তি। শাকম্ভরী রহস্য পরে তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ-ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। দুর্গা বীজ। দুর্গা শব্দের উত্তর হননার্থক আ

ধাতু হইতে দুর্গাশব্দ নিষ্পন্ন। যিনি যাবতীয় দুর্গতি হরণ করেন, তিনিই দুর্গা। মহিষাসুর নিহত হইলেই, মানবের দুর্গতির অবসান হয়। দুর্গতিহরণই এই মধ্যম চরিতের বীজ বা মুল কারণ।

বায়ু তত্ত্ব। প্রাণশক্তি যখন স্থূলতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বায়ুরূপেই ইহার অভিব্যক্তি হয়। শ্বাস প্রশ্বাসই প্রাণের বহির্লক্ষণ তাই বায়ু ইহার তত্ত্ব।

যজুর্ব্বেদ স্বরূপ। বায়ুতত্ত্বের বেদন বা অনুভূতি হইতেই যজুর্ব্বেদরূপ আজানিক শব্দরাশি প্রাদুর্ভূত হয়। তাই বায়ুদেবতার মন্ত্রই যজুর্ব্বেদের প্রথম আরম্ভ। মহালক্ষ্মীর প্রীতি অর্থাৎ মহাপ্রাণময়ী মায়ের প্রতি মহতী প্রীতিলাভ উদ্দেশ্যেই ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

———

LIBRARY
No....1/8.7...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য

———*○*———

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ—মহিষাসুর বধ

ঋষিরুবাচ।

দেবাসুরমভুদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতংপুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন, তখন পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে—আগামি-কর্ম্মের বীজ ধ্বংস হইয়াছে। সাধক এখন আর নিত্য নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে—দেহে অবস্থান করিলে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়, তাই আসক্তিশূন্য হইয়া যথাসম্ভব উপস্থিত কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে। কর্ম্মের সফলতায়

বিশেষ উল্লাস নাই, নিষ্ফলতায়ও কোনরূপ হা হুতাশ নাই। সাধকের এইরূপ অবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয় ও সৌভাগ্যের ফল বটে; কিন্তু যে মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থানের আশায়—যে জীবভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিবার আশায়, সমাধি-সহায় সুরথরূপী জীবাত্মা বিজ্ঞানময়গুরু মেধসের কৃপা-প্রয়াসী হইয়াছিল, এখনও সে আশা পূর্ণ হয় নাই; কারণ প্রজ্ঞা-চক্ষু যতই উন্মীলিত হইতে থাকে, অজ্ঞান অন্ধকার ধীরে ধীরে যতই অপসারিত হইতে থাকে, ততই সাধক স্বকীয় অলক্ষিত দোষরাশি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়। যেরূপ অতিশয় মলিন বস্ত্রে কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে তাহা লক্ষ্য করা যায় না; কিন্তু সেই বস্ত্রখানা যতই পরিষ্কৃত হইতে থাকে, পূর্ব্বের অদৃশ্যপ্রায় চিহ্নগুলি যেন ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, সেইরূপ যতদিন জীব অজ্ঞানান্ধ থাকে, ততদিন নিজের দোষগুলি দেখিতে পায় না। তারপর যখন শ্রীগুরু-কৃপায় জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন সে নিজের অব্যক্ত দোষসমূহের প্রকট প্রকাশ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়।

পরমাত্মামুখী—মাতৃ-অঙ্ক-প্রয়াসী জীব প্রথমে মনে করে—"স্ত্রী-পুত্রাদি সংসার বন্ধনই পরমাত্ম-লাভের একমাত্র অন্তরায়। সংসার আশ্রম পরিত্যাগ না করিলে, আর কিছুতেই এ বন্ধনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই," কিন্তু শ্রীগুরু যখন চক্ষে অঙ্গুলিপ্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দেন যে, স্ত্রীপুত্রাদি সংসারই বন্ধন নহে, অন্তরের সংস্কাররাশিই যথার্থ বন্ধন। সংসার অন্তরেই অবস্থিত। যতই নিভৃত স্থানে পর্ব্বতকন্দরে অবস্থান করা যাউক না কেন, কিছুতেই সংসার ছাড়ে না। সাধক যখন মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা অনুভব করিয়া সংসারের মূল উৎপাটন করিতে যত্নবান্ হয়, তখন জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে গুরুকৃপায় সুপ্তপ্রায় প্রাণশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া, আগামি কর্ম্মের বীজরূপী মধুকৈটভকে নিধন করে। সংসার-মহামহীরুহের একটী-মূল উৎপাটিত হয়। কিন্তু অপর দুইটী মূল আরও গভীরভাবে প্রোথিত থাকায়, উহা সহসা উন্মূলিত হয় না।

সাধক! তুমি মা মা বলিয়া যতই আকুলপ্রাণে মায়ের কোলে উঠিবার জন্য অগ্রসর হও, চতুরা ছলনাময়ী মা ততই যেন একটু একটু করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। কিছুতেই তাঁহাতে একেবারে আত্মহারা হওয়া যায় না, কিছুতেই সবটা প্রাণ মহাপ্রাণময়ী মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া বহুত্বের—চঞ্চলতার হাত হইতে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারা যায় না। মাও যেন তাঁহার স্নেহময় আলিঙ্গনে সন্তানকে চিরতরে বক্ষে বাঁধিয়া রাখেন না। একবার একবার কোলে তুলিয়া আবার ছাড়িয়া দেন! মা তাঁহার পূর্ণ আকর্ষণময় প্রজ্ঞা-চক্ষুতে জীবের চক্ষু চিরতরে মিলাইয়া লয়েন না। কেন এরূপ হয়? দুর্জ্জয় অসুর মধুকৈটভ নিহত হইয়াছে, অভিনব আশার মূল উৎপাটিত হইয়াছে; তথাপি কেন আমি মাতৃ-বক্ষে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে পারি না? এইরূপ ভাবের দ্বারা সাধক যখন উৎপীড়িত হয়; ইহার কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া গুরুর চরণে শরণাপন্ন হয়, তখন বিজ্ঞানময় গুরু সাধকের সম্মুখে যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেন, তাহাই মহিষাসুর-বধ বা বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদ নামে ব্যাখ্যাত হইবে।

মধুকৈটভ-বধের অবসানে মহর্ষি মেধস্‌ সুরথকে বলিয়াছিলেন, "ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে"। তিনি জানিতেন—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, মধুকৈটভ-বধে দেবীর যে মহত্ত্ব দর্শিত হইল, তাহাতে সুরথের আশা সম্পূর্ণ মিটিবে না; জীবত্বের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিতেও আশার একান্ত অবসান হয় না, জীব যতদিন পূর্ণভাবে ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে না পারে, যতদিন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন এ আশার নিবৃত্তি হয় না। ইহা বুঝিতে পারিয়াই শিষ্যকে জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া অন্তর্যামী বিজ্ঞানময় গুরু আবার বলিতে থাকেন। তাই অধ্যায়ের প্রথমেই "ঋষিরুবাচ" উল্লিখিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হে বৎস সুরথ! তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইলেও সঞ্চিত কর্ম্ম এখনও বিধ্বস্ত হয় নাই। উহারা যে বহুত্ব বিষয়ক ফল প্রসব করিবে, তাহার কোন প্রতীকার করা হয় নাই। তুমি নূতন আর কিছু নাই বা চাহিলে, নিত্য নিত্য

নূতন বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় নাই বা ছুটিলে, অভিনব আশার মোহিনী মূর্ত্তি তোমায় অভিভূত নাই বা করিল ; কিন্তু তুমি যে বহুত্ব চাহিয়া আসিয়াছ, বহুদিন বহুজন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যে অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তাহারা যে পুঞ্জীভূত বহুত্বের সংস্কাররূপে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া, তোমার চিত্তক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে। চাহিয়া দেখ—তোমার সঞ্চিত সংস্কাররাশি এখনও অক্ষুন্নভাবে স্বাধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে বিধ্বস্ত না করিলে তোমার নিরবচ্ছিন্ন ভূমাসুখের আশা নাই। কিন্তু ভয় নাই বৎস, আমি তোমার মা, গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি ; এখন স্বয়ং অসি হস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার যাবতীয় সংস্কার বিলয় করিয়া দিব। তুমি শুধু আমারই অঙ্কে অবস্থান করিয়া, একাগ্র হৃদয়ে আমার কর্ম্মশৃঙ্খলা—আমার অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া যাও। মুগ্ধ সন্তান! ভীত সন্ত্রস্ত পুত্র! যখন মা বলিয়া ডাকিয়াছ, যখন আমাকেই একান্ত আশ্রয় বলিয়া বুঝিয়াছ, আমার মহাপ্রাণে তোমার প্রাণ মিলাইয়া লইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিয়াছ, তখন আর ভয় নাই। আমি তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরতরে আমারই অঙ্গে মিলাইয়া লইব। তুমি ধন্য হইবে।

ভাবিও না জীব, ইহা শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস—ভাষার ঝঙ্কার মাত্র। সত্য সত্যই তুমি একবার সরলপ্রাণে মা বলিয়া ডাক, সত্য সত্যই তুমি আমাকে তোমার একান্ত আশ্রয় বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর, দেখিবে তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। আমি তোমার সকল সাধনা, সকল বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইব। তুমি সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার আনন্দময় নগ্ন শিশুর ন্যায় আমারই স্নেহময় অঙ্কে অবস্থান করিয়া, দ্রষ্টা বা সাক্ষিমাত্র-স্বরূপে অবস্থান করিবে। তোমার আধারের কল্পিত অপবিত্রতা আমিই পবিত্র করিয়া দিব। তোমার জন্ম-জীবন পুণ্যময় হইবে।

এই মধ্যম চরিত্রে পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার সমূহই অসুর রূপে

বর্ণিত হইবে। জীব বহুজন্মব্যাপী নানাবিধ বৈধ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে, কিংবা যোগ তপস্যাদির সাহায্যে, অথবা জ্ঞান ভক্তির অনুশীলনে পরমাত্ম বিষয়ক সংস্কারসমূহ সঞ্চয় করে। উহারাই দেবতা, অর্থাৎ —মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের যে পরমাত্মাভিমুখী গতি বা মিলন প্রয়াস, উহাই দেব-শক্তি নামে অভিহিত। আর উক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে বিষায়াভিমুখী লালসা, উহারাই সুরবিরোধী অর্থাৎ অসুর নামে কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান্ যে দেবাসুর সম্পদ্ বিভাগ করিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া আবশ্যক। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানের উপায়ে একান্ত নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, নির্লোভ, মৃদুতা, লজ্জা, ধীরতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অদ্রোহ, এবং নিরভিমান, এই সকল দেবতাদের সম্পদ্, অর্থাৎ দেবশক্তির কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং ইহার বিপরীতগুলি অর্থাৎ ভয়, অশুদ্ধি প্রভৃতি এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান, এই সকল আসুর সম্পদ্ বা অসুর শক্তির কার্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে"। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যব্যাখায় বলিয়াছেন,—"দেবা দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ, সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। শাস্ত্রীয়প্রকাশ বৃত্ত্যভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্ত-য়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়-বিবেক-জ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিক-তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ, ইত্যন্যোঽন্যাভি-ভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদি-কালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য—"জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল হইতে দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে। শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই দেবতা, আর

তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বৃত্তি সকল অস্থর। উভয় পক্ষেই পরস্পরের বিষয় অপহরণে সমুদ্যত হইয়া নিয়ত-সংগ্রাম করিতেছে। প্রাণিগণের শরীরে উভয়বিধ বৃত্তিই আছে। শাস্ত্রজ্ঞান জন্য পরমাত্মবিষয়ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয়ভোগবাসনারূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই উভয়বৃত্তিরই দ্বেষ্য-দ্বেষকভাব অনাদিসিদ্ধ।" এইরূপে আমরা গীতা উপনিষদ্ এবং জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে দেবাস্থর ও তাহাদের পরস্পর সংগ্রাম-রহস্য অবগত হইয়া দেবীমাহাত্ম্যে অবগাহন করিব। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্রে যদিও দেবাস্থর প্রভৃতির এইরূপ আধ্যাত্মিক রহস্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ দুই শ্রেণীর প্রাণী যে থাকিতে পারে না, এ প্রকার ধারণা করিবারও কোন হেতু নাই। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিনিই সমান সত্য। এ সকল কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে।

যখন মহিষ নামে অস্থর অস্থরগণের রাজা এবং পুরন্দর দেবগণের রাজা অর্থাৎ ইন্দ্র ছিলেন, তখনই এই দেবাস্থর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল।

মহিষাস্থর—রজোগুণ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ" কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। আবার অন্যত্র মানসপূজা-বিধানেও কথিত আছে—"ক্রোধঞ্চ মহিষং দদ্যাৎ" অর্থাৎ ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করিবে। যদিও এস্থলে কেবল ক্রোধকেই মহিষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি আমরা মহিষ শব্দে কেবলমাত্র ক্রোধকে না বুঝিয়া, যাহা হইতে ক্রোধের অভিব্যক্তি, সেই রজোগুণকেই মহিষাস্থর বুঝিয়া লইব। বাস্তবিক চণ্ডীর তিনটী রহস্য গুণত্রয়ের বিশ্লেষণ মাত্র। প্রথম চরিত্রে সত্ত্বগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কারদ্বয় মধুকৈটভ নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চরিত্রে রজোগুণের বহির্মুখী বিকাশ জন্য যে সঞ্চিত বহুত্ব-সংস্কার, তাহাই অস্থরবৃন্দরূপে বর্ণিত হইবে। "এক আমি বহুভাবে

প্রকাশ হইব,” এই ভাবটি বিদূরিত হইয়াছে; কিন্তু যে বহুত্ব আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছি, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বহুত্ব-বিষয়ক সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা ত দূরীভূত হয় নাই, তাহাই এই মধ্যম চরিত্রে বর্ণিত অসুরনিকর। রজোগুণ হইতে ইহাদের অভিব্যক্তি হয়, যাবতীয় কামনা বাসনা এবং ভগবদ্‌গীতোক্ত দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি যাবতীয় অসুর-সম্পদ এই রজোগুণেরই স্থূল বিকাশমাত্র। তাই রজোগুণরূপী মহিষাসুর ইহাদের অধিপতি।

আবার অন্যদিকে রজোগুণের অন্তর্মুখী বিকাশসমূহই দেবতা। পুরন্দর ইহাদের অধিপতি। পুরকে যিনি বিদারণ বা ধ্বংস করেন, তাহাকেই পুরন্দর কহে। এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ পুরকে বিদীর্ণ করিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবোধ বিলয় করিয়া দেহত্রয়াতীত অবস্থাত্রয়াতীত গুণত্রয়াতীত পরমাত্মসত্তায়—মাতৃ-অঙ্গে, সম্যক্ মিলিত হইবার জন্য যে প্রয়াস তাহাই পুরন্দর নামে অভিহিত। ইনি দেবগণের অধিপতি। সমস্ত দেবশক্তি, অর্থাৎ অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি ইহারই অনুবর্ত্তন করে। যাবতীয় দেবভাব এই পুরন্দরের আজ্ঞানুবর্ত্তী।

এস্থলে ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। মনে কর বিশুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন পরমাত্মসত্তায় একটি অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান রহিয়াছে। ঐ অজ্ঞানের স্বরূপ— “আমাকে আমি জানি না।” এই অজ্ঞানটীও কিন্তু জ্ঞানবক্ষেই বিদ্যমান; কারণ “জানি না” এই যে অজ্ঞান, ইহাও বস্তুতঃ একটী জ্ঞান মাত্র। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ অপূর্ব্ব মিলনকেই মায়া বা লীলা বা পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ বলা হয়। জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ, তিনি যদি মনে করেন, “আমি জানি না,” তাহা হইলে সে মনে করাকে লীলাই বলিতে হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক পিতা যেরূপ স্বকীয় জ্ঞান-গৌরব বিস্মৃত না হইয়াও শিশু পুত্রের সহিত বালকের ন্যায় খেলা করিয়া নির্ম্মল আনন্দভোগ করেন, ইহাও ঠিক সেইরূপ; যাহা হউক, পরমাত্মা—চিন্ময়ী মা “আমাকে জানি না”

বলিয়া জানিবার জন্য একবার স্পন্দিত হন, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যে আত্মস্বরূপ অবগতির জন্য স্বেচ্ছাকল্পিত একটা স্ফুরণ হয়—একটা চঞ্চল ভাব লক্ষিত হয় ইহারই নাম রজোগুণ। ঐ প্রথম স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই, উহার উভয়পার্শ্বে আরও দুইটি স্পন্দন অভিব্যক্ত হয়। উহার একটী প্রকাশ এবং অন্যটি স্থিতি। প্রথম স্পন্দনের পরমাত্মার যে বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়, ঐ বিশিষ্টভাবে আপনাকে জানার নাম প্রকাশ বা সত্ত্বগুণ এবং ঐ প্রকাশাত্মক রজোগুণকে যে স্পন্দনে ধরিয়া রাখে, তাহার নাম স্থিতি বা তমোগুণ। ইহারা পরস্পর সংসর্গী—একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী থাকে না। আবার পরস্পর পরস্পরকে সম্যক্ অভিভূত করিবার জন্যও প্রয়াসী। এই গুণত্রয় যেমন বহির্ম্মুখী স্পন্দন-ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সেইরূপ অন্তর্ম্মুখী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জ্ঞান অজ্ঞান সম্মিলিত সত্ত্বার উপরেই এই ত্রিবিধ স্পন্দন হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাদের যেরূপ অজ্ঞানাভিমুখী অভিব্যক্তি আছে, সেইরূপ জ্ঞানাভিমুখী অভিব্যক্তিও বিদ্যমান। যে স্পন্দনগুলি অজ্ঞান অর্থাৎ 'আমাকে' না জানাটাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয়, তাহাদের নাম অসুর; আর যে স্পন্দনগুলি জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসত্তা উদ্‌বুদ্ধ করিবার পক্ষে সহায় হয়, তাহাই দেবতা।

বিষয়টী নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক চিন্তায় অভ্যস্ত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুষ্পাচ্য বলিয়াই মনে হইতে পারে। তাই সংক্ষেপে ও সরলভাবে আবার পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। "আমাকে আমি জানি না" বলিয়া জানিবার জন্য যে একটা উদ্যম বা চেষ্টা উহারই নাম রজোগুণ। সেই চেষ্টার ফলে যে একটু একটু করিয়া আমাকে জানা বা বোধ করা, তাহাই সত্ত্বগুণ। আর সেই একটুখানি 'আমি' বোধটীকে ধরিয়া রাখার নাম তমোগুণ। ইহাই যোগশাস্ত্রোক্ত প্রখ্যা, প্রবৃত্তি এবং স্থিতি, অথবা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় অবস্থা। গীতায় ইহাই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেশ ধীরভাবে এই ত্রিগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া না লইলে, দেবাসুর-সংগ্রাম বুঝিবার উপায় নাই।

আবার বলি সত্ত্বগুণ—প্রকাশশীল ভাব, রজোগুণ—ক্রিয়াশীল ভাব এবং তমোগুণ—এতদুভয়ের ধৃতি বা ধারণশীল ভাব। ইহারা নিয়ত পরিণামী, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। জড় জগৎ এই গুণত্রয়ের পরিণাম। ব্রহ্মাবধি জড় পরমাণু পর্য্যন্ত, সকলই এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ বিয়োগ ও সংমিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

সুখ-দুঃখাদিও এই ত্রিগুণাত্মক। যেখানে বেশী চেষ্টায় অর্থাৎ অত্যধিক ক্রিয়াশীলতায় ঈষৎমাত্র আত্মবোধ স্ফুরিত হয়, তাহাকেই লোকে দুঃখ বলে। কারণ সেস্থানে ক্রিয়াভাব বেশী, প্রকাশ ভাব কম। যেস্থানে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রকাশ ভাব বেশী, রজোগুণের ক্রিয়া অর্থাৎ চাঞ্চল্য কম, তাহাই সুখ। আর যখন তমোগুণের ক্রিয়া প্রবল হয়, প্রকাশভাব মোটেই থাকে না, সুখ দুঃখ কিছুই বোধ থাকে না, উহার নাম মোহ।

সত্ত্বগুণের চরম পরিণতি—অখণ্ড প্রকাশ, অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্মবোধের স্ফুরণ, যাহাকে বিশুদ্ধ আত্মবোধ কহে। ঐ অবস্থায় উপনীত হইলেই রজোগুণেরও চরম পরিণাম হয়। ইহারই নাম পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ 'আমি কে', তাহা জানার জন্য যে উদ্যম, তাহার অভাব। এইরূপ তমোগুণের চরম পরিণতি নিরোধ, অর্থাৎ পুনরায় রজোগুণের যে উদ্বোধ, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা।

এইরূপে গুণত্রয়ের দুই দিক পাওয়া গেল। এক দিকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—জীব জগৎ জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ইত্যাদি। আর অন্য দিকে অখণ্ড প্রকাশ, পর-বৈরাগ্য এবং নিরোধ। কথাটা আরও সহজ করিয়া বলিলে বলিতে হয়—এক দিকে ভোগ অন্য দিকে অপবর্গ বা মুক্তি। গুণত্রয়ের এই ভোগাভিমুখী গতির নাম অসুরভাব এবং অপবর্গাভিমুখী গতির নাম দেবভাব। এই দেবাসুর সংগ্রাম অনাদিকা- নুষ হইতে প্রতিজীবে সংঘটিত হইতেছে। যেদিন এই সংগ্রামের অ- পারে। হইবে, সেইদিন জীব গুণত্রয়ের পরপারে চলিয়া যাইবে; (তখন এই অপবর্গ, বন্ধন কিংবা মুক্তি, এই উভয় ধাঁধাই চিরদিনের জ- পী দেবাসুর হইবে।

এই মধ্যম চরিত্রে আমরা যে সকল অসুরের নাম পাইব, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া রাখিতেছি। মহিষাসুর—অসুরগণের রাজা এবং চিক্ষুর, চামর, উদ্‌গ্র, করাল, উদ্ধত, বাস্কল, তাম্র, অন্ধক, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য, মহাহনু, বিড়াল, দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ ও অসিলোমা—সর্ব্বশুদ্ধ এই ষোলজন প্রধান অসুরের নাম পাওয়া যাইবে। উহারা যথাক্রমে—রজোগুণ, বিক্ষেপ, আবরণ, দর্প, ভয়, দম্ভ, ভোগাভিলাষ, লোভ, মোহ, ক্রোধ, শারীরিক বল, অভিমান, দোষদৃষ্টি, অক্ষমা, নিষ্ঠুরতা এবং দ্বেষ নামে ব্যাখ্যাত হইবে। যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এইবার আমরা প্রকৃত প্রস্তাবের সম্মুখীন হইব। মহিষ ও পুরন্দর শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। যখন এক দিকে মহিষ ও অন্য দিকে পুরন্দর, যথাক্রমে অসুর ও দেবগণের অধিপতি হইয়া, পরস্পর পরস্পরের শক্তি ক্ষয় করিতে উদ্যত হয়, তখনই এই দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া থাকে। যদিও প্রতেক জীবদেহে প্রতিনিয়ত এই দেবাসুর সমরাভিনয় চলিতেছে, এক দিকে ভোগের বাসনা, অন্য দিকে অপবর্গের আকর্ষণ, এই উভয়ের পরস্পর সংঘর্ষ প্রতি পরমাণুতে প্রতিক্ষণে সংঘটিত হইতেছে; তথাপি জীব যতদিন মনুষ্যত্বে উপনীত না হয়, যতদিন বিজ্ঞানময়-কোষে আত্মবোধ সংহরণ করিতে না পারে, ততদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতির ফলে মায়ের অসীম করুণাবলে, শ্রীগুরুর অহৈতুক অনুপ্রেরণায়, যখন সাধক-হৃদয়ে এই সংগ্রাম অনুভূত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে। শীঘ্রই এই সংগ্রামের অবসান হইবে। সাধক! দেখ—এক দিকে তোমার সঞ্চিত সংস্কারসমূহ আসুরিক শক্তি ত[illegible]য়োগে তোমায় নির্জ্জিত করিতেছে, তোমার মাতৃ-অঙ্ক লাভের শান্ত, [illegible]কুল পিপাসাকে দমিত করিয়া রাখিতেছে। বুঝিতে পারিতেছ—নামে [illegible]সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি দেবশক্তি—যাঁহারা তোমার হৃদয়ঙ্গম ক[illegible]ভের একান্ত সহায়, যাঁহারা তোমাকে শান্তির—অমৃতের [illegible]র উপনীত করিবার অদ্বিতীয় সহচর, সেই দেবশক্তি

অধুনা দম্ভ দর্প অভিমান প্রভৃতি অসুর কর্ত্তৃক নিয়ত-লাঞ্ছিত—উৎপীড়িত। দেখিয়া ব্যাথিত হও, আর্ত্ত হও,—শরণাগত হও, আর ভূমিতলে লুটাইয়া কাতরস্বরে 'মা' বলিয়া ডাক! মহাশক্তির কাছে সজল নয়নে শক্তি ভিক্ষা কর! সরলপ্রাণে আপনাকে যথার্থ উৎপীড়িত বলিয়া অনুভব কর! দেখিবে—'মা' স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অসুরকুলের বিলয়, দেবকুলের আনন্দ এবং তোমাকে মধুময় অব্যয় মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিয়া ধন্য করিবেন। এস, আমরা 'মা' বলিয়া সরল প্রাণ শিশুর মত মাতৃ-চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্ম হই।

যাহা হউক এই দেবাসুর-সংগ্রাম পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী হইয়াছিল—'পূর্ণমব্দশতম্'। মানুষের আয়ুর পরিমাণ শতবর্ষ—"শতং বৈ পুরুষাণা-মায়ুঃ"। সত্যযুগে লক্ষবর্ষব্যাপী আয়ু ছিল বলিয়া যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, উহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার। সকলযুগেই মানুষের সাধারণ আয়ুর পরিমাণ শতবর্ষ। তবে যোগাদি শক্তির প্রভাবে কেহ উহার মাত্রা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী মতে গ্রহগণের দশা গণনার রীতি প্রচলিত আছে, উহাও কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ আয়ুর প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। ঐ উভয় মতে মানুষের আয়ুর পরিমাণ একশত আট, এবং একশত কুড়ি বৎসর মাত্র পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়—একশত বৎসরের পরও মানুষ কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহাতে শ্রুতির মর্য্যাদা বিনষ্ট হয় না। তাৎকালিক মাস বর্ষ প্রভৃতি গণনার সহিত, বর্ত্তমান গণনারও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; সুতরাং ও সকল কথা লইয়া বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

পূর্ণ শতবর্ষ শব্দের তাৎপর্য্য—একটী পূর্ণ মনুষ্যজীবন। অর্থাৎ পূর্ণ এক জীবন ধরিয়া এই দেবাসুর সংগ্রাম অনুভূত হইতে থাকে। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"। বহু বহু জন্মের পর মানুষ জ্ঞানবান্ হয়, তারপর আমাকে—আপনাকে—'মাকে' জানিতে পারে। একটু একটু করিয়া 'মাকে' জানিতে আরম্ভ করিলে—তখন এই সমরের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ণ একটী মনুষ্যজীবনব্যাপী দেবাসুর

সংগ্রাম অনুভব করিতে হইলে, বহু জন্ম-মৃত্যু অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ, সাধারণতঃ আমাদের বর্ত্তমান আয়ুর পরিমাণ ষাট বৎসর মাত্র। তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসর আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যে অতিবাহিত হয়। বাকী ত্রিশ বৎসরের, বাল্য বার্দ্ধক্য এবং রোগ শোকাদি অবস্থার সময় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতি সামান্যমাত্র। সে সময়টাও অর্থোপার্জ্জন বিষয়-চিন্তন প্রভৃতি কার্য্যে অতিবাহিত হয়। সুতরাং একটা জীবনের মধ্যে কয় মূহূর্ত্ত আমরা দেবাসুর-সংগ্রাম অনুভব করিতে পারি ?

আমাদের বর্ত্তমান জীবন যথার্থ জীবন পদবাচ্যই নহে। কারণ, জীবন বলিলে গতিশক্তি-বিশিষ্ট জীবন বুঝা যায়। মনে কর—একখানা বাষ্পীয় শকট (ইঞ্জিন)। প্রত্যহ কয়লা জল ও অগ্নির সংযোগে বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু শকটখানি একটুও অগ্রসর হইল না। যেখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া ষাট বৎসর ব্যাপিয়া কেবল কয়লা জল ও বাষ্প অপচয় করিল মাত্র। ঠিক সেইরূপই আমাদের এক একটা জীবন বৃথা ব্যয়িত হইতেছে না কি ? প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় এই দেহটার ভিতর প্রদান করা হইতেছে; উদ্দেশ্য—অগ্রসর হওয়া, উদ্দেশ্য—দেবাসুর সংগ্রাম অনুভব করা, উদ্দেশ্য—অসুরনিধন-কারিণী মায়ের চণ্ডমূর্ত্তি দর্শন; কিন্তু তাহা হয় কি ? "যত্রৈব জাতয়ে তত্রৈব ম্রিয়তে।" এইরূপ জীবনের এক জীবন কেন শত জীবন অতিবাহিত হইলেও বোধ হয় পূর্ণ একটি মনুষ্যজীবন-ব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম দর্শন হয় না।

যাঁহারা বলিবেন—আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে ওরূপ যুদ্ধ দেখিবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক খাল কাটিয়া নিজের বাড়ীতে কুমীর আনিবার কোন আবশ্যক নাই, সাধ করিয়া কেন আমরা অশান্তি ভোগ করিতে যাইব ? এ সাধন-সমর তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা সুরথ হইয়াছেন, যাঁহারা আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত বলিয়া আপনাকে বুঝিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই এই সংগ্রাম দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, দেবাসুর-সংগ্রাম বহুবর্ষব্যাপী হইয়া থাকে; সুতরাং এইমন্ত্রে বহুকাল অর্থে "শতবর্ষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই যে এই যুদ্ধের সূচনা হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'পুরা' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, আজ যে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিবার বা আলোচনা করিবার মত ধী-বৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, উহা দুই এক জন্মের সুকৃতির ফল নহে। বহুজন্ম ধরিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিলে, তবে "মায়ের কৃপা" নামে একটা জিনিষ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এবং তাহারই ফলে ক্রমে এ সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা আসে। তবে একটি কথা—যদি কেহ নিজের ভিতরে অহর্নিশ ঐরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম অনুভব করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবন পুণ্যময়, তাঁহার দর্শন সুকৃতি দান করে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ অমোঘ, তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার, তাঁহার দেহস্পর্শে বায়ুমণ্ডল পূত হয়, তাঁহার চরণ স্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্রীকৃত হয়। জীব! তুমি কি আপন হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছ? না দেখিয়া থাক, তবে গুরু বলিয়া 'মায়ের' চরণ জড়াইয়া ধর, মা-ই তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবেন। তখন দেখিতে পাইবে—তোমার হৃদয়ক্ষেত্র ভীষণ সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

———

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যংপরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইয়াছিল। এবং দেবতাগণকে পরাভূত করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্র হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অসুর বল—অমিতবীর্য্য। বহুজন্ম হইতে বহির্মুখ কর্ম্মপ্রবণতার অভ্যাসে এমনি একটা অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের চিত্ত নিয়ত রূপ-রসাদি বিষয়াভিমুখী বৃত্তিপ্রবাহ লইয়া অবস্থান করিতেই স্বস্তিবোধ করে! কিছুতেই অন্তর্মুখী—মাতৃ-মুখী হইতে চাহে না। সেই নিস্তরঙ্গ চিন্ময় উদারক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে চায় না। ইহাই অসুরগণের অসীম বীর্যবত্তার লক্ষণ। অন্য দিকে দেবসৈন্য—ভগবৎমুখী বৃত্তি-নিচয়, উহারা বড়ই দুর্ব্বল; কারণ, অতি অল্পদিন মাত্র উহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সদ্ভাবনিচয় এখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ অসুরগণ-কর্ত্তৃক দেবশক্তিকে নির্জ্জিত হইতেই হইবে।

মনে কর—একখণ্ড বৃহৎ ইস্পাত (স্প্রিং)। তুমি উহাকে ঘুরাইয়া সঙ্কোচভাবাপন্ন করিয়া দিলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা-শক্তির প্রভাবে উহা প্রতিক্ষণে প্রসারণের দিকেই বেগ দিতে থাকে। কিন্তু একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর যদি উহার উপর চাপ দিয়া রাখা যায়, তবে সেই ইস্পাতের যে স্বাভাবিক প্রসারণী শক্তি, তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে গতিযুক্ত হইয়াও নিরুদ্ধবৎ অবস্থায়ই থাকে; অসুরকর্ত্তৃক দেবতা-বর্গের নিগ্রহও কতকটা এইরূপ।

সাধক! তোমার চক্ষুকে তুমি "রূপং দেহি" বলিয়া জগৎময় যে মায়েরই রূপরাশি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য নিযুক্ত করিলে; প্রাণপণে তোমার দৃক্শক্তিকে মায়ের রূপে নিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলে; কিন্তু চক্ষু জগতের রূপ লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইল। এইরূপ কর্ণকে—সকল শব্দের অন্তর্নিহিত নিত্যনাদ প্রণব ধ্বনিতে, কিংবা স্বোচ্চারিত কোন বিশিষ্ট মন্ত্রাদি শ্রবণে নিযুক্ত করিলে; কিন্তু সে ক্ষণকালমধ্যে জগতের ব্যর্থ শব্দ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। মনকে কেন্দ্রস্থ করিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় মিলিত করিয়া দিতে অগ্রসর হইলে; কিন্তু মুহূর্ত্তেমধ্যে সে পূর্ব্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, নানারূপ বৈষয়িক সঙ্কল্প বিকল্প করিতে লাগিল। এইরূপে

দেবাসুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যিনি যথার্থ সৌভাগ্যবান্—যাঁহার অমৃতলাভ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, মাত্র তিনিই এই যুদ্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন।

সে যাহা হউক, এই যুদ্ধে প্রথমতঃ দেবগণ পরাজিত হন। অন্তর্মুখী আকর্ষণ শক্তি নির্জ্জিত হয়। যদিও অন্তরে অন্তরে একটা মাতৃ-মুখী আকর্ষণ নিয়তই রহিয়াছে; তথাপি বিকর্ষণ অর্থাৎ অনুলোম গতির প্রভাব যতদিন বেশী থাকে, ততদিন এই যুদ্ধ উপলব্ধিই হয় না। তারপর যখন মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে আকর্ষণ-শক্তি একটু প্রবল হইতে থাকে, তখনই বিরোধী দলের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের প্রথম ফল—পরাজয়। কেন এ পরাজয় সংঘটন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যখন দেবগণ নির্জিত, তখন মহিষ—(রজোগুণের বহির্বিকাশ) ইন্দ্রত্ব লাভ করিল। সমস্ত দেবশক্তির উপরে প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য লাভ করিল। মহিষ এতদিন মাত্র অসুরশক্তির পরিচালক ছিল, এইবার দেবশক্তিও উহার অধীন হইয়া পড়িল।

ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর—রজোগুণের অন্তর্মুখী চরম পরিণতির ফল—পর-বৈরাগ্য। যাবতীয় শক্তিপ্রবাহকে সম্যক্ভাবে সংহরণ করাই রজোগুণের অন্তর্মুখী ক্রিয়া। ইহারই নাম পুরন্দর। এই পুরন্দর (পুরবিদারণকারী) যখন দেবশক্তির অধিপতি থাকে, তখন বহির্মুখী বৃত্তিপ্রবাহের পূর্ণরূপে সংহরণ কার্য্য চলিতে থাকে। এবং তাহারই ফলে পরবৈরাগ্য সমাগত হয়। কিন্তু এইবার মহিষ দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। বাহিরের দিকে বা বিষয়ের ক্রিয়াশীলতাই উহার স্বভাব; সুতরাং দেবশক্তি-সমূহকে সে বহির্মুখ করিয়া ফেলিবে। দয়া ক্ষমা উদারতা নিস্পৃহতা প্রভৃতি দেবভাব অসুর কর্তৃক নির্জিত থাকিলে আর পর-বৈরাগ্যের আশা নাই। কার্য্যতঃ যাবতীয় কর্ম্মের বীজ ধ্বংস না হইলে, কিছুতেই পর-বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে না।

খুলিয়া বলি—রজোগুণের দুই দিক। উহার এক দিকে পর-বৈরাগ্য

অন্য দিকে ভোগাসক্তি। উহারাই যথাক্রমে পুরন্দর ও মহিষাসুর। পরবৈরাগ্যের স্বরূপ—সর্ব্বস্বত্যাগ, দেহ, মন ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ; আর ভোগাসক্তির স্বরূপ—সর্ব্বস্ব গ্রহণ। পুরন্দর চায় মোক্ষ, মহিষ ভোগ। যতদিন মোক্ষবাসনা প্রবল না হয়, ততদিন মহিষকর্ত্তৃক পুরন্দর নির্জ্জিত হইবেই। মহিষ ইন্দ্রত্বলাভ করিবেই।

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অনন্তর পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া, যেখানে শিব এবং বিষ্ণু ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

ব্যাখ্যা। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। ইনি যাবতীয় ভাবের অধিপতি; তাই ইহাকে প্রজাপতি কহে। ভাব ও প্রজা যে একই কথা, ইহা প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ" অর্থাৎ সুর এবং অসুর উভয়ই প্রজাপতি হইতে সমুদ্ভূত। দেবশক্তি এবং অসুরশক্তি উভয়ই মনের ভাব। মনের যে অংশে অসুরের আধিপত্য বিস্তার হয়, সেই অংশ প্রজাপতি হইলেও পদ্মযোনি নহে। নাভি বা মণিপুরপদ্ম হইতে নিম্নদিকে অসুরের ক্ষেত্র, এবং ইহার উর্দ্ধে দেব-ক্ষেত্র। নাভি-কমল হইতেই ব্রহ্মার উদ্ভব। মনের যে অংশ পরমাত্মাভিমুখী হইয়াছে—যে অংশে যথার্থ মাতৃ-লাভের বাসনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই পদ্মযোনি। তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ বিষ্ণু ও শিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু—প্রাণশক্তি, শিব—জ্ঞানশক্তি। বিষ্ণুর স্থান হৃদয়পদ্ম বা অনাহত, এবং শিবের স্থান—ললাট বা আজ্ঞাচক্র। অতএব পরাজিত দেবতাগণ পদ্মযোনিকে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, কথাটীর তাৎপর্য্য এই যে পরমাত্মাভিমুখী

ইন্দ্রিয়শক্তি-সমন্বিত মন আসুরিক ভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ ও জ্ঞানের সমীপস্থ হইলেন।

সাধকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন—সবটা মন দিয়া মাকে চাওয়া যায় না, আবার সবটা মন দিয়া জগদ্‌ভোগও করা যায় না। মনের এক দিকে যেমন মাতৃ-দর্শন লালসা, মাতৃ-মহত্ত্ব শ্রবণে ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠে, অন্য দিকে ঠিক সেইরূপই স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়বাসনার বিলাস চলিতে থাকে। মনের একদিকে দেখিতে পাই—দেবরাজ পুরন্দরের কর্ত্তৃত্ব, অন্য দিকে অসুররাজ মহিষের আধিপত্য—উৎপীড়ন। এই উৎপীড়নের ফলে প্রথমতঃ দেবশক্তি নির্জ্জিত হয়। প্রাণ ও জ্ঞানশক্তি সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-মুখী না হইলে, মনের পূর্ণ বল লাভ হইতে পারে না; তাই, মনকে বাধ্য হইয়া উহাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে যে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া মধুকৈটভ নিধন করিয়াছে, যে বিজ্ঞানময় গুরু মেধসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞান দূর করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহাদের চরণে পূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই এই অসুর-অত্যাচার বিদূরিত হইবে; ইহাই প্রজাপতির আশা।

মন কিরূপে প্রাণ ও জ্ঞানের শরণাপন্ন হইবে? প্রাণ ও জ্ঞান শক্তির সত্তা ব্যতীত মনের যে কোন পৃথক্ সত্তা নাই, মন যে সম্যক্‌ভাবে তাঁহাদের সত্তায়ই সত্তাবান্, এইরূপ উপলব্ধির নামই মনের শরণাগত হওয়া। জীব যতদিন আমিত্বকে বড় শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে, যতদিন তাহার অভিমানের উচ্চশির কিছুতেই অবনত হইতে চায় না, ততদিন এই শরণাগত ভাব কিছুতেই আসে না। এই শরণাগত ভাব ও আত্মনিবেদন একই কথা। "আমি কিছু জানি না, আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল, আমি অজ্ঞান শিশু", এই বলিয়া আপনাকে ধরিয়া, তৃণগুচ্ছের মত বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে অর্পণ করিতে হয়। ইহারই নাম আত্ম-নিবেদন। যাঁহারা দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়াও অমৃতের সন্ধান পান না, বুঝিতে হইবে—তাঁহাদের সাধনা আত্মনিবেদনরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

আত্মনিবেদন ব্যতীত সাধনার আরম্ভই হয় না। আত্মদান ব্যতীত সাধনার আরম্ভই হয় না। আত্মদান ব্যতীত আত্মলাভ কখনই হইতে পারে না। ওগো মায়ের সন্তানবৃন্দ! তোমরা যে কোন যায়গায় আপনাকে ছাড়িয়া দাও—প্রণিপাত কর, দেখিবে আত্মলাভ হইয়াছে। প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না, এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিও। জড় কি চেতন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, এ সকল বিচার না করিয়া যে কোনও যায়গায়—প্রাণকে ঢালিয়া দাও, দেখিবে—মহাপ্রাণময়ী স্নেহময়ী মায়ের বক্ষে তুমি নিত্য অবস্থিত। যাহা হউক, শরণাগত ভাবই যে সর্ব্ববিধ সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য বা আলম্বন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই শেষ সিদ্ধান্ত। তাই দেখিতে পাই—স্বয়ং প্রজাপতিও ঈশ এবং গরুড়ধ্বজের শরণাগত হইল। স্বয়ং ভগবান্‌ও একদিন আদর্শ ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"মামেকং শরণং ব্রজ"।

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্॥ ৪॥

অনুবাদ। দেবতাগণ তাঁহাদের (শিব ও বিষ্ণুর) নিকট মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ এবং দেবগণের পরাজয় বিবরণ যথাযথরূপে বর্ণনা করিলেন।

ব্যাখ্যা। অসুর-অত্যাচারে উৎপীড়িত মন, প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির শরণাপন্ন হইয়া, বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির অত্যাচার-কাহিনী, এবং নিবৃত্তিমুখী বৃত্তি নিচয়ের দুরবস্থার কথা যথাযথরূপে জ্ঞাপন করিতে থাকে। অর্থাৎ মনের সাহায্যেই প্রাণ ও জ্ঞান, বিক্ষেপ শক্তির যাবতীয় কার্য্য-বিবরণ পরিজ্ঞাত হয়। প্রাণ ভোক্তা, এবং জ্ঞান প্রকাশক। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় আহরণ করিয়া প্রাণকে উপহার দেয়। প্রাণ উহা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া ভোগ করে। মন-কর্ত্তৃক আহৃত-বিষয়সমূহের প্রকাশ করাই জ্ঞানের কার্য; এবং ঐ

প্রকাশিত বিষয়ের সংস্পর্শে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ, উহাই প্রাণের কার্য্য। এক কথায়, মন—আহর্ত্তা বা স্রষ্টা; প্রাণ—কর্ত্তা বা ভোক্তা এবং জ্ঞান—প্রকাশক বা লয়কারক। আমরা এস্থলে যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, উহা বৌদ্ধ-জ্ঞান। সরল ভাষায় উহাকে বুদ্ধি বলিলেই ভাল হয়। ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয় প্রকাশ হয়, তাহার পর্য্যবসান বুদ্ধিতত্ত্বেই হইয়া থাকে। বুদ্ধির পরপারে বৈষয়িক প্রকাশ নাই। এইজন্য বুদ্ধিকে বা বৌদ্ধজ্ঞানকে প্রলয়ের দেবতা বলা হয়।

মন অসুরের অত্যাচার কাহিনী প্রাণ ও জ্ঞানের নিকট বিবৃত করিল। এতদিন সে অত্যাচাররূপে বর্ণনা করে নাই; যাহা আসিয়াছে—যেরূপ বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করিয়া প্রাণকে উপহার দিয়াছে। প্রজাপতি এতদিন তাঁহার চিরাভ্যস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতেছিলেন, তাই প্রাণ এবং জ্ঞানও এতদিন ইহাকে অসুরের অত্যাচাররূপে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু আজ স্বয়ং মনই বৈষয়িক প্রকাশকে আসুরিক অত্যাচাররূপে বর্ণনা করিতেছে; সুতরাং উহারাও সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাণশক্তিরও (মধুকৈটভবধের সময়ে) যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জ্ঞানশক্তিও বিজ্ঞানময় গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এতদিন তাঁহারা বৈষয়িক স্পন্দনগুলিকে অত্যাচাররূপে গ্রহণ না করিলেও, এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা অসুরের অত্যাচার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

খুলিয়া বলি—যত দিন রূপরসাদি বিষয়কে বা কামিনী-কাঞ্চনকেই পরমপুরুষার্থরূপে বোধ করা যায়, ততদিন মন প্রাণ ও জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে উহাতেই মুগ্ধ থাকে। তারপর যখন ধীরে ধীরে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন সেই মন প্রাণ এবং জ্ঞানই উহাদিগকে আসুরিক স্পন্দন বলিয়া বুঝিতে পারে।

সাধক! তুমিও যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিতান্ত উৎপীড়িত হইবে, তখন ইতস্ততঃ পরিধাবিত হইও না। প্রবৃত্তির দমনকল্পে স্বয়ং

বহ্বায়াসসাধ্য কঠোর হঠযোগাদি অবলম্বন করিয়া, উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। তুমিও প্রজাপতির মত হৃদয়ানুভূত চৈতন্যের—প্রাণের শরণাগত হও! তোমারই অন্তরস্থিত জ্ঞানময় গুরুর চরণে শরণ লও! আর কাঁদিয়া বল—গুরো! প্রাণময়! এই অসুর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা কর! আমি কত চেষ্টা করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল; কিছুতেই অসুরের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, তোমাকে সম্পুর্ণরূপে জড়াইয়া ধরিতে পারিলাম না! কিছুতেই তোমাকে আমার একান্ত আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না! যখনই একটু একটু করিয়া তোমাকে বুঝিবার জন্য অগ্রসর হই; তখনই অসুরনিকর আমাকে তোমার দিক হইতে টানিয়া অন্যদিকে লইয়া যায়, আবার সেই চিরাভ্যস্ত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আর কত দিন এ অসুর-উৎপীড়ন সহ্য করিব? আর কত দিন দৈত্যের আদেশ মাথায় করিয়া জীবনের দুঃখময় দিন গুলির গণনা করিব? গুরু, দয়া করিয়া এই সঞ্চিত কর্ম্মের বিপরীত আর্কর্ষণ হইতে রক্ষা কর। প্রভু, আর কাহার চরণে আশ্রয় লইব, তুমিই যে আমাদের—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" এমনই করিয়া কাঁদ। কাঁদিতে পারিলেই অসুরের অত্যাচার প্রশমিত হইবে। কিন্তু সাবধান, কাঁদিবার জন্য কাঁদিও না। কেবল রোদন স্ত্রী-জনোচিত দুর্ব্বলতা মাত্র। উহা সত্য-প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাং চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ ৫॥

অনুবাদ। সূর্য্য, ইন্দ্র, অনিল, ইন্দু যম, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণের অধিকার মহিষাসুর স্বয়ং অধিকার করিয়া লইয়াছে।

ব্যাখ্যা। দুইটী মন্ত্রে দেবতাগণের অভিনব কাহিনী বর্ণিত হইতেছে। সূর্য্য—চক্ষুর অধিপতি দেবতা ; ইন্দ্র—পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি ; অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়াধিপতি ; অনিল—ত্বগ্ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ; ইন্দু—মনের অধিপতি; যম—পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ; এবং বরুণ—রসনার অধিপতি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতাগণ অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দের যে বিভিন্ন অধিকার ছিল; তাহা মহিষাসুর স্বয়ং অধিকার করিয়া লইয়াছে।

এস্থলে দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা হইলেই এই অধিকার-গ্রহণের রহস্য সহজবোধ্য হইবে। চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা, তাহাই দেবতাপদবাচ্য ; অর্থাৎ বিশিষ্ট চৈতন্যই দেবতা। চৈতন্য যখন সর্ব্ববিশেষ-বর্জ্জিত, তখন তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন নির্গুণ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হন। আর যখন কোন না কোনও বিশেষ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তিনি দেবতা। মনে কর—একটি বৃক্ষ। বিশুদ্ধ চৈতন্যের যে অংশে "আমি বৃক্ষ" এইরূপ সম্বেদন ফুটিয়াছে, সেই অংশটীর নাম বৃক্ষাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতা। যে চৈতন্য আমি সূর্য্য' রূপে প্রকাশিত, তিনিই সূর্য্যদেব'। যে চৈতন্য "আমি বুদ্ধি" রূপে প্রতিভাত, তিনি বুদ্ধির অধিপতি দেবতা অচ্যুত। যে চৈতন্য সৃষ্টিকার্য্যে 'অস্মিতা' বোধ করেন, তিনি ব্রহ্মা। এইরূপ সর্ব্বত্র। সাধারণতঃ এই দেবতার সংখ্যা ত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি। পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে। আমাদের দশ বা একাদশ ইন্দ্রিয় (মনও ইন্দ্রিয় বিশেষ) সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণে গুণিত হইয়া ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ সংখ্যা বিশিষ্ট হয়। অবান্তর বিষয়-ভেদে উহাদের অসংখ্য ভেদ হয়। কোটি শব্দ এই অসংখ্যের বোধক। এই হিসাবে ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ কোটি কথাটী নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে যে পৃথক্ পৃথক্ চিতি-শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যে চিৎপ্রবাহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই চক্ষুরাদির অধিপতি দেবতা। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার যে সকল

বিশিষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান বর্ণিত আছে, উক্ত ধ্যান-প্রতিপাদ্য মূর্ত্তিতে সমাধিস্থ হইলে, উহাদের যে স্বরূপ ও শক্তি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঐ সকল দেবতা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। অবশ্য, অন্তর বলিলে যাহারা বুকের মধ্যে একটুখানি কিছু বুঝিয়া থাকেন, তাহাদের ঐরূপ উপলব্ধি কখনই সম্ভবপর নহে। বাস্তবিক বাহির বলিয়া কিছু নাই, সকলই "অন্তর"; কিন্তু সে অন্য কথা—

আবার অন্যরূপেও এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে যে চিৎপ্রবাহ প্রকাশিত আছে, উহাতে সমাহিত হইলেও, উক্ত সূর্য্যাদির স্বরূপ ও শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং সাধকগণ বুঝিয়া রাখিবেন—সূর্য্যাদি দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে কিংবা অসাক্ষাৎ অবস্থায়ও তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হয়। মাত্র একটী ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া উহাতে সমাহিত হইলে, উক্তরূপ দেবতার সাক্ষাৎকার কিংবা কৃপালাভ করা অসম্ভব। উপাসনার আলম্বন যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হইবে; অন্যথা উপাসনা আশানুরূপ ফল প্রদান করে না। ইহাই সাধনার রহস্য। ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যও ইহা বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। অগ্নি বায়ু জল সূর্য্য অন্ন মন প্রাণ প্রভৃতির এক একটীকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরূপে দর্শন করতে হয়। ব্রহ্ম বলিলে একটা অজ্ঞেয় কিম্ভূতকিমাকার বস্তু বুঝিও না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাহা হইতে এই জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হয়, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আমার সম্মুখস্থ এই প্রতীকরূপে অবস্থিত, এই প্রতীকরূপ কেন্দ্র হইতেই সমগ্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়, ইনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, ইনিই আমার এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তররূপে অবস্থিত। এইরূপ বোধপ্রবাহকে ধরিয়া রাখার নামই প্রতীকের ব্রহ্মভাবে উপাসনা।

মনে কর—যদি তুমি ইন্দ্র দেবতার সাক্ষাৎ বা কৃপা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে ইন্দ্রের যে বীজমন্ত্র আছে, (কোনও শক্তিমান্ সাধকের নিকট হইতে মন্ত্রটী শিক্ষা করিলেই ভাল হয়) ঐ মন্ত্রের সাহায্যে স্বকীয় পাণি-ইন্দ্রিয়কে প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। উপাস্য-বিষয়ক যে যথার্থ বোধ, তাকে—সেই বোধকে ধরিয়া রাখার নাম উপাসনা। এইরূপ করার ফলে, যখন পাণি-ইন্দ্রিয়টি তোমার বেশ অনুভূতিযোগ্য হইবে; তখন ঐ অনুভূতিকে ব্রহ্মরূপে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে বিরাট পাণি বা আদানশক্তি রহিয়াছে সেই শক্তিরূপে ধারণা করিতে থাকিবে, ক্রমে ঐ ধারণা ঘনীভূত হইয়া ধ্যান ও সমাধি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই অবস্থায় ইন্দ্র-দেবতাসম্বন্ধে তোমার যেরূপ সংস্কার আছে, তদনুরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইবে। অথবা কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তির সংস্কার না থাকিলেও তোমার যথার্থ ইন্দ্রদেবতার দর্শন হইবে; তুমি ব্যুত্থিত হইয়াই দেখিতে পাইবে—ইন্দ্রদেবের নিকট হইতে অভিলষিত বর লাভে ধন্য হইয়াছ। দেবতাসাধন সম্বন্ধে ইহাই সংক্ষিপ্ত রহস্য।

তবে কথা এই যে, সাধারণভাবে এই সকল বিশিষ্ট দেবতার উপাসনা না করিয়া, যে মহতীশক্তি এই পরিদৃশ্যমান জীবজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এর উপাসনা করিলে, সকল দেবতারই তৃপ্তি সাধন বা কৃপালাভ হয়। যেরূপ উত্তমাঙ্গ স্নিগ্ধ থাকিলে সর্ব্বাবয়বই স্নিগ্ধ থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। তাই মন্ত্রবাক্যে উক্ত হইয়াছে—"তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" তাঁর—পরমাত্মার—মায়ের আমার তুষ্টি হইলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই পরিতুষ্ট হয়। মায়ের তৃপ্তি হইলেই সর্ব্বলোক পরিতৃপ্ত হয়। কারণ, সবই যে মা! মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। বিশেষভাবে এটা ওটাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া মাকে তৃপ্ত করিতে উদ্যত হও, সকলের তৃপ্তি আপনি সম্পাদিত হইবে।

কেহ এরূপ আপত্তি করিও না—নিত্যতৃপ্তার আবার তৃপ্তি কি?

তিনি কি চাটুকারপ্রিয় ? তিনি কি আমাদের স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তোষামোদ-প্রিয় ধনীর ন্যায় আমাদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন ? সাধন-সমর প্রথম খণ্ড পড়িয়াও যাহার এরূপ তর্ক প্রাণে ফোটে ; তাহাকে পুনরায় ভাল করিয়া প্রথম খণ্ড পড়িতে হইবে। যতক্ষণ তুমি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পার নাই যে, তিনি নিত্যতৃপ্তা—নিত্যসন্তুষ্টা, ততক্ষণ তুমি শুধু মুখেই বল—তার আবার তৃপ্তি অতৃপ্তি কি ? যতদিন দেখিবে বিপদে পড়িলেই তাঁর তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা বুকে ফুটিয়া উঠে, ততদিন তুমি দিবানিশি প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া, তাঁহার তৃপ্তি সাধনেই নিরত থাকিও। ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ প্রতিনিয়ত তাঁহার তৃপ্তি সাধনই যেন তোমার জীবনের ব্রত হয়। এইরূপ করিলেই বুঝিতে পারিবে, কার্য্যতঃ তুমিই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছ ; কারণ তিনি যে তোমার আত্মা।

আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, চল, আবার প্রকৃত প্রস্তাবের সমীপস্থ হই। মহিষাসুর সূর্য্যাদি দেবতাগণের অধিকার অপহরণ করিয়াছে, ইহাই মন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম। ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দ আপনাদের চিৎভাব—পরমাত্ম-সংযোগভাব বিস্মৃত হইয়া স্থূলাভিমানী জড়ত্বপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে—জড়শক্তিরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশসমূহ পরমাত্মাভিমুখী গতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা কাহার প্রভাব ? ঐ মহিষাসুরের —রজোগুণের।

মনে কর—একটি অখণ্ড চিৎ সমুদ্র, তাহার মধ্যে কতকটা লাল রং ঢালিয়া দিলে। তাহাতে সমুদ্রের যতটুকু অংশ রঞ্জিত হইল, সেই অংশটি যতক্ষণ আপনাকে চিৎ সমুদ্র হইতে পৃথক মনে না করে, ততক্ষণ তাহার দেব-ভাবটি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু যেইমাত্র আপনাকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া, প্রকৃত স্বরূপটির কথা ভুলিয়া যায়, অমনি সেই আপনার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ঐ স্বাধিকার হইতে বিচ্যুতির কারণ—তাদৃশ সংস্কার। ঐ সংস্কার-সমূহই অসুর

রজোগুণ এই সংস্কারের পরিচালক, সুতরাং রাজা। তাই এখানে দেখিতে পাই—মহিষাসুর দেবতাবৃন্দকে স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বয়ং সেই অধিকার গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব চিদভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সাধারণতঃ জড়ত্বপ্রিয়—জড়বস্তুতে আকৃষ্ট, জড়ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। উহাই মহিষাসুরের অত্যাচার। দেখ, তোমার চক্ষুকে সহস্র বার বুঝাইয়া দিলে—রূপ মাত্রেই মায়ের রূপ; কিন্তু চক্ষু সর্ব্বদাই ভৌতিকরূপ গ্রহন করে। কর্ণকে বলিয়া দিলে—যাবতীয় শব্দই মাতৃ-কণ্ঠস্বর, মাতৃ-আহ্বান বা প্রণব-তরঙ্গ মাত্র; কিন্তু কর্ণ দিবানিশি মানবের ভাষাই আহরণ করে। ত্বক্‌কে বলিয়া দিলে —জগৎময় যতরকম স্পর্শ আছ, উহা মাতৃ-আলিঙ্গন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; কিন্তু সে প্রতিনিয়ত জাগতিক স্পর্শ আনিয়া উপস্থিত করে। এইরূপ সর্ব্বত্র। কেন এরূপ হয় বুঝতে পার কি? ঐ মহিষাসুরের অধিকার; ঐ জড়ত্বের—এ কর্ম্ম-চঞ্চলতার অধিকার। তাই উহারা ঐরূপে তোমায় প্রবঞ্চিত করিতেছে। হায়! যদি ইহাদের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচার না হইত, যদি জড়ত্বের আধিপত্য না থাকিত, তবে এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গই অখণ্ড চৈতন্যের সন্ধান আনিয়া দিত, সর্ব্বত্র মাতৃ-স্নেহের সম্বেদন ফুটাইয়া তুলিত, জড়ত্বের ধাঁধা চিরদিনের মত বিদূরিত হইত।

মানুষ যখন মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে আত্মবোধের সমীপস্থ হইতে থাকে, তখনই একটু একটু করিয়া এই অত্যাচার উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যময় ভাবটি ফুটিয়া উঠে, আবার ক্ষণে ক্ষণে অসুরিকভাবে বা জড়ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের উভয়মুখী ভাব পরিলক্ষিত হয়। এক দিক চৈতন্যপ্রিয়, অন্য দিক জড়ত্বমুগ্ধ। এক কথায় এই জড় চেতনের যুদ্ধই দেবাসুর সংগ্রাম। সাধারণতঃ মনুষ্যকুলে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের এই সংগ্রাম উপলব্ধি হয় না। তখন ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দও সম্যক্

জড়ভাবাপন্ন থাকে। তারপর জীব যখন মানুষক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন ধীরে ধীরে তাহার এই জড়ভাব অপনীত হইতে থাকে। মনে রাখিও সাধক—জড়কর্ত্তৃক চৈতন্য উৎপীড়িত। ইহাই দেবাসুর-সংগ্রামের প্রকৃত রহস্য। বাস্তবিক কিন্তু জড় বলিতে কিছুই নাই। একটা জড়ত্ব-প্রতীতি আছে মাত্র। এই জড়ত্ববোধেরই নাম বন্ধন। ইহাই অসুর-ভাব। আর চৈতন্য মাত্র উপলব্ধির নাম মুক্তি। উহাই দেবভাব। শাস্ত্রকারগণ জড় ও চেতনের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে জানিয়া রাখা আবশ্যক—যে আপনাকে জানে এবং অন্যকেও জানিতে পারে, তাহার নাম চেতন; আর যে আপনাকে জানে না এবং অন্যকেও জানিতে পারে না, তাহার নাম জড়। এই হিসাবে গুণত্রয় বা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় অবধি যাবতীয় দৃশ্যবর্গের নাম জড় এবং যিনি এই যাবতীয় দৃশ্যের দ্রষ্টা বা প্রকাশক, তিনিই চেতন। এ সকল তত্ত্ব ক্রমে আরও স্ফুট হইবে।

সে যাহা হউক, সাধক! যতদিন তোমার বিন্দুমাত্র জড়ত্ব-প্রতীতি থাকিবে, ততদিন বুঝিবে—তোমার প্রতি অসুর-অত্যাচার চলিতেছে। সুতরাং যে কোনও উপায়ে উহাকে বিদূরিত করিতেই হইবে। জড়ত্বজ্ঞানই অজ্ঞান। জড় বলিতে—দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিতে পারে না; এইরূপ উপলব্ধি হইলেই যথার্থ জ্ঞানময় স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সেই দুষ্টস্বভাব মহিষাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া, দেবতাবৃন্দ মরণ-ধর্ম্মশীল জীবগণের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর দুরাত্মা—অসৎ প্রকৃতি। প্রথম খণ্ডে

বলিয়াছি—সৎস্বরূপ পরমাত্মা যখন লীলাবশতঃ ঈষৎ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশিত হন, তখনই তিনি অসৎপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যখন প্রকৃতি এই অসৎ অর্থাৎ ঈষদ্ অভিমুখে পরিচালিত হয়, তখনই ইহাকে দুরাত্মা বলা হয়। সাধারণ কথায় বুঝিতে হইবে—পরিচ্ছিন্ন রূপরসাদি ভোগ করাই যখন আত্মার স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখনই আত্মার দুরবস্থা। প্রাক্তন কর্ম্মের বীজসমূহ আত্মাকে ঐরূপ পরিচ্ছিন্নভাবে বা অসদ্ভাবে প্রতিভাত করিবার জন্য নিয়ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। রজোগুণ উহাদের মূল কেন্দ্র ; সুতরাং দুরাত্মা। ইহার অত্যাচারে দেবগণ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ স্বর্গ হইতে—চৈতন্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। উহারা জড়ত্বের অধিকারে আসিয়া অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপ মাতৃ-অঙ্কে নিত্যাবস্থানরূপ স্বর্গসুখ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, অমর হইয়াও মর্ত্তের ন্যায়—মরণ-ধর্ম্মশীল জীবের ন্যায়, ভূতলে অর্থাৎ পার্থিব ভাবে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।।

দেখ জীব, চৈতন্যই তোমার স্বরূপ। তোমার ইন্দ্রিয়নিচয় চৈতন্যেরই প্রবাহ-মাত্র, যেখানে চৈতন্য সেইখানেই অমৃত, সেইখানেই আনন্দ নিত্য বিরাজিত। কিন্তু তুমি অসুর কর্ত্তৃক এমনই হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছ যে, প্রাণপণে অন্বেষণ করিয়াও আনন্দের কণামাত্র সম্ভোগ করিতে পারিতেছ না। অমৃত-সমুদ্রে—মাতৃ-বক্ষে নিত্য অবস্থান করিতেছ, অথচ প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছ! এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা চলিতেছে। ইহাই "বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা"। জীব! ধীরে সাবহিতে এই অসুরের অত্যাচার প্রত্যক্ষ কর।

এ জগতে যাহারা পার্থিব সুখে সুখী বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে, তাহারাও যে যথার্থ সুখ হইতে একান্ত বঞ্চিত, ইহা একটু ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। কাম কাঞ্চনের সম্ভোগে যে সুখ, উহা এত চঞ্চল ও এত দুঃখমিশ্রিত যে উহাকে সুখ না

বলিলেই ভাল হয়। তথাপি যাহারা উহাতেই পরম সুখজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, তাহাদের পক্ষে উহা উষ্ট্রের কণ্টকচর্ব্বণ সদৃশ। উট কাঁটা ঘাস খাইতে ভালবাসে। কাঁটা খায়, একটু তৃপ্তিও যে না পায় এমন নহে; কিন্তু মুখ ও জিহ্বা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, ব্যাথাও পায়। পার্থিব সুখও ঠিক সেইরূপ। বার বার স্মরণ করিও—জড়বস্তুতে সুখ নাই। সুখ বস্তুটা চিৎএরই স্বরূপ। যতক্ষণ জড়ত্ব-বোধ সম্যক্ বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ সুখের সন্ধানই পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ বলেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।" যাহা ভূমা, যাহা মহৎ, তাহাই সুখ। অল্পে অর্থাৎ অসৎভাবে সুখ নাই। সুখেরই অন্যনাম স্বর্গ (সু—অর্জ্জ+ঘঞ)। সুকৃতি দ্বারা যাহা অর্জ্জন করা যায়, তাহাই স্বর্গ। দেবতাগণ এই ভূমাসুখের সহিত সংযুক্ত। তাই দেবলোককে স্বর্গ কহে। জড়ত্বের প্রবল আকর্ষণে দেবতাবৃন্দ অধুনা স্ব স্ব চৈতন্য ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। তাই মন্ত্রে দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে নিরাকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্য অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহ মাত্র। বিজ্ঞানময় কোষে আমিত্বকে লইয়া গেলে, এই অস্মিতার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। উহাই স্বর্গ। ইন্দ্রিয়বর্গের বৈষয়িক স্পন্দন উপস্থিত হইলেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥ ৭॥

অনুবাদ। আপনাদের নিকট অসুরের কার্য্যবিবরণ সকলই বর্ণনা করা হইল। আমরা আপনাদের শরণাগত হইয়াছি; আপনারা তাহার বধের উপায় চিন্তা করুন।

ব্যাখ্যা। মহিষ—অমরারি। অমরত্বের—অমৃতলাভের বিরোধী।

তাহার অত্যাচার কাহিনী—দেবতাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন-বিবরণ সকলই বর্ণিত হইল। দেবতাবৃন্দ এখন জড়ত্বের—অসৎপ্রিয়তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন; তাই বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এই শরণাগতভাবই সাধনার একমাত্র অবলম্বন। যাহার এই লক্ষণটি প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সাধনার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। শরণাগতভাব ব্যতীত যাবতীয় যোগ তপস্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না। শরণাগত-ভাবরূপ ভিত্তির উপরেই সাধনা-মন্দির দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা বহুদিন নানারূপ সাধন-প্রণালী অনুষ্ঠান করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন না, বুঝিতে হইবে,—তাঁহারা শরণাগতভাব পরিত্যাগ করিয়া, অথবা অসম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি জাগতিক কার্য্যে, কি সাধনারাজ্যে সর্ব্বত্রই ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা, ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। উহাতে কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পুনরুক্তি হইলেও এই কথাটী বহুবার আলোচনার যোগ্য—পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেই লৌহকীলক কাষ্ঠমধ্যে সুপ্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথমে মায়ের চরণে শরণ না লইয়া হঠক্রিয়ার সাহায্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা উহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হন—জানি না। আমরা কিন্তু এখানেও দেখিতে পাই—অসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ "শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মঃ" বলিয়া শিব ও বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। এই শরণাগত-ভাব যদি কৃত্রিমতা শূন্য হয়, সরল প্রাণে অকপট হৃদয়ে যদি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পার, তবেই সাধক, তুমি অনাবিল শান্তি ভোগের অধিকারী এবং সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের যোগ্য হইবে। মনে রাখিও—তোমার যত কিছু সাধনা, সকলই ঐ শরণাগত ভাবটি আনিবার জন্য। যেদিন দেখিবে—হৃদয়ের সমস্ত কপটতা বিদূরিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-চরণে শরণাগত হইতে পারিয়াছ সেই দিনই তোমার সকল সাধনার অবসান হইবে, জীবন মধুময় হইবে।

জীব যখন স্বকীয় দুর্দ্দশা হইতে অর্থাৎ অমরত্বের বিঘাতক ক্ষুদ্রতা ও জড়ত্ব হইতে মুক্তি চায়, তখন তাহাকেও এরূপ প্রাণ ও জ্ঞান-শক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বাহিরে যিনি বিষ্ণু, অন্তরে তিনি প্রাণ, বাহিরে যিনি শিব, অন্তরে তিনি জ্ঞান। যতদিন এই প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান না পাওয়া যায়, যতদিন জ্ঞানকে শিব ও প্রাণকে বিষ্ণু বলিয়া বুঝিতে না পারা যায়, অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণমাত্র যাহার লক্ষ্য অন্তরস্থ জ্ঞান ও প্রাণের কেন্দ্রকে স্পর্শ না করে, ততদিন সে কিরূপে শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবে? শরণ না লইলে মহিষাসুর বধের উপায় হয় না। তাই আবার বলি—সাধক। যে কোন স্থানে আপনাকে ছাড়িয়া দাও। ভগবান বলিয়া ছাড়িও! তোমার আশ্রয়, জড়পদার্থ হইলেও সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। জড়প্রতিমা কিংবা জড়দেহ তোমার ভগবৎ জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মাইবে না। নিষাদপুত্র একলব্য মৃণ্ময় দ্রোণমূর্ত্তির নিকট অভূতপূর্ব্ব অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যে তোমারই অন্তরে অবস্থিত! বাহ্য বস্তু—বাহ্য আশ্রয় সেই জ্ঞান উন্মেষের অবলম্বন মাত্র।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। দেবতাবর্গের এইরূপ শোচনীয় অত্যাচার শ্রবণ করিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু ক্রোধান্বিত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিকুটিলভাব ধারণ করিল।

ব্যাখ্যা। সন্তান—উৎপীড়িত! জড়ত্ব কর্ত্তৃক চৈতন্যের কল্পিত আবরণ মা আর কতদিন সহ্য করিবেন। প্রাণশক্তি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রলয়ের দেবতা গুরু—শম্ভু ক্রোধোদ্দীপিত হইয়াছেন। মায়ের রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবার সময় হইয়াছে, আর রক্ষা নাই। এইবার মহিষাসুরের নিধন অনিবার্য্য।

সাধক! সত্যসত্যই যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে উৎপীড়িত বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে, সত্যসত্যই যে মুহূর্ত্তে তুমি কাঁদিয়া বলিবে—"মা! আমি বড়ই উৎপীড়িত। আর এই অসুরের অত্যাচার, আর এ জগদ্ভার বহন করিতে পারি না। একবার তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও," সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবে—তোমার প্রাণ, যিনি ইতিপূর্ব্বে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রাণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি শম্ভু, যিনি জগন্মঙ্গল-বিধায়ক, মাতৃ-যজ্ঞের সর্ব্ব প্রধান হোতা, তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটীকুটিল হইয়াছে।

প্রাণ ও জ্ঞান যতদিন আত্মশক্তি—আত্মভাব বিস্মৃত হইয়া বহুত্বের মোহে জগতের খেলায় মুগ্ধ থাকে, ততদিন এই ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু এখন তাঁহারা মনের নিকট হইতে অসুরের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপক ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যখন দেখিলেন যে, অপূর্ব্ব গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধক-বরেণ্য অর্জ্জুন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করিতেছেন না, শুধু আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়া যাইতেছেন, তখন অর্জ্জুনের প্রাণে ব্যথা দিয়া ক্রোধের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য, অভিমন্যুবধের চক্রান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইরূপ সাধক যতদিন পূর্ণোদ্যমে—সম্যক্ অধ্যবসায় প্রয়োগে সাধন-সমরে অবতীর্ণ না হয়, ততদিন মা আমার ধীরে ধীরে অসুরবল পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেবশক্তির উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিতে থাকেন। একটু প্রবল আঘাত—প্রবল অত্যাচার না হইলে, সত্যই আমাদের আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হয় না। আমরা যে মহাশক্তিমান্, আমাদের মধ্যে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী মহাশক্তি বিদ্যমান, ইহা আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই অসুর-অত্যাচাররূপে মাতৃ করুণাধারা প্রবাহিত হয়। রূপরসাদি বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করার একমাত্র উদ্দেশ্য—আত্মশক্তি স্ফুরণ। প্রথম প্রথম উহারা উপেক্ষিত থাকে। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সহিষ্ণুতা ও উপেক্ষার সীমা

অতিক্রম করে, তখন আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। প্রাণ ও জ্ঞান-শক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সাধকগণ ইহা আত্মজীবনে নিশ্চয়ই অনুভব করিয়া থাকেন এ সকলই মহামায়ার—মায়ের আমার অচিন্তনীয় লীলা, অভূতপূর্ব্ব আনন্দময় বিলাস মাত্র।

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অনন্তর অতি কোপপূর্ণ চক্রধারী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা ও শিবের বদনমণ্ডল হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে দুইটী "ততঃ" শব্দ আছে। প্রথমটীর অর্থ—অনন্তর এবং অন্যটীর অর্থ—প্রসিদ্ধ, উহা বদনের বিশেষণ। বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব অতিশয় কোপান্বিত হইয়াছিলেন; তাই তাহাদের স্ব স্ব তেজ স্বকীয় শরীরে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বাহিরে নির্গত হইল। যেরূপ কোনও জলপূর্ণ কটাহের নিম্নে অগ্নিসন্তাপ প্রদান করিলে, সেই জল কটাহের বহির্দ্দেশে নির্গত হয়; ইহাও সেইরূপ। এই মন্ত্রের তাৎপর্য একটু বিশেষ রহস্যপূর্ণ। এস সাধক! আমরা মাতৃ-চরণে প্রণত হইয়া ধীরভাবে অগ্রসর হই। মা বিজ্ঞানময়-মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, অতি গহন রহস্যপূর্ণ চণ্ডীতত্ত্ব উদ্ভাসিত করুন, আমরা ধন্য হই।

ক্রোধ বা তেজ বস্তুটা কি? মন প্রাণ ও জ্ঞানের যে পরমাত্মাভিমুখী বিশেষ উদ্বেলন, তাহাই অসুরের অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তিনিচয়ের পক্ষে ক্রোধ। ক্রোধের উদয় হইলেই তেজ প্রকাশ পায়। মানুষ যখন কোন কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে। উহাই ক্রোধ-জন্য তেজের বহিঃপ্রকাশ। এস্থলেও উক্ত দেবতাত্রয়ের যে পরমাত্মাভিমুখী রজোগুণাত্মক অভিস্পন্দন, তাহাই ক্রোধ। পূর্ব্বে মহিষাসুরকে কাম ক্রোধাদির মূলীভূত

রজোগুণরূপে বুঝিয়া আসিয়াছি। এখানে আবার দেবতাগণেরও সেই ক্রোধ—সেই রজোগুণেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছি।

এইরূপই হইয়া থাকে। যেরূপ কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ ক্রোধের দ্বারা ক্রোধের নিপাত করিতে হয়। ইহা মনোবিজ্ঞানের একটী সুন্দর রহস্য। অনেকে বলেন—"অক্রোধের দ্বারা ক্রোধের, নিষ্কামের দ্বারা কামের ও অহিংসার দ্বারা হিংসার জয় করিতে হয়। অর্থাৎ কোন বিরোধী বৃত্তির উদ্বেলন দ্বারা অপর বিরুদ্ধ বৃত্তিকে দমন করিতে হয়।" আমরা কিন্তু দেখিতে পাই—উহাতে অনেক বেগ পাইতে হয়, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে হয়। বহুদিন ঐরূপ অনুশীলনের ফলে—ধৈর্য্যশীল সাধক কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করিতে পারেন। দেবীমাহাত্ম্যের ঋষি কিন্তু এরূপ কথা বলেন না। তাঁহার অভিপ্রায় ক্রোধকে জয় করিবে ত ক্রোধের প্রতি ক্রোধ কর। এইরূপ কামকে জয় করিবে ত কামের কামনা কর। (সে কথা শুম্ভবধে দেখিতে পাইবে)। যে ব্যক্তি কোপন-স্বভাব, তাহার ক্রোধবৃত্তি অতিশয় উদ্দীপনশীল—অনায়াসেই উদয় হয়। একবার যদি তাহাকে ক্রোধের উপর ক্রোধ করিবার কৌশল শিখাইয়া দেওয়া যায়, তবে সে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে অক্রোধ অর্থাৎ ক্ষমাবৃত্তির অনুশীলন করিতে বলিলে, তাঁহার কৃতকার্য্যতা লাভ কষ্টসাধ্য।

এইরূপ যদি হিংসাকে দূর করিতে চাও, তবে হিংসাই কর; কিন্তু হিংসার প্রতি। এইখানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা বলিয়া রাখি—সাধকগণের মধ্যে যাঁহার যে বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল, তিনি সেই বৃত্তি দ্বারাই মাকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবেন। কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি সাধুবৃত্তি দ্বারাই যে মাতৃযুক্ত হইতে হইবে, এমন কথা মা বলেন না। কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসাধু বৃত্তিগুলিও যোগযুক্ত হইবার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বৃন্দাবনে গোপীগণ কামবৃত্তি দ্বারা, মথুরায় কংস ভয়বৃত্তি দ্বারা, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু হিংসাবৃত্তি দ্বারা, চেদিরাজ শিশুপাল দ্বেষবৃত্তি দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত

হইয়াছিল। ভগবান্‌ও তাহাদিগকে স্বকীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে কৃপণতা করেন নাই। ওরে, মা আমাদিগকে এমন কথা বলেন না যে, তোদের ভাল ভাল বৃত্তিগুলি বাছিয়া লইয়া আমার কাছে আয়। তিনি বলেন—সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছ—ভাল হউক, মন্দ হউক, সাধু হউক, অসাধু হউক, প্রশংসিত হউক, অথবা নিন্দিত হউক, যে, কোন ভাবের সাহায্যে আমার শরণাগত হও। যে কোন বৃত্তি দ্বারা শুধু আমার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা কর। যে কোনরূপে আমার সমীপে আসিতে চেষ্টা কর। আমি তোমাদিগকে সাযুজ্য প্রদান করিব। আমি মা, তোমরা সন্তান, তোমাদিগের কি ভাল কি মন্দ, তাহা দেখিবার চক্ষু আমার নাই। আমি দেখি—শুধু আমার দিকে তোমরা মুখ ফিরাইতে পারিয়াছ কি না। তোমরা জগতের দিক্ হইতে ধীরে ধীরে আমার দিকে মুখ ফিরাইবে, ইহাই আমার লক্ষ্য। মুখ ফিরাইতে কিরূপ বৃত্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা বিচার করিবার অবসর আমার নাই। আমি যে তোমাদের মা।

জানি মা, তুমি স্নেহে অন্ধা—আমার ভালমন্দ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই, কিন্তু আমরা যে কোনও বৃত্তির দ্বারাই তোমাতে নিত্যযুক্ত হইতে পারিতেছি না; কি ভাল কি মন্দ, কোন একটা বৃত্তির সাহায্যেও তোমাতে আত্মহারা হইতে পারি না। পারিয়াছিল হিরণ্যকশিপু। এমন ভাবে বিদ্বেষ বৃত্তিদ্বারা তোমার সহিত যোগযুক্ত হইয়াছিল যে, তাহার আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত ভগবর্দ্‌বিদ্বেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইত। তোমার প্রতি এমনই বিদ্বেষ ভাব সে পোষণ করিতে পারিয়াছিল—যাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকেও মৃত্যুর কবলে প্রেরণ করিতে বহুবার চেষ্টা করিয়াছে। যে ভগবদ্‌বিদ্বেষ ভগবৎপ্রিয় আত্মজকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইতে পারে, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। যে বিদ্বেষের ফলে মা-তুমি জড় স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, হিরণ্য-কশিপুর স্থূল দেহের প্রত্যেক তন্ত্রীগুলি পর্যন্ত তোমার পবিত্র

অঙ্গে বেষ্টন করিয়াছিলে, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত! যে ভগবদ্বিদ্বেষীর আত্মজ সন্তান—প্রহ্লাদ, সে বিদ্বেষের পরিমাণ কত, তাহা কি আমারা ধারণাও করিতে পারি? আমরা দুর্ব্বল সন্তান! আমাদের মনে অত বল নাই মা? ওরূপ বল থাকিলে ত তুমি স্বয়ংই আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে ধন্য করিতে! তাহাতে তোমার মাতৃত্ব-ধর্ম্মের বিশেষ বিকাশ হইত কি? যে বলবান্, সে ত আত্মলাভ করিতে পারিবেই; কিন্তু যাহারা আমাদের মত দুর্ব্বল, যাহাদের চিত্ত সংশয়ের দ্বারা আকুল, অবিশ্বাসের দ্বারা কলুষিত, যাহারা কাম ক্রোধাদি আসুরিক বৃত্তিদ্বারা-উৎপীড়িত, এমন সন্তানগণকে যদি তুমি বুকে টানিয়া লও, বাহু বেষ্টনে চির আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবেই ত মা তোমার মাতৃত্ব-ধর্ম্মের সম্যক্ স্ফূরণ হয়। দুর্ব্বল মেষশিশুর ন্যায় আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের সংশয়-আন্দোলিত মাতৃ-আহ্বান যদি তোর স্নেহপূর্ণ বিশাল বক্ষে বিন্দুমাত্র আন্দোলন তুলিতে পারে, যাহার ফলে তুই দুর্ব্বলের মা—জগতের মা বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারিস, তবেই ত তোর মা নাম সার্থক হয়, আর আমরাও ধন্য হইয়া যাই।

সাধক! তোমার যে বৃত্তি যখন অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে প্রকাশ পাইবে তখন সেই বৃত্তি দ্বারাই মাকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে। এই উপায়ে অতি সহজে বৃত্তিনিগ্রহ সাধিত হয়। এখানেও ক্রোধমূলক মহিষাসুরকে দমন করিবার জন্য আবার ক্রোধেরই উদ্বেলন দেখিতে পাইতেছি। কিরূপে ইহা হয়? শুন, একই রজোগুণ, উহার দ্বিবিধ বিকাশ। এক বহির্মুখ—যাহার স্থূল বিকাশ—কাম ক্রোধ ইত্যাদি। অপর অন্তর্মুখ—যাহার স্থূল প্রকাশ—পরবৈরাগ্য শম দম উপরতি তিতিক্ষা ইত্যাদি। যে রজোগুণ মহিষরূপে—কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপে সংসারগতিকে একান্ত প্রিয় বোধে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষী, সেই রজোগুণই আবার পরবৈরাগ্য রূপে প্রকাশ পাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী। ইহাইত মহিষাসুরের

সহিত দেবগণের সংগ্রাম। যখন বহির্মুখী যে বৃত্তি প্রবল হয়, তখন অন্তর্মুখে সেই বৃত্তির সমজাতীয় বৃত্তি প্রবাহ উদ্বোধিত করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। "সমঃ সমং শময়তি" কথাটা খুবই মূল্যবান। সাধকগণ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তবে যোগাদিশাস্ত্রে যে ক্রোধাদি-বৃত্তিনিগ্রহের উপায় স্বরূপ তদ্‌বিরোধী অক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তির সাধনা বিহিত আছে; উহাকে সাধনার ফল বলিয়া বুঝিবে—অর্থাৎ ক্রোধকে দমন করিতে হইলে ক্রোধের প্রতি ক্রোধ করিতে হয়, তাহার ফল হইবে—অক্রোধ। এইরূপ হিংসার প্রতি হিংসা করিলে, তাহার ফল হইবে—অহিংসা। এইরূপ সর্ব্বত্র।

এখানেও ঠিক এইরূপই আমরা অসুরের প্রতিকূল ব্রহ্মাদির ক্রোধ দেখিতে পাইলাম। জীব! যেদিন তোমার মন প্রাণ ও জ্ঞান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, "আর অসুর-অত্যাচার সহ্য করিব না" বলিয়া উদ্বেলিত হইবে, সেই দিনই বুঝিবে—অসুরনিগ্রহের সময় আসিয়াছে।

নিশ্চক্রাম মহত্তেজঃ—তেজশব্দের অর্থ জ্যোতি—প্রকাশ। মনোময়, জ্ঞানময় এবং প্রাণময় জ্যোতি উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিল অর্থাৎ স্থূলে প্রত্যক্ষ হইল। সত্য সত্যই এই জ্যোতি দর্শন হয়। মনোময় জ্যোতি রক্তবর্ণ; প্রাণময় জ্যোতি শ্যামবর্ণ এবং জ্ঞানময় জ্যোতি শুভ্রবর্ণ। যাঁহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন অর্থাৎ জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া প্রশান্ত উদার মহান্ চিদ্‌ব্যোমের সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহাদের উহা আয়ত্তীভূত হইয়াছে—অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই উদিত হয় এবং অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থির থাকে, তাঁহারা ঐ ব্যোমকে মনোময় ধারনা করিলেই ব্রহ্মতেজ বা রক্তবর্ণ জ্যোতি দেখিতে পাইবেন। এইরূপ প্রাণময় ধারণায় শ্যামবর্ণ, এবং জ্ঞানময় ধারণায় রজতগিরিনিভ শুভ্রবর্ণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ ঐ তেজ আজ্ঞা-চক্র হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়; তাই মন্ত্রে "বদনাৎ" কথাটি বলা হইয়াছে।

আবার সাংখ্য-যোগ দৃষ্টিতেও ঐ মহৎ তেজই মহৎতত্ত্বরূপে পরিলক্ষিত হয়। মহৎতত্ত্বের উদয় অর্থাৎ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত

বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য চঞ্চলতা, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞানজন্য সুখ দুঃখের উৎপীড়ন, এ সকল বিদূরিত হয় না। কিন্তু মহৎতত্ত্বে একবার মাত্র আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলে, জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বোধ সমূলে বিলয় হয়। এই মহৎতত্ত্ব ঈশ্বর। তাই ইহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব সম্বন্ধীয় তেজ বলা হইয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি ও লয় মহৎতত্ত্বেই হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে—পুরুষসূক্তে ইনি হিরণ্যগর্ভ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে।

অন্যেষাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের শরীর হইতেও সুমহৎ তেজ নির্গত হইল, এবং ঐ সকল তেজ একত্র সম্মিলিত হইল।

ব্যাখ্যা। দেবতাতত্ত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবশক্তিও ব্রহ্মাদির ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার ফলে—প্রত্যেক দেবতার অঙ্গ হইতে সুমহৎ তেজ নির্গত হইল। এবং ঐ সকল তেজ একত্র পুঞ্জীভূত হইল; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই দেব ও অসুর ভাব আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মনে কর—চক্ষু। সে একদিকে যেমন ভৌতিকরূপে আকৃষ্ট, অন্যদিকে তেমনই রূপাতীত বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে উৎসুক। যতদিন মানুষের এ ভাবটি না আসে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিচয় কেবল বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট থাকে, ক্ষণকাল তরেও ভগবৎমুখী হইতে না চায়, ততদিন বুঝিতে হইবে—এখনও চণ্ডীতত্ত্ব বুঝিবার মত সময় হয় নাই। সে যাহা হউক, অসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেবশক্তিবৃন্দ যখন দেখিতে পাইল—তাহারা যাঁহাদের আশ্রিত, যাঁহাদের সত্তায় তাহাদের সত্তা তাঁহারাই যখন সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাহাদেরও ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। মন প্রাণ ও

জ্ঞান যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তখন তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণ যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সাগরে জোয়ার হইলে নদী নালায়ও জোয়ার হয়। মন—ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, প্রাণ—ইন্দ্রিয়ের ধারক, জ্ঞান—ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। যখন উহাদের তেজ নির্গত হইয়াছে, তখন তদাশ্রিত ইন্দ্রিয়বর্গ হইতেও তেজ নির্গত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রিয়ের তেজ বস্তুটা কি? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ শক্তি আছে। চক্ষু কর্ণাদি কিংবা বাক্ পাণি প্রভৃতি, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র প্রকাশ-শক্তি বিদ্যমান। জ্ঞানের প্রকাশেই উহারা প্রকাশময়। যেরূপ সব জলই সমুদ্রের জল, তথাপি নদীর ভিতর যে জল থাকে, তাহাকে নদীর জল কহে; সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশময় হইলেও প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকাশসত্তা আছে। উহারা এতদিন ব্যষ্টিভাবে কার্য্য করিতেছিল, সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অসুরবিজয়ে যত্নবান ছিল, তাই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আজ সকল ব্যষ্টিশক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, এইবার দেবশক্তি পূর্ণবলে বলীয়ান্; সুতরাং অসুর-দমনও অনিবার্য্য। জাগতিক ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়—যখন কোন জাতিবিশেষের অভ্যুদয় আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের ব্যষ্টিশক্তিসমূহ সমবেত করিতে হয়, এবং তাহা হইলেই অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সাধনা জগতেও ঠিক সেইরূপ।

ইন্দ্রিয়নিচয় স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একই উদ্দেশ্যে সমবেত-শক্তি নিযুক্ত করিয়াছে। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত"। একতাই কার্য্যসিদ্ধির অমোঘ উপায়। ইন্দ্রিয়ের একতাই বা কি, আর পৃথক্‌ভাবই বা কি? মনে কর—যতদিন কেবল চক্ষু ইন্দ্রিয়টি ভৌতিকরূপে আকৃষ্ট না হইয়া বিশ্বময় মাতৃরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি তাহার সহায় হয় না, ততদিন শত চেষ্টাতেও সে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারে না; কিন্তু যখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রাণ ও জ্ঞানের সম্মিলন হয়, তখন উহা অসীম শক্তিসম্পন্ন হইয়া অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। অন্যান্য

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরস্পর সহায়তাও আছে। প্রত্যেক সাধক, স্বকীয় জীবনে এই সকল বিষয় একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিবার উপায়—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে সমাহিত হওয়া। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধন সময়ে রাজা সুরথ সমাধির সহিত অগ্রসর হইতেছে। জীব যখন সমাধিস্থ হইতে সমর্থ হয়—তখনই এই সকল তত্ত্ব স্ফুরিত হইতে থাকে। যে একমাত্র অখণ্ড ঘন চিদ্‌রস ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই পরিচ্ছিন্ন চিৎশক্তিতে সমাহিত হইলেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকাশসত্তা পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব ও অবস্থা ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহারই নাম ইন্দ্রিয় জয়। সে যাহা হউক, ঐ সকল বিভিন্ন প্রকাশ বা জ্যোতি বিভিন্ন বর্ণের পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আবার সাধকগণের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনুসারেও উহাদের বর্ণগত বিভিন্নতা হয়। যাহার যে গুণ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশশীল, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশও সেই গুণের বর্ণবিশিষ্ট হয়। সত্ত্বগুণ—শুভ্র, রজোগুণ—রক্ত এবং তমোগুণ—কৃষ্ণবর্ণ। ইহাই গুণত্রয়ের মৌলিক বর্ণ। ইহাদের সংমিশ্রণ-তারতম্যে ইন্দ্রিয়শক্তির বর্ণগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

এখানেও "মহৎতেজঃ" শব্দে মহৎতত্ত্বই বুঝিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশশীলতাহেতুই এই মন্ত্রে মহৎকে তত্ত্ব না বলিয়া, তেজ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ যতদিন স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায়, ততদিন সাধক এতেজের সন্ধানই পায় না। যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গত ব্যষ্টিপ্রকাশ এক সমষ্টি প্রকাশকেন্দ্রে উপনীত হয়—অর্থাৎ যাহার প্রকাশে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশ, সেই মূল প্রকাশে উপনীত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় ইহাই মহৎতত্ত্ব, ইনিই ধী বা গায়ত্রী, ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বরী। এখানে উপনীত হইলে "ঐক্য" অর্থাৎ একভাবই বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পায়। কি মনোরম এ স্থান! যুগপৎ একত্ব বহুত্বের

প্রকাশ যে কিরূপে হয়, তাহা এইস্থানে আসিয়া সাধকগণ বুঝিতে পারেন। বিস্ময়ে আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর এইস্থানে দাঁড়াইয়াই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—"বিশ্বং-দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরী-তুল্যং নিজান্তর্গতম্"।

———

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ১১॥

অনুবাদ। সেই দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন—প্রজ্জলিত পর্ব্বতের ন্যায় তেজোরাশির শিখাসমূহ দিগন্তপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়াছে; তাই এত স্থূল ও ঘন হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দেবতাগণ উহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সাধনাপথে এইরূপ প্রত্যক্ষতা যতদিন না আসে, ততদিন সাধকের গতি খরতর হয় না। অনুমানের উপর সাধনা কতদিন চলে? অতিশয় ধীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তিরও শেষে একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসিয়া পড়ে। যোগদর্শনেও উক্ত হইয়াছে—"অলব্ধভূমিকত্ব" সাধনার অন্তরায়। সুতরাং প্রত্যক্ষতার একান্ত প্রয়োজন। মাতৃ-কৃপায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অন্তর্মুখী হইয়া একটু স্থির হইলেই এইরূপ দিগন্তব্যাপী জ্যোতিদর্শন হইয়া থাকে। জগতে কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সহিত উহার তুলনা হয় না। যোগশাস্ত্র যাহাকে "বিশোকা" বা জ্যোতিষ্মতী" বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার উদয়ে সাধকের সর্ব্ববিধ শোক দূরীভূত হয়, যাহার প্রকাশ হইলে জীব তীব্রবেগে ভগবৎমুখী গতি অবলম্বন করে, সাধকগণ যাহাকে ঈশ্বরীয় জ্যোতি বা মায়ের গাত্রপ্রভা বলিয়া থাকেন; উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই, সাধক মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে "দদৃশুঃ" পদটী প্রয়োগ হইয়াছে।

এইবার একটু সাধনার কথা বলিতেছি—পূর্ব্বে যে চিদাকাশের বিষয় বলা হইয়াছে, উহাতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ আরোপ করিতে হয়। দিক্‌সত্তা, অনন্তসত্তা, জ্যোতিঃসত্তা ও মন-প্রাণসত্তা, ব্রহ্মের এই চারিটী পাদ—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। চিদাকাশে যথাক্রমে দিক্ ও অনন্তসত্তা আরোপ করিয়া, তৃতীয় পাদ জ্যোতিঃসত্তা আরোপে অভ্যস্ত হইলে, ঐ আকাশ দিগন্তব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ পায়। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি ও বিদ্যুৎ, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্পাদ। উহার আরোপে দিগন্তব্যাপী অতুলনীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। ইহা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-দর্শনের একপ্রকার উপায়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সত্তায় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া, ধীরে ধীরে মন প্রাণ ও বুদ্ধিতে উপনীত হইলে, অর্থাৎ কেবলমাত্র অস্মিতায় উপস্থিত হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই "অতীব তেজসঃ কূটম্"।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ ১২॥

অনুবাদ। সমস্ত দেবতার শরীর হইতে সমুদ্ভূত সেই অতুলনীয় তেজ একস্থ অর্থাৎ সম্মিলিত হইলে, তাহা একটি নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তাঁহার কান্তি ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, উহা মাত্র তেজস্তত্ত্ব নহে, অর্থাৎ তত্ত্ববৎ একটা জ্যোতির্ম্ময় সত্তামাত্র নহে। উনি "একজন"—উহার ব্যক্তিত্ব আছে। যাবতীয় ব্যক্তিধর্ম্ম উহাতে পূর্ণভাবে পরিব্যক্ত। দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ গমন গ্রহণ নিগ্রহানুগ্রহ-শক্তি ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম্ম উক্ত জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজিত। ইহা বুঝাইবার জন্যই "একস্থং তদভূন্নারী"। জ্যোতিটী যে একটী নারী বা শক্তিবিশেষ, তাহাই মন্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে। নারী শব্দে কেবল একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বুঝায় না। নারী শব্দের অর্থ শক্তি; উহাই সাধকের

ইষ্টদেব। এস্থলে নারী শব্দে—কৃষ্ণ কালী শিব প্রভৃতি যে কোন মূর্ত্তিই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই শক্তিবিশেষ। শক্তি যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এখানে নারী শব্দের অর্থ—মূর্ত্তি। মূর্ত্তি শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই মন্ত্রে নারী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কি প্রকারে বিশিষ্টমূর্ত্তি দর্শন হয়, এস্থলে "একস্থং তদভূন্নারী" শব্দে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সকল সাধকেরই এইরূপভাবে ইষ্টদর্শন হয়। কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকল মূর্ত্তি-আবির্ভাবের ইহাই রহস্য—সর্ব্বপ্রথমে একটী ঘন চিন্ময় জ্যোতি বা প্রকাশসত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। পরে উহা সাধকের ভক্তি-হিমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুরূপ মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে মানের কল্পনা ঘনীভূত হইয়াও বিশিষ্টমূর্ত্তি দর্শন হইতে পারে; কিন্তু তাহা মুক্তি প্রদান কিংবা সাধকের অভীষ্টপূরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সাধক! তুমি কি তোমার ইষ্টমূর্ত্তিকে এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে চাও? উহা একটু কষ্টসাধ্য হইলেও নিতান্ত অসম্ভব বা দুর্লভ নহে। তুমি যতই চঞ্চলচিত্ত হওনা কেন, যত বিক্ষিপ্ততাই তোমার থাকুক না কেন, সযত্নে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, চিদাকাশ প্রকাশিত হউক; তাহাতে জ্যোতিঃসত্তার আরোপ করিয়া অভীষ্ট মূর্ত্তিদর্শনের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা কর। দেখিবার জন্য সরল-প্রাণ শিশুর ন্যায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাক। দেখিবে অচিরাৎ তোমার আশা পূর্ণ করিয়া, স্থূল দেহের ন্যায় দেহবিশিষ্ট ইষ্টদেব আবির্ভূত হইবেন। ইহা শুধু বাক্যবিন্যাস নহে, সত্যসত্যই মানুষ এইরূপ দেখিতে পায়। কিন্তু মনে করিও না সাধক, শুধু এইরূপ একটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তোমার জীবন ধন্য হইবে। যতদিন ঐ মূর্ত্তি মহত্বযুক্ত না হয়, যতদিন প্রাণময় মূর্ত্তি দর্শন না হয়, ততদিন উহা তোমাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে না।

যাহারা প্রথম হইতেই কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি লইয়া সাধনা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা ঐ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী

মহতীশক্তি ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। যেরূপ সূর্য্য একস্থানে থাকিয়াও তাঁহার প্রকাশ ও আকর্ষণী শক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; ঠিক সেইরূপ তোমার ইষ্টমূর্ত্তিও বিশ্বব্যাপী মহতী শক্তিসমন্বিত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। এইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ মহত্ত্বযুক্ত মূর্ত্তিদর্শনই যথার্থ দর্শন। এইরূপ দর্শনের পর, উহাতে আত্মভাবে সংস্থিত হইতে অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ যিনি আমার অন্তরে আত্মারূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে মহত্ত্ব-মণ্ডিত ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকাশিত; এইরূপ বুঝিতে হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে।—"তেষামেবানুকম্পার্থমহম-জ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" যতদিন মূর্ত্তি আত্মভাবস্থ না হয় অর্থাৎ যতদিন ইষ্টদেবতা স্বয়ং অনুকম্পাপূর্ব্বক সাধকের আত্মরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন অজ্ঞান-অন্ধকার কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। সুতরাং কেবল ইষ্টমূর্ত্তি কেন, জগতের প্রত্যেক-মূর্ত্তিকেই আত্মভাবস্থ করিয়া দর্শন করিতে হয়। তবে কথা এই যে, ইষ্টমূর্ত্তিতে আত্মভাবস্থ হইতে পারিলে, অন্যত্র উহা সহজসাধ্য হয়। এইরূপে সর্ব্বত্র আত্মভাবস্থ হইতে পারিলেই সাধকের সর্ব্ববিধ সংশয়ের উচ্ছেদ হয়, অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন অমৃতের আস্বাদ পাইয়া সাধক অমর হয়, আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে।

কি উপায়ে মূর্ত্তি আত্মভাবস্থ হয়? প্রথমে ইষ্টমূর্ত্তিকে আত্মীয় করিয়া লইতে হয়। আত্মীয়তাই আত্মার ধর্ম্ম। তিনি যে আমার একান্ত আত্মীয়, ইহা বুঝিতে হয়। জগতে আত্মীয়গণকে যতটুকু ভালবাস, অন্ততঃ ততটুকু ভালবাসাও তাঁহার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা কর একবার যদি তোমার ঐ অশুদ্ধ বিন্দুমাত্র প্রেম তাঁহার চিন্ময় অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে তিনিই উহাকে বিশুদ্ধ ও সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিবেন। তখন তুমি প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। যে মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইষ্টমূর্ত্তি তোমার আত্মভাবস্থ হইবেন। মনে রাখিও—আত্মহারা না হইলে আত্মভাব ফোটে না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—ব্রজধামে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা পর্য্যন্ত করিয়াছিল ; কিন্তু যতদিন শ্রীকৃষ্ণই যে "আত্মা" এই পরাভক্তি, এবং উনিই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বর, এই মহত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইয়াছিল, ততদিন তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও পায় নাই। তাই তিনি গোপীগণকে নিজ নিজ আত্মারূপে সাধনার উপদেশ দিয়া, দীর্ঘকালের জন্য দূরস্থ হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম—মূর্ত্তিদর্শন করিলেই ভগবদ্‌লাভ হয় না। উঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা চাই। যে পরিমাণে মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, অর্থাৎ যতটুকু মহত্ত্ব নিয়া তিনি প্রকাশিত হইবেন, একবার মাত্র দর্শনে সাধক স্বয়ং ততটুকু মহত্ত্বযুক্ত হইবেন। জীব ? তুমি মাকে যতটুকু দেখিবে, মায়ের ততটুকু লক্ষণ তোমাতে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। মাকে দেখিলে অথচ তোমার সংসার-আসক্তি কমিল না, সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের দ্বন্দ্ব কমিল না, চিত্তের একটা প্রশান্তভাব আসিল না, মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল না, ইহা হইতেই পারে না। মা যে আমার সর্ব্বতঃ স্পৃহাশূন্যা, মা যে আমার নির্বিকারা, মা যে আমার অমৃতস্বরূপা, মা যে আমার এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্যে নিত্য নিরত থাকিয়াও ধীরা স্থিরা নির্ব্বিকল্পা। ওগো ! তোমরা এমন মাকে একবার দেখিয়াও সাধারণ জীবের মত সুখ দুঃখে চঞ্চল, মৃত্যুভয়ে ভীত, সংসারে আসক্তিযুক্ত থাকিবে ? তা কি হয় ! কখনই নয়। কিন্তু সে অন্য কথা :—

যাহা হউক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের যে প্রকাশভাব, তাহাই তেজ। উহা একীভূত হইয়াছে। একটা মহাপ্রকাশে সমস্ত বিশ্ব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। হ্যাঁ, প্রকাশের এমনই ক্ষমতা বটে ! সমগ্র বিশ্ব বিলুপ্ত হয়। কথাটা একটু খুলিয়া বলিতেছি—তোমরা "এক্‌সরে" নামক আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের বিষয় অবগত আছ। ঐ যন্ত্রটীর দ্বারা চিকিৎসকগণ শরীরাভ্যন্তরস্থ অস্থি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সে যন্ত্রের কিরণরেখাগুলির এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা যে, চর্ম্ম মাংস রক্ত প্রভৃতি

কোমল জিনিষগুলি ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে, জগতের সমস্ত পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং জগৎসত্তা বিলুপ্ত হয় এমন কি, দেশ কাল পর্য্যন্ত প্রতীত হয় না। "ক্স্রে" যন্ত্র কেবল অস্থি বা তদনুরূপ কঠিন জিনিষেই প্রতিহত হয়; কিন্তু বিজ্ঞানজ্যোতি কিছুতেই প্রতিহত হয় না।

ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—আলো বা প্রকাশ যে স্থলে প্রতিহত অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই প্রকাশিত করে। সূর্য্যাদির কিরণে যে আমরা রূপাদি প্রত্যক্ষ করি, তাহারও রহস্য এই। সূর্য্যরশ্মি যে বস্তুতে প্রতিহত হয়, অর্থাৎ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, সেই বস্তুই আমরা দেখিতে পাই। আকাশ ও বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ চলিয়া আইসে, তাই উহা অদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীতে আসিয়া প্রতিহত হয় বলিয়াই পার্থিব বস্তুসমূহ আমরা দেখিতে পাই। আরও দেখ—তুমি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরটী দেখিতে পাইতেছ, ইহার অর্থ এই—তোমার নেত্রপথ দিয়া যে প্রকাশশক্তি নির্গত হইতেছে, তাহা প্রাচীর পর্যন্ত গিয়া আর যাইতে পারিল না। উহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে; তাই তুমি প্রাচীর দেখিতেছ। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কি আছে, তাহা তোমার নেত্রনির্গত প্রকাশশক্তির দেখাইবার সামর্থ্য নাই। এইরূপ আমরা যখনই যাহা কিছু দেখি, শুনি, গন্ধ লই, আস্বাদ করি, স্পর্শ করি, অর্থাৎ এককথায় জানি; উহার অর্থ—"অনেকাংশই জানি না।" জানি মানেই—এক অংশ মাত্র পরিজ্ঞাত। আমার জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে, জ্ঞেয় বস্তুর সম্পূর্ণ অংশ আমাকে জানাইতে পারে না। সেই জন্যই জাগতিক জ্ঞানের নাম—অজ্ঞান বা ঈষৎ জ্ঞান। একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ—যে মুহূর্ত্তে তুমি বল—"আমি বৃক্ষটী জানি", সেই মুহূর্ত্তেই ঐ জানার পার্শ্বেই একটা মস্ত বড় অজ্ঞান থাকিয়া যায়। "বৃক্ষ জানি" বলিলেই—সেই মুহূর্ত্তে "বৃক্ষ ভিন্ন অন্য কিছু জানি না" এইরূপ একটা অজ্ঞান ঐ জ্ঞানের পার্শ্বেই দাঁড়ায়; সুতরাং জগতের প্রত্যেক বিষয়ই

এই জানা ও অজানার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞান যে আছে, তাহা জ্ঞানই জানাইয়া দেয়। বেদান্ত দর্শন বলেন—এই জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানের নাম মায়া। সে যাহা হউক, প্রকাশ বলিলে—একমাত্র জ্ঞানই বুঝায়। অন্তরে যাহা জ্ঞান, বাহিরে তাহাই তেজ; অন্তরে যাহা অজ্ঞান, বাহিরে তাহা অন্ধকার। জ্ঞানটী হইতেছে চিৎ অর্থাৎ চেতন। এই জ্ঞান বা চৈতন্যের উপলব্ধি করিতে পারিলেই, স্বপ্রকাশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ স্বপ্রকাশ বস্তু তখন দিগন্তপ্রসারী হইয়া পড়ে। এমন কোন পদার্থ নাই যে, সেই প্রকাশকে প্রতিহত করিতে পারে। সর্ব্বতোভেদী সে প্রকাশ যাবতীয় পদার্থসত্তা ভেদ করিয়া—প্রত্যেক পরমাণুকে শতধা, সহস্রধা ভেদ করিয়া মহতী ব্যাপ্তি লাভ করে। সুতরাং জগৎসত্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কোন পদার্থই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

এই অবস্থায় দেশ এবং কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। কারণ পদার্থ-দ্বয়ের অন্তরাল দ্বারা আমরা দেশনামক বস্তু অনুভব করি। যদি কোন পদার্থই প্রতীতিগোচর না হয়, তবে দেশের জ্ঞান থাকিতে পারে না। তার পর কাল। কাল কি? ক্রিয়াদ্বয়ের অন্তরালদ্বারা আমাদের কাল নামক একটা বস্তুর অনুভব হয়। কেহ বলেন ক্রিয়ার—অধিকরণই কাল। কেহ বলেন—ক্রিয়াই কাল। ওসকল মতভেদ বস্তুসত্তা অববোধের কোন হানি নাই। উহার সকল মতই সত্য। যাহা হউক আমরা কিন্তু ক্রিয়ার দ্বারাই কালকে বুঝি। একবার সূর্য্যোদয় দেখিলাম, আবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া বলি—একদিন গেল। বস্তুতঃ কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান—কাল যায় না। আমরা চঞ্চল—গতিশীল বলিয়াই দেখি—"কালোগচ্ছতি"। বাস্তবিক তাহা নহে। দ্রুতগামিশকটারূঢ় ব্যক্তি যেমন পথিপার্শ্বস্থ ভূভাগকে গমনশীল দেখিতে পায়, ইহাও সেইরূপ। যাক্ সে কথা, আমরা বলিতেছিলাম—স্বপ্রকাশ জ্ঞানের উদয়ে কালবোধ তিরোহিত হয়। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি—পদার্থ-সত্তা বিলুপ্ত করিয়া সে জ্ঞান উদয় হয়। পদার্থের

অভাবে ক্রিয়াবোধ থাকিতে পারে না। ক্রিয়াবোধ তিরোহিত হইলে, কালের জ্ঞান সুতরাং বিলুপ্ত হয়। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি—এই দেশ ও কালের অতীত স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় সত্তায় উপনীত হইয়াই আচার্য্য শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা ভ্রান্তি বা অধ্যাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাস্তবিক সেখানে জগৎ বলিতে কিছু থাকে না, কখনও ছিল বা হইবে, এমনও মনে হয়।

আমরা অনেক অবান্তর কথার আলোচনা করিয়াছি; এইবার পুনরায় একবার সংক্ষেপে মন্ত্রের অর্থটী আলোচনা করিয়া লই। দেবতাবৃন্দের যে ব্যষ্টি প্রকাশ, তাহা সমষ্টীভূত হইলে, একটা দিগন্ত-প্রসারী জ্যোতিঃ বা প্রকাশ উপলব্ধি হইতে থাকে। প্রথমতঃ উহা একটী আকাশীয় তত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হয়। বাস্তবিক উহা তত্ত্বমাত্র নহে। উক্ত দিগন্তব্যাপী জ্যোতিঃসত্তার সর্ব্বেন্দ্রিয় ধর্ম্ম আছে। যদিও কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই, তথাপি সকল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই উহাতে পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত। এক কথায়, উহার ব্যক্তিত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্ব বুঝাইবার জন্যই "একস্থং তদভূন্নারী" কথাটি বলা হইয়াছে। উহা যে মাত্র একটা জ্যোতিঃ নহে—উনি একজন; ইহাই এই মন্ত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য। এতদ্ভিন্ন সাধকের ইষ্টমূর্ত্তিও যে ঐরূপ স্বপ্রকাশ দিগন্তব্যাপী জ্যোতিঃসত্তার মধ্য হইতেই প্রকাশ পায়, একথাও প্রথমেই বলা হইয়াছে।

———

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥ ১৩॥

অনুবাদ। শম্ভুর তেজে সেই মূর্ত্তির মুখমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ যমের তেজে কেশ, এবং বিষ্ণুর তেজে বাহু গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে পাঁচটী মন্ত্রে উক্ত মূর্ত্তির বিভিন্ন অবয়বসংস্থান বর্ণিত হইতেছে। যদিও সম্মিলিত দেবতাবৃন্দের সমষ্টিভূত তেজোরাশিই মূর্ত্তিরূপে প্রকটিতা, তথাপি ঋষিগণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সমষ্টির ভিতর ব্যষ্টি অংশটিও পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই, কোন্ দেবতার তেজে মায়ের কোন্

অবয়ব গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বলা হইতেছে। শাম্ভব তেজ—শম্ভু—শিব, তৎসম্বন্ধীয় তেজ, অর্থাৎ জ্ঞানময় প্রকাশশক্তি। তাহার দ্বারা মায়ের মুখমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল। মুখেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার বিদ্যমান। যদিও স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্—সর্ব্বশরীরব্যাপী, তথাপি অধর ওষ্ঠেই তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি। জ্ঞানের যে পঞ্চবিধ প্রবাহ, তাহা মুখমণ্ডলেই বিশেষভাবে প্রতিভাত ; তাই জ্ঞানময় দেবতা শিবের তেজে মুখ।

যাম্য—যম সম্বন্ধীয় তেজ। যম—সংযমন কর্ত্তা এই পরিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড প্রকাশ বা উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া অখণ্ড মহাকাল সাগরে নিমজ্জিত করেন বলিয়া ইহার নাম যম। শাস্ত্রে ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। বহুত্ব অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণ যেস্থানে সম্যক্ মিলাইয়া যায়, তাহা জগতের পক্ষে ঘোর অন্ধকার-স্বরূপই বটে। যথার্থই যে স্থানে সর্ব্বভাবের বিলয় হয়, সেস্থান যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন উহাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না বলিয়া থাকা যায় না। তাই যমের তেজে মায়ের ঘনকৃষ্ণ অলকা বা কেশরাশি গঠিত হইয়াছিল। মায়ের পশ্চদ্ভাগে আগুল্ফলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি যেমন সন্তানদিগকে বলিয়া দেয়, আমার পশ্চাদ্ভাগে কি আছে, তাহা দেখিতে পাইবে না। মহাকাল-শক্তির পরপারে কি আছে, তাহা বাক্য এবং মনের আগোচর। তাই মা আমার মুক্তকেশী হইয়া মহাকাল প্রকাশের পশ্চাদ্ভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিষ্ণুর তেজে বাহু। বিধারণশক্তি বাহুতেই অভিব্যক্ত হয় ; তাই মায়ের বাহু, জগদ্বিধারক বিষ্ণুর তেজে সম্ভূত হইয়াছিল। এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—মন্ত্রে "বাহবঃ" এই বহুবচনান্ত বাহু শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশ-ভুজা কিংবা সহস্রভুজাও হইতে পারে। বৈকৃতিক রহস্যে উক্ত হইয়াছে—"অষ্টাদশভুজা পূজ্যা, সা সহস্রভূজা সতী"। এই মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি অষ্টাদশভুজা, অথবা সহস্রভুজা, উভয়বিধই হইতে পারে। যে সাধকের যেরূপ সংস্কার, মূর্ত্তির আবির্ভাবও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং উহা লইয়া বিবাদ করিবার কোন হেতু নাই। স্থূল কথা—

মায়ের আমার বিশিষ্ট কোনও রূপ নাই, অথচ এই সব রূপই তাঁর। যে সাধক যেরূপ সংস্কার দিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি গঠিত করেন, মা আমার সেরূপ মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

আসল কথা হইতেছে—ঐ "নির্গতং সুমহত্তেজঃ"। মহত্তেজটিই মূর্ত্তিরূপে সাধকের অভীষ্ট পূরণের জন্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েন। যে বস্তুটীর দ্বারা মূর্ত্তি গঠিত হয়, সে বস্তুটী যদি লাভ হয়, তবে সংকল্প অনুযায়ী যে কোন মূর্ত্তি যে কোন সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কুম্ভকারের মৃত্তিকাদি উপকরণগুলি আয়ত্তীভূত, সে যেরূপ বারমাসই বিভিন্ন প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ যে সাধকের মহত্তেজটী আয়ত্তীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি ইচ্ছামাত্রেই মহৎ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি যখন যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই মূর্ত্তিরই পূজা করিয়া বিশিষ্ট আনন্দলাভ করিতে পারেন। তাই হিন্দুশাস্ত্রে প্রায় বারমাসই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক বিভিন্ন পূজাবিধি পরিদৃষ্ট হয়। এবং এই জন্যই ভারতবর্ষে এত বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত। ইহা অন্য কোন দেশে নাই। যাহারা অল্পজ্ঞ, তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা ভেদ-বুদ্ধিজনক হইতে পারে; কিন্তু মনে রাখিও—ঋষিবৃন্দের পদধূলিতে পবিত্রীকৃত দেশে এমন কোন বিধান দেখিতে পাইবে না— যাহার অভ্যন্তরে সুগভীর আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার দোষে সাধনা-জগতেও উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে; তাই বহু দেবদেবী-মূর্ত্তি পূজাবিধি দেখিতে পাইয়া, অল্পজ্ঞগণ নিঃসঙ্কোচে হিন্দুগণকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। হায়! এরূপ নিন্দাবাদ অধুনা কোন কোন ভারতবাসীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। ধন্য কালের অলঙ্ঘনীয় শক্তি! যাঁহারা যথার্থ একেশ্বরবাদী, যাঁহাদের বাণী—"এক আমি বহু হইব", যাঁহারা সেই "একেশ্বরকে" নিজের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে, প্রতি পরমাণুর মধ্যে, অবিকৃত ভাবে দেখিতে পান; তাঁহারা যে দেশের লোক, সেই দেশ-বাসীর মুখে ওরূপ কথা যথার্থই মর্ম্মপীড়াদায়ক। যাক্ সে অন্য কথা।

আমাদের দেশে এই দেবতাভেদবিষয়ক জ্ঞান এত প্রবল—এত মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে যাঁহারা ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, যাঁহারা যথাবিধি সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই মুখে বলেন—কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা রাম বিষ্ণু সবই এক, শুধু আকার ও নামের ভেদমাত্র ; অথচ অন্তরে অন্তরে পূর্ণ ভেদজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকেন। যিনি যে মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে অনুরক্ত, তিনি সেটী ব্যতীত অন্যমূর্ত্তি দেখিলে, সেইটীও যে "আমারই ইষ্টমূর্ত্তি" এরূপ বোধ কিছুতেই করিতে পারেন না। কেন এরূপ হয়? শুধু জ্ঞানের অভাব। যে জ্ঞানে ভেদবোধ দূরীভূত হয়, যাহাতে ভেদের সংস্কার উন্মূলিত হয়, সেরূপ জ্ঞানের অনুশীলন না করাই উহার হেতু। তাই বলিতেছিলাম—যে জিনিষ দিয়া মূর্ত্তি গঠিত তাহার দিকে যদি লক্ষ্য ও অনুরাগ থাকে, তবে আর বহু মূর্ত্তিতেও ভেদজ্ঞান কিছুতেই থাকিতে পারে না।

সাধক! এখনও যদি বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার বহু ঈশ্বরবোধের কলঙ্কিত সংস্কার থাকে, তবে কেবল দেখিতে থাক—কোন্ জিনিষটী মূর্ত্তির আকারে প্রকটিত। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সমরস, যে আনন্দঘন একত্ব—অখণ্ড ভাবে বিরাজিত, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাও, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে। সাধনার কোথায় দোষ, তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেখানে দেখিবে—ভেদবাদ বহুবাদ, পরমতের নিন্দাবাদ, বুঝিবে—তাহা ঠিক পথ নহে। সাধনার প্রারম্ভে এই বহুত্ববিষয়ক সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিতে হয়। যিনি উহা পারেন—যিনি শিষ্যহৃদয়ের বহুত্ববিষয়ক ঘোর অন্ধকার নাশ করিয়া দিতে পারেন, শুধু মুখে নয় উপদেশে নয়, কার্য্যে ; যিনি ইহা পারেন—তিনিই যথার্থ গুরুর কাজ করিয়া থাকেন। যথার্থই তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। মনে রাখিও—জীব! যতদিন তোমার ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হইবে, ততদিন মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শ্রুতি বলেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" যে ব্যক্তি এই জগতে নানাত্ব অর্থাৎ বহুভাব দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। অগণিত জন্মমৃত্যুর সংপেষণ, সুখ দুঃখের প্রবল কশাঘাত ততদিন কিছুতেই বিদূরিত হয় না, হইতে পারে না—যতদিন এই নানাত্ব দর্শন থাকে।

সে যাহা হউক, আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যাঁহারা মূর্ত্তির বিরোধী, নামরূপ কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা মনে রাখিবেন—ঐ যে "সুমহত্তেজঃ", যাহা নারীরূপে—মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথার্থ অবয়ব নহে, তত্তৎ অবয়বের ধর্ম্ম, মাত্র। যেমন মুখ নাই, অথচ মুখের ধর্ম্ম আছে, হস্ত নাই, অথচ হস্তের ধর্ম্ম আছে। এক কথায় "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্" বলিলে যাহা বুঝায়, অথবা "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" বলিলে যাহা বুঝায়, সেই রহস্য বুঝাইবার জন্যই এইমূর্ত্তি ও তাহার অবয়ব-সংস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে। সুমহত্তেজ বা মহৎতত্ত্ব-রূপ যে প্রকাশ, উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্ম সমন্বিত। ইহাই হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থান বর্ণনার উদ্দেশ্য।

আধুনিক বেদান্তবাদিগণ—যাঁহারা নেতি নেতি মার্গের সাধক, তাঁহারা যখন দেহ ইন্দ্রিয় মন পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানে আরোহণ করিয়া সুমহত্তেজ প্রত্যক্ষ করেন, সেই সময় ঐ বিজ্ঞানকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেই, চণ্ডীর এই উপদেশ—এই "একস্থং তদভূন্নারী" বাক্যটীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এখানে আসিলে ভক্তিভাব আপনি উপস্থিত হয়। ইহা দুই চারি ফোঁটা নয়ন-জলের ভক্তি নহে; ইহা যথার্থই ভক্তিশব্দবাচ্য। যতই নেতি নেতি বলুন না কেন, বিজ্ঞানময় কোষের সে বিশালতা, সে মহত্ত্ব, সে ব্যাপ্তি, সে বিভুত্ব, সে ঈশ্বরধর্ম্ম দেখিলে, তাঁহাকে একান্ত আশ্রয় না বলিয়া থাকা যায় না। এই আশ্রয়-আশ্রিতজ্ঞান ফুটিলেই যথার্থ ভক্তির ভাব আবির্ভূত হয়। এবং এই আশ্রয়-জ্ঞান হইতেই বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে।

আমাদের দেশে এই দেবতাভেদবিষয়ক জ্ঞান এত প্রবল—এত মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে যাঁহারা ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, যাঁহারা যথাবিধি সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই মুখে বলেন—কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা রাম বিষ্ণু সবই এক, শুধু আকার ও নামের ভেদমাত্র ; অথচ অন্তরে অন্তরে পূর্ণ ভেদজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকেন। যিনি যে মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে অনুরক্ত, তিনি সেটী ব্যতীত অন্যমূর্ত্তি দেখিলে, সেইটীও যে "আমারই ইষ্টমূর্ত্তি" এরূপ বোধ কিছুতেই করিতে পারেন না। কেন এরূপ হয় ? শুধু জ্ঞানের অভাব। যে জ্ঞানে ভেদবোধ দূরীভূত হয়, যাহাতে ভেদের সংস্কার উন্মূলিত হয়, সেরূপ জ্ঞানের অনুশীলন না করাই উহার হেতু। তাই বলিতেছিলাম—যে জিনিষ দিয়া মূর্ত্তি গঠিত তাহার দিকে যদি লক্ষ্য ও অনুরাগ থাকে, তবে আর বহু মূর্ত্তিতেও ভেদজ্ঞান কিছুতেই থাকিতে পারে না।

সাধক ! এখনও যদি বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার বহু ঈশ্বরবোধের কলঙ্কিত সংস্কার থাকে, তবে কেবল দেখিতে থাক—কোন্ জিনিষটী মূর্ত্তির আকারে প্রকটিত। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সমরস, যে আনন্দঘন একত্ব—অখণ্ড ভাবে বিরাজিত, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাও, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে। সাধনার কোথায় দোষ, তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেখানে দেখিবে—ভেদবাদ বহুবাদ, পরমতের নিন্দাবাদ, বুঝিবে—তাহা ঠিক পথ নহে। সাধনার প্রারম্ভে এই বহুত্ববিষয়ক সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিতে হয়। যিনি উহা পারেন—যিনি শিষ্যহৃদয়ের বহুত্ববিষয়ক ঘোর অন্ধকার নাশ করিয়া দিতে পারেন, শুধু মুখে নয় উপদেশে নয়, কার্য্যে ; যিনি ইহা পারেন—তিনিই যথার্থ গুরুর কাজ করিয়া থাকেন। যথার্থই তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। মনে রাখিও—জীব ! যতদিন তোমার ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হইবে, ততদিন মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শ্রুতি বলেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" যে ব্যক্তি এই জগতে নানাত্ব অর্থাৎ বহুভাব দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। অগণিত জন্মমৃত্যুর সংপেষণ, সুখ দুঃখের প্রবল কশাঘাত ততদিন কিছুতেই বিদূরিত হয় না, হইতে পারে না—যতদিন এই নানাত্ব দর্শন থাকে।

সে যাহা হউক, আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যাঁহারা মূর্ত্তির বিরোধী, নামরূপ কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা মনে রাখিবেন—ঐ যে "সুমহত্তেজঃ", যাহা নারীরূপে—মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথার্থ অবয়ব নহে, তত্তৎ অবয়বের ধর্ম্ম, মাত্র। যেমন মুখ নাই, অথচ মুখের ধর্ম্ম আছে, হস্ত নাই, অথচ হস্তের ধর্ম্ম আছে। এক কথায় "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্" বলিলে যাহা বুঝায়, অথবা "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" বলিলে যাহা বুঝায়, সেই রহস্য বুঝাইবার জন্যই এইমূর্ত্তি ও তাহার অবয়ব-সংস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে। সুমহত্তেজ বা মহৎতত্ত্ব-রূপ যে প্রকাশ, উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্ম সমন্বিত। ইহাই হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থান বর্ণনার উদ্দেশ্য।

আধুনিক বেদান্তবাদিগণ—যাঁহারা নেতি নেতি মার্গের সাধক, তাঁহারা যখন দেহ ইন্দ্রিয় মন পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানে আরোহণ করিয়া সুমহত্তেজ প্রত্যক্ষ করেন, সেই সময় ঐ বিজ্ঞানকে সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেই, চণ্ডীর এই উপদেশ—এই "একস্থং তদভূন্নারী" বাক্যটীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এখানে আসিলে ভক্তিভাব আপনি উপস্থিত হয়। ইহা দুই চারি ফোঁটা নয়ন-জলের ভক্তি নহে; ইহা যথার্থই ভক্তিশব্দবাচ্য। যতই নেতি নেতি বলুন না কেন, বিজ্ঞানময় কোষের সে বিশালতা, সে মহত্ত্ব, সে ব্যাপ্তি, সে বিভুত্ব, সে ঈশ্বরধর্ম্ম দেখিলে, তাঁহাকে একান্ত আশ্রয় না বলিয়া থাকা যায় না। এই আশ্রয়-আশ্রিতজ্ঞান ফুটিলেই যথার্থ ভক্তির ভাব আবির্ভূত হয়। এবং এই আশ্রয়-জ্ঞান হইতেই বিজ্ঞানের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে।

আবার যাঁহারা সাংখ্য ও যোগমার্গাবলম্বী, তাঁহারা সমাধি যোগে রূপ রসাদি তত্ত্ব সকল সাক্ষাৎ করিয়া, যখন এই মহত্তত্ত্বে উপনীত হন, তখন উহাকে একটি তত্ত্বমাত্র না বুঝিয়া ঈশ্বরভাবে দর্শন করিলেই এই নারী বা মূর্ত্তির রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাংখ্যমতে যদিও ঈশ্বর স্বীকার নাই, তথাপি মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারীকে "জন্য ঈশ্বর" বলা হয়। সুতরাং মহত্তত্ত্বে উপনীত হইলে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে আপত্তি কি? যথার্থই যাবতীয় ঈশ্বরধর্ম্ম এইখানেই অভিব্যক্ত। আর উপাসনা ঈশ্বরেরই হয়। পরমাত্মা বা পুরুষের উপাসনা নাই। ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলে, পুরুষ বা পরমাত্মা অর্থাৎ নির্গুণ-স্বরূপে অবস্থান অনায়াসসাধ্য হয়। উহা স্বয়মাগত একটী অবস্থা বিশেষ। কোন উপায় বা কৌশলের সাহায্যে তাহা হয় না। যতক্ষণ তুমি কোনরূপ উপায় বা কৌশলের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছ, ততক্ষণ তুমি উপাসক বা সাধক। উপাসনা বা সাধনা এই সুমহত্তেজেরই হইয়া থাকে। যে তেজ—"একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা"।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামুনি মেধস্ সমাধিসহায় সুরথকে যে উপাখ্যান শুনাইয়াছেন—উহা যে, সকল দর্শন-শাস্ত্র-সিদ্ধ আধ্যাত্মিক রহস্য, ইহা বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিতে হইল। মনে রাখিও— সমাধিসহায় জীবাত্মা প্রজ্ঞানরূপী গুরুর নিকট বসিয়া চণ্ডীতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাই প্রথমখণ্ডেই বলিয়াছি—চণ্ডী বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। সাধকগণ যত বিভিন্ন প্রণালী দিয়াই অগ্রসর হউন না কেন, সকলেই সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্তের মধ্য দিয়াই চলিতেছেন। বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্মবিচার, সাংখ্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ, এবং যোগ শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গযোগ, এ সকল ঋষি প্রদর্শিত পন্থা; ইহা পরিত্যাগ করিয়া কাহারও একপদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, উহার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সেই জিনিষটাই পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে নানাবিধ উপাখ্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব দেশ গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। চন্দ্র—মনের অধিপতি দেবতা। সুধাক্ষরণই চন্দ্রের স্বভাব; তাই সুধাকরের তেজে মায়ের পীনপয়োধরযুগল অভিব্যক্ত হইল। আমরা যে রূপরসাদি বিষয়, কিংবা সুখ দুঃখ হাসি কান্না প্রভৃতি ভাব নিয়া থাকি, উহা বস্তুতঃ মন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সাধারণ চক্ষুতে লক্ষ্য হয়—যেন মনই আমাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রও বলেন—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"; কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য কি বলেন শুন—"মনই মায়ের স্তনযুগল"। কথাটা একটু ভাবিবার বিষয়। সাধারণতঃ যাহা অজ্ঞান যাহা পাপ, যাহা সঙ্কীর্ণতা পরিচ্ছিন্নতা, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। অথচ এই মনই—মাতৃ-স্তন্য। ব্যাপারটা কি? কল্পিত শিশুচৈতন্যকে মনোরূপ নিতান্ত চঞ্চল, অথচ মুখরোচক কোন একটা কিছুর আশ্রয় না দিলে, উহা অবীচিলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্মসত্তা বোধই করিতে পারে না। যতক্ষণ এই কল্পিত শিশুভাবাপন্ন চৈতন্য কোন একটা উত্তেজক স্পন্দন না পায়, ততক্ষণ সে আপনার অস্তিত্ব বোধই করিতে পারে না। এই দেখ—সাধারণ মানুষের মন একটু স্থির হইলেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। "আমি আছি", এই বোধটিও জাগাইয়া রাখিতে পারে না। মন যেন জীবচৈতন্যের আশ্রয় যষ্টি। যতদিন জীব এই কল্পিত শিশুভাবকে না ছাড়িবে, অর্থাৎ "আমাকে" না চিনিবে, ততদিন যিনি জীবের একান্ত হিতৈষী, যিনি জীবকে যথার্থ ভালবাসেন, তিনি কি করিবেন? যাহাতে জীব তাহার "আমি"কে হারাইয়া না ফেলে, যাহাতে দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া, তাহার প্রকৃত স্বরূপটি চিনিতে পারে, এরূপভাবে পরিচালিত করিবেন। ইহাই ত বন্ধুর কাজ!

সাধক! মা তোমাকে উৎপীড়িত করিবার জন্য—যাতনা দিবার জন্য, তোমার ভক্তিবিশ্বাসের বল পরীক্ষার জন্য, মনোরূপ শয়তানকে ছাড়িয়া দেন নাই। তোমাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই দিন দিন তোমাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই স্নেহময়ী মা মনোরূপ স্তন-সুধা দিতেছেন। একবার চাহিয়া দেখ—তোমার ঐ মনটির দিকে। যাহাতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া পরনিন্দা প্রভৃতি রহিয়াছে, ঐ মনটিই মায়ের স্তন। তুমি দিবা রাত্রি উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া কি করিতেছ? মাতৃ-স্তন্য পান করিতেছ। রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতি মুহূর্ত্তে মন আকারিত হইতেছে! হ্যাঁ, ইহাই ত মাতৃ-স্তন্য! এই চঞ্চলতা, এই কামাদিবৃত্তির তাড়না, উহাই তোমাকে দিন দিন পরিপুষ্ট করিয়া লইতেছে। কার্য্যতঃ উহাই মায়ের আমার স্নেহসুধা। তুমি মনের ভাবগুলিকে বিষয় বলিয়া ভোগ কর, তাই পরিণামে বিষের জ্বালা সহ্য করিতে হয়। মাতৃ-স্তন্যজ্ঞানে ভোগ কর—পরিণাম অমৃতময় হইবে। ইহা শুধু কবিত্বের উচ্ছাস নহে। যথার্থই সাধনার রহস্য।

আর একদিক দিয়া দেখ—চন্দ্রের একটী নাম ওষধিপতি। চন্দ্রকিরণেই ধান্যাদি শস্য পরিপুষ্ট হয়, তাহারই পরিণাম—অন্ন। অন্ন দ্বারাই আমাদের স্থূলদেহ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং আমরা অন্নরূপ যে মাতৃ-স্তন্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছি, তাহাও চন্দ্রের তেজ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ কি অন্নময়কোষ, কি মনোময় কোষ, কি বিজ্ঞানময় কোষ, সকল কোষেই আমরা মাতৃ-স্তন্য পান করিতেছি। সাধক, শুধু এই একটী কথা ধারণা করিতে পারিলেই যে জীবন ধন্য হয়। সাধনার প্রয়োজন পর্য্যবসিত হয়! "আমাদের যাহা মন, তাহা বাস্তবিকই মাতৃ-স্নেহ"।

আবার অন্যদিক দিয়া দেখ—মাতৃস্নেহই ঘনীভূত হইয়া স্তনযুগল রূপে জননীর বক্ষোপরি অভিব্যক্ত হয়। ইহা ধারণা করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হ্রাস পায়। কামিনীর পীনস্তনে ভোগের চিহ্ন না দেখিয়া, ঘনীভূত স্নেহ দেখিতে অভ্যাস কর। নারী-হৃদয়

সন্তান-স্নেহ এত বেশী যে, ঘনীভূত হইয়া বাহিরে স্তনের আকারে প্রকাশ পায়। পুরুষের স্নেহ তত অধিক হয় না বলিয়াই, পুরুষের স্তন তাদৃশ বৃদ্ধি পায় না।

এস্থলে একটী সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি—কোন অপোগণ্ড শিশুর মাতৃবিয়োগ হয়, এবং অন্য কোন স্ত্রীলোক তাহার প্রতিপালনের ভার না লওয়ায়, স্বয়ং পিতাই উহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। ঐ শিশুটী পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পিতার বক্ষে মুখ দিয়া স্তনপানের অভিনয় করিত। ক্রমে উহার প্রতি পিতার স্নেহ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি দিবারাত্রি শিশুটীকে নিয়াই থাকিতেন। অল্পদিন পরেই তাহার বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে যথার্থই একটী স্তন দেখা দিল; এবং উহা হইতে যথার্থই দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইত! এই লোকটীর বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, ইনি জাতিতে —কায়স্থ। আমি স্বয়ং ইহার সহিত পরিচিত। সে যাহা হউক, আমাদের শুধু এই কথাটী মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে, অন্তরস্থ সন্তান-স্নেহ অতিশয় ঘন হইলেই, উহা স্থূল দেহে স্তনের আকারে প্রকাশ পায়। নারী—মূর্ত্তিমতী অপত্যস্নেহ; তাই সাধারণতঃ নারীদেহেই স্তন-যুগলের প্রকাশ।

এই ত গেল মূর্ত্তির দিকে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়—পূর্ব্বোক্ত তেজোরাশি যে একটী জড় জ্যোতিমাত্র নহে, উহাতে যে মাতৃ-স্নেহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, ইহা বুঝাইবার জন্যই "সৌম্যেন স্তনয়োর্য্যুগ্মম্" বলা হইয়াছে! এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বারংবার সে কথার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

ইন্দ্রের তেজে দেবীর মধ্যভাগ গঠিত হইয়াছিল। ঐশ্চর্য্যার্থক ইন্দ্ ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন। ইন্দ্র দেবাধিপতি, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত। দেহের মধ্যভাগেই যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। ভূরাদি পঞ্চলোক স্থূল দেহের মধ্যদেশেই বিরাজিত। মূলাধারাদি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি হইতেই যাবতীয় ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিভূতির বিকাশ হয়। তাই

ঐন্দ্রতেজই মায়ের মধ্যদেহরূপে উক্ত হইয়াছে। (বিভূতির রহস্য ইহার পরেই ব্যক্ত হইবে)।

বরুণের তেজে জঙ্ঘা উরু, এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্বদেশ গঠিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ স্থূল দেহে কণ্ঠের উপরিভাগই চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান। মধ্যদেশ তদপেক্ষা জড়ভাবাপন্ন। তথাপি কণ্ঠ হৃদয় নাভি লিঙ্গমূল এবং মূলাধার প্রভৃতি স্থানে, বিশিষ্ট প্রযত্ন দ্বারা চৈতন্যের বিশেষ অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দেহের যেটা নিম্নভাগ অর্থাৎ জঙ্ঘা উরু ও নিতম্বদেশ, উহা অতিশয় জড়ভাবাপন্ন। ঐ সকল স্থানে চৈতন্যের কোনরূপ বিশেষ অভিব্যক্তি নাই। তাই প্রকৃতির সর্ব্বশেষ পরিণাম—অত্যন্ত জড়ধর্ম্মী জল ও ক্ষিতি তত্ত্বের অধিপতি বরুণ এবং বসুন্ধরার তেজে দেবীর জঙ্ঘা উরু ও নিতম্বদেশ গঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল অবয়বে বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়প্রবাহ পরিচালিত হয় না। জঙ্ঘা এবং উরুদেশ দিয়া বরং পাদেন্দ্রিয়-প্রবাহ পরিচালিত হয়; তাই প্রবাহশীল জলতত্ত্বাধিপতি বরুণের তেজে ঐ অবয়ব, এবং অত্যন্ত জড়ধর্ম্মী ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতির তেজে নিতম্বপ্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

এস্থলে একটী কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল দেবমূর্ত্তিতে কোনরূপ জড়ধর্ম্মের বিকাশ নাই, চৈতন্য বা প্রকাশধর্ম্ম দ্বারাই এ সকল গঠিত। এ দেহের কোনস্থানেই জড়ত্ব নাই। তাই সমুদয় অবয়বই দেবতার তেজ বা বিশিষ্ট চৈতন্য দ্বারা গঠিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তবে কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা থাকিলেই, প্রথম দৃষ্টিতে উহা জড়ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়, তাই নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে জড়ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহা জড় নহে। যে চৈতন্য জড়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই চৈতন্য দ্বারাই দেবীর দেহ গঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেহ এবং এই সকল দিব্যদেহে, এই জড় ও চৈতন্যের বিভিন্নতা। জীবদেহ স্থূল জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত, এবং দেবদেহ জড়াধিষ্ঠিত চৈতন্য দ্বারা গঠিত।

এ ত গেল বিশিষ্ট মূর্ত্তির কথা। আধ্যাত্মিক রহস্যে দেখিতে পাওয়া

যায়—আত্মার যে মহত্তত্ত্বরূপ অভিব্যক্তি, সাধকগণ তাহাতে ঐ সকল অবয়ব-ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া থাকেন; কারণ, যাবতীয় ব্যক্তি-ধর্ম্মই সেখানে বিকাশ পায়। সূক্ষ্মে ঐরূপ সর্ব্বাবয়ব-ধর্ম্ম থাকে বলিয়াই স্থূলে উহার অভিব্যক্তি হয়। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্য থাকিতে পারে না। "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে"—কারণের গুণসমূহই কার্য্যের যাবতীয় গুণের আরম্ভক হয়। তাই, পরমেশ্বররূপ আদিকারণে সৃষ্টির—অর্থাৎ স্থূলের যাবতীয় ধর্ম্ম, যাবতীয় গুণ অব্যাহতভাবেই থাকে, যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা দেখিতে পান।

কোন অবয়ব নাই অথচ সকল অবয়বেরই ধর্ম্ম আছে, ইহা কিরূপ? এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠিতে পারে। যদিও ভাষায় তাহা, বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, তথাপি বলিতেছি—মনে কর, এমন একটি প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্যময়-সত্তার নিকট তুমি উপস্থিত হইয়াছ, যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, অথচ দর্শনাদি ব্যাপার রহিয়াছে। যেন দেখিতেছে, যেন শুনিতেছে, যেন কথা কহিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। "যেন" শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া, ঐ সকল একটা মনের কল্পনামাত্র বুঝিও না; কারণ, যে স্থলে এ ধর্ম্ম বিকাশ পায়, তাহা কল্পনারাজ্যের অনেক উপরে। উহা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধির স্থান। মনে যে সকল কল্পনা হয়, তাহা প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হয় না—স্থূলে প্রকাশ পায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ "যেন" গুলি এত সত্য, এত স্থির, এত নিশ্চত যে, ইহার অন্যথা কখনও হয় না। আর একটি কথা—মানসকল্পনাগুলির কিছুদিন পরে বিস্মৃতি হয়; কিন্তু এখানে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার স্মৃতি দীর্ঘকাল থাকে।

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥ ১৫॥

অনুবাদ। ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পাদাঙ্গুলি বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি এবং কুবেরের তেজে নাসিকা হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার তেজে মায়ের রক্তচরণ দুখানি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সাধক-রচিত বহুজনবিদিত একটি সঙ্গীতের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। যদিও ঐ সঙ্গীতের মাত্র একটি অংশের সহিত আমাদের এই মন্ত্রস্থ প্রথম পাদের সাদৃশ্য আছে, তথাপি সঙ্গীতটি এত সুন্দর এবং উচ্চ ভাবযুক্ত যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে আকৃষ্ট হইবেন। গ্রন্থকারের কর্ম্মজীবনের সহিতও উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গানটি আগমনী। উমা বহুদিন পরে পিতৃগৃহে আসিয়াছেন, জননী মেনকা তাঁহার আভরণহীন দেহখানি দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন উমা মাকে বুঝাইতেছেন—

আমার নাই আভরণ অমন কথা মুখে এনো না মা আর।
আমিই কেবল এ জগতে করতে পারি অলঙ্কারের অহঙ্কার।

এ জগৎ বটে আমার অলঙ্কারে সাজান থাল,
প্রাতর্মধ্য সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল।

আবার নিশাকালে বদ্‌লে পরায়, তাতে আলো আঁধার দুই দেখায়
আহা, বলনা ভবে কার বা আছে এমন অলঙ্কার ॥ ১ ॥

কে বলে মা তোমার উমার অলঙ্কারের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সূতায় গাঁথা তারার ফুল।
প'রে থাকি বলে বলি, ইন্দ্রধনু একাবলী ;
তা বই জয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়ন্ত-হার ॥ ২ ॥

জীবের জীবন নাসার নোলক, তাত জানে সর্ব্বজন ;
পদ্মপত্র-জলের মত দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ।
জ্ঞান-সমুদ্রের মহারতন উপনিষদ্ আমার কর্ণভূষণ
মুকুট আমার সদানন্দ নাশেন ভবের অন্ধকার ॥ ৩ ॥

ও মা, বরাভয় মোর হাতের বলয় সে ত সবার জানা কথা,
করুনাকঙ্কণে পরি মুক্তিফলের মুক্তা গাঁথা।
মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি,
নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধু চন্দ্রহার ॥ ৪ ॥

ও মা অষ্ট সিদ্ধির নূপুর পরি, তাতেই বেশী অনুরাগ,
পুণ্যগন্ধ-স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ।
ব্রহ্মা আমার অলক্ত জল, কেশব আমার চোখের কাজল,
কালান্তক তাম্বুল আমি চর্ব্বণ করি বারবার ॥ ৫ ॥

এ সব "গোবিন্দ" দেখেছে ভাল সুধাইলে বলবে সেই,
বাছা বাছা কালামেঘের আমলা বাটা কেশে দেই।
পোহাইলে বিভাবরী, শিশুসূর্য্যের সিন্দুর পরি,
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥ ৬ ॥

এই সঙ্গীতচ্ছলে মায়ের যে রূপটী সাধক-সমীপে উদ্ভাসিত করা হইল, ঐরূপে একবার মাকে দেখিতে চেষ্টা কর দেখিবে—"ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ" এবং "ব্রহ্মা আমার অলক্তজল" এই দুইটি কথাই অভিন্ন। আর, যে সাধক মাকে আমার এই মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন, তিনিই চণ্ডীর রহস্য সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, ব্রহ্মা—সৃষ্টিশক্তি। সৃষ্টিশক্তিই মায়ের পদদ্বয়, অর্থাৎ চরণস্থানীয়। নিশ্চলা মা আমার সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া চলা অর্থাৎ গতিবিশিষ্টা হইয়াছেন। নিরঞ্জনসত্তা হইতে ভাবরঞ্জনাময় অবস্থায় উপনীত হইয়া, আবার নিরঞ্জনসত্তায় যাওয়া ইহাই ত মায়ের সৃষ্টিচক্র বা জগৎলীলা। তাই, মায়ের চরণ বা গতি বলিলে, এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা ব্রহ্মাকেই বুঝায়। গম্ ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাদ শব্দের অর্থই গতি। পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি—মা আমার ইন্দ্রিয়বিহীনা অথচ ইন্দ্রিয় ধর্ম্মবিশিষ্টা। তাই, স্থূল পদদ্বয় না থাকিলেও গতিশক্তি আছে। মা যে আমার গতিরূপিণী।

মন্ত্রে "পাদৌ" এই দ্বিবচনান্ত পাদশব্দের প্রয়োগ আছে। মায়ের গতি দ্বিবিধ। এক জগৎ-মুখী, অপর আত্মাভিমুখী। একটি বিকর্ষণ, অন্যটী আকর্ষণ। এই উভয়বিধ গতির সাধারণ নাম সৃষ্টি। দ্বিবিধ গতিবিশিষ্টা হইয়াই মা আমার এই অপূর্ব্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন

করিতেছেন। এস্থলে ব্রহ্মা শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ—যেস্থানে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয়।

সূর্য্যের তেজে পাদাঙ্গুলি। সূর্য্য তেজস্তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থূল বিকাশক্ষেত্র। তেজস্তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়—পাদ বা গতিশক্তি। গতিশক্তি পাদাঙ্গুলিতেই চরমপরিণতি প্রাপ্ত হয়। তাই, অর্কতেজেই মায়ের পাদাঙ্গুলি গঠিত হইয়াছিল।

বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ—বসুদেবতাগণের তেজে করাঙ্গুলি। বসু শব্দের অর্থ ধন। রূপরসাদি বিষয়গত বিষয়ত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত সকলই ধন বা বসু উহা পাণি-ইন্দ্রিয়ের বা গ্রহণশক্তির বিষয়। এক কথায় উহাকে গ্রাহ্য বলা যায়। গ্রাহ্য বস্তুর গ্রহণ উদ্দেশ্যেই গ্রহণশক্তিরূপ পাণি-ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বলেন—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ" ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ। বিষয়সমূহের জন্যই ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আগে রূপ, তারপর রূপকে গ্রহণ করিবার জন্য চক্ষু। আগে শব্দ, তার পর কর্ণ। এইরূপ আগে ধন, তারপর পাণি গ্রহণেন্দ্রিয়। করাঙ্গুলি—আদানশক্তির বিশেষ প্রকাশস্থান, অর্থাৎ পাণীন্দ্রিয়ের চরমপরিণতি। উহা সর্ব্ববিধ ধনের গ্রাহক। তাই, বসুর তেজে মায়ের করাঙ্গুলি।

কুবেরের তেজে নাসিকা। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ক্ষিতিতত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উহার বিকাশ হয়। ক্ষিতি বা পৃথিবী কুবের-লোকপাল পরিবারের মধ্যে অন্যতমা। আবার কুবের—ধনাধিপতি। পঞ্চবিধবিষয়ত্বই ধন। ক্ষিতিতে পঞ্চবিধ ধনই আছে। কুবের উহার অধিপতি বলিয়াই তাহার তেজে মায়ের নাসিকা গঠিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, ছান্দোগ্য-শ্রুতির উপদেশ অনুসারে দেখিতে পাই—প্রাণই সর্ব্বধনাধিপতি। এই প্রাণই স্থূলে আসিয়া বায়ুরূপে—শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে নাসিকা-দ্বার দিয়া প্রবাহিত হয়। এভাবেও ধনাধিপতির তেজেই নাসিকা, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ভস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। প্রজাপতির তেজে তাঁহার দন্তসমূহ এবং অগ্নির তেজে নয়নত্রয় গঠিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। আনন্দময়ী মায়ের আনন্দময় জগৎরূপ হাস্যের বিকাশ-স্থান দশনপংক্তি। বিশ্বপ্রজাসমূহ যে শক্তি হইতে সমুদ্ভূত, তাহাই প্রজাপতি। জীব জগতের এই যে জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার, ইহাই মায়ের হাসি। তাই, প্রাজাপত্য তেজে মায়ের দন্তসমূহ সমুদ্ভুত হইয়াছিল। আবার অন্যদিকে, দন্তই চর্ব্বণসাধন অবয়ব। বিশ্বসংহারিণী মায়ের বিশ্বসংহরণলীলা দন্তেই অভিব্যক্ত হয়। তাই, অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিতে করিতে দংষ্ট্রাকরাল অতি ভীষণ বিশ্বগ্রাসী মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে—আমরাই মায়ের অন্ন। এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড মায়ের খাদ্যমাত্র। বেদান্তসূত্র বলেন—"অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ"। এই চরাচরের গ্রহণ অর্থাৎ সংহরণ করেন বলিয়াই আত্মা—মা আমার "অত্তা"। চরাচর যাবতীয় বস্তুকে অদন বা ভক্ষণ করেন, তাই তিনি অত্তা। প্রজাপতি মায়ের এই সংহার লীলার সহায়ক। দেখ সাধক, প্রজাপতি মহোল্লাসে এই বিশ্বপ্রজারূপ খাদ্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া, জগৎপালক বিষ্ণুর হাতে তুলিয়া দিতেছেন; তিনি উহা যথাযথ পাক করিয়া প্রলয়ের দেবতা বিজ্ঞানময় শিবের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, আর মাতৃ-চরণের একনিষ্ঠ অধিকারী মহেশ্বর এ সুপক্ক অন্নরাশি মায়ের—অত্তার দংষ্ট্রা-করাল মুখমণ্ডলে আহুতি দিতেছেন। একবার সত্য সত্যই এই ব্রহ্মাণ্ডযজ্ঞের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর—তোমার সংকীর্ণতা, তোমার দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইবে। দেখ—এ জগৎ মায়ের ভোগ মাত্র; ইহা দর্শন করিলে জীবের দুর্ভোগের অবসান হয়।

ত্রিনয়ন—চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি। ইহাই মায়ের ত্রিকালদর্শী নয়ন-ত্রয়। ঋষি এস্থলে চন্দ্র সূর্য্যাদির উল্লেখ না করিয়া একেবারে

তন্মূলীভূত তেজস্তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন। নেত্রই প্রকাশসাধন ইন্দ্রিয়। চক্ষু তিনটি। (১) স্থূল চক্ষু—ইহা দ্বারা সন্নিহিত ভৌতিক রূপের অতি সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়। (২) মনশ্চক্ষু—ইহা দ্বারা অসন্নিহিত স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হয় (৩) জ্ঞান চক্ষু—ইহা দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম অতীত অনাগত অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যে প্রকাশ-সত্তার প্রভাবে সূর্য্যচন্দ্রাদির প্রকাশ, সেই মূলীভূত প্রকাশই মাতৃ-নয়ন। একমাত্র জ্ঞানই উহার স্বরূপ। শাস্ত্রে জ্ঞানই অগ্নিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই, মন্ত্রে অগ্নির তেজে নয়নত্রয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

জীব! দেখ—মা আমার চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিরূপ ত্রিনয়নে আহর্নিশ তোমার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ওগো, সূর্য্য সূর্য্য নহে—মাতৃচক্ষু, চন্দ্র চন্দ্র নহে—মাতৃচক্ষু, অগ্নি অগ্নি নহে—মাতৃচক্ষু। ইহা শুধু শিখিয়া রাখিলে কিছুই ফল হইবে না, যথার্থ ই মায়ের চক্ষু বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। মায়ের চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাক, জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

ভ্রুবৌ চ সন্ধয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাং চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥ ১৭॥

অনুবাদ। সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে মায়ের ভ্রূদ্বয়, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয়, এবং অন্যান্য দেবতার তেজে অন্যান্য অবয়ব; এইরূপে মঙ্গলময়ী মায়ের বিশিষ্টমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। প্রাতঃকালীন এবং সায়ংকালীন সৌন্দর্য্যই মায়ের ভ্রূদ্বয়। মা যে আমার সুষমাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরূপে নিয়ত সুপ্রকাশিতা, ইহা উভয় সন্ধ্যায় একটু প্রাণময় দৃষ্টিতে দর্শন করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যদিও একটি ক্ষুদ্রতম বলুকাকণার ভিতরেও তাঁহার

মহত্ত্ব, তাঁহার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত, তথাপি সেরূপ দর্শনের উপযুক্ত চক্ষু, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু উভয় সন্ধ্যায় এই বিশ্বপ্রকৃতি যে অনির্ব্বচনীয় শোভাবিমণ্ডিত হইয়া মাতৃ-সুষমার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেয়, ইহা প্রায় সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এস্থলে ভ্রূদ্বয়ের কথা বলিতে গিয়া সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, ভ্রূদ্বয়ই দেহের সৌন্দর্য্যবিকাশের স্থান। ভ্রূর লোম-শাতন করিলে, অথবা ভ্রূলোমে রং মাখাইয়া দিলে, শরীরের অন্য কোনও পরিবর্ত্তন না করিলেও আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়; শারীরিক সৌন্দর্য্যের সহিত ভ্রূদ্বয়ের এতই নিকট সম্বন্ধ। তাই, ঋষি বলিলেন—যে চৈতন্য সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই সন্ধ্যাভিমানী দেবতার তেজে মায়ের ভ্রূযুগল গঠিত হইয়াছিল।

আবার আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—জীব এবং ঈশ্বরের মিলনরেখা এক সন্ধ্যা; ঈশ্বর ও পরমাত্মার মিলনরেখা অপর সন্ধ্যা। প্রথমটী প্রাতঃসন্ধ্যা—অন্ধকারময় জীবভাবীয় অজ্ঞানতার নাশ এবং জ্ঞানময় শুভ প্রকাশসত্তার আবির্ভাব। অন্যটী সায়ংসন্ধ্যা—যাবতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের বিলয় এবং নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভাব-বিরহিত নিরঞ্জন সত্তায় প্রবেশ। মায়ের সন্তান মাতৃ-ভ্রূতে স্নেহ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না; তাই, সাধকগণ এই জীবেশ্বর-মিলনরূপ প্রাতঃ-সন্ধ্যায় এবং ঈশ্বর ও পরমাত্মার মিলনরূপ সায়ংসন্ধ্যায় একমাত্র মাতৃ-স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হন।

অনিলের তেজে মায়ের শ্রবণ-যুগল। যদিও আকাশ হইতেই শব্দের উৎপত্তি, তথাপি বায়ুই উহার পরিচালক। বায়ু ব্যতীত শব্দ প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং বায়ুদেবতার তেজেই মায়ের কর্ণদ্বয় গঠিত হইয়াছিল। এইরূপ অন্যান্য দেবতার তেজে মায়ের অপরাপর অবয়ব সংগঠিত হইয়াছিল। এবং এইরূপেই শিবা—মঙ্গলময়ী মা আমার অসুরনিধনকল্পে বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

প্রকাশসত্তা হইতে কি প্রকারে বিশিষ্ট মূর্ত্তির দর্শন হয়, তাহা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশ হইলে, অর্থাৎ রজস্তমোগুণ নির্দ্ধূত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে—সাধক যখন ঐ প্রকাশময় অবস্থায় অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখন স্বকীয় সংস্কারানুরূপ বিশিষ্টমূর্ত্তির আবির্ভাব হয় এবং বরাভয় প্রদানে সাধককে উৎসাহিত ও ধন্য করেন। তারপর সাধক দ্রুতগতিতে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলেই, সাধনার শেষ অথবা জীবনের চরিতার্থতা লাভ হয় না। মূর্ত্তিদর্শন হইলেই ঈশ্বরলাভ অথবা মুক্তি হয় না। উহা ঈশ্বর লাভ বা মুক্তির পথে বিশেষ অনুকূল গুরুকৃপামাত্র। যে বস্তু মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পায়, তাঁহাকে জানিতে হইবে—তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইবে। অবশ্য এই যে "জানা বা বুঝা" তাহাও উঁহারই কৃপায় হইয়া থাকে। ঈশ্বর-লাভ হইলে—সাধক-হৃদয়ে ঈশ্বরধর্ম্ম কিছু না কিছু অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

সে যাহা হউক, সাধকের বিশিষ্টমূর্ত্তি দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন তিরোহিত হয়, তখন ঐ যে সর্ব্বদেব-শরীর-সমুদ্ভূত তেজোরাশি, উহাই বিশ্বময় বিরাটমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। এবং বিশ্বই যে পরমেশ্বরের স্থূলমূর্ত্তি, সাধক উহা উপলব্ধি করিতে পারে। ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখিয়াই সমস্ত সংশয়ের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। মায়াবচ্ছিন্ন চিদাভাসই বল, হিরণ্যগর্ভই বল, কিংবা মহদাত্মাই বল, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; আসল কথা—ঐ সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত স্বরূপটীর আবির্ভাব যতদিন না হয়—ততদিন জড়ত্বজ্ঞান অপনীত হয় না, হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয় না, সংশয় বিদূরিত হয় না। এই কথাটী ভালরূপ বুঝাইবার জন্যই চণ্ডীতে এত স্পষ্টভাবে মায়ের বিভিন্ন অবয়ব-সংস্থাপন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে দারুময় জগন্নাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহাও এই সর্ব্বন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মের স্থূল প্রতিবিম্বমাত্র। কোনও ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম আছে, এরূপ একটী দুরধিগম্য ভাবকে স্থূলে দেখাইতে হইলে, উহা হস্তপদাদিবিহীন জগন্নাথ

মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপে অভিব্যক্ত করা যায় না। কি সুন্দর! সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ দারুময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি! হস্ত পদ নেত্র শ্রবণ প্রভৃতির আভাসমাত্র আছে, অথচ উহার একটি অবয়বও নাই! ধন্য তিনি, যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বিশাল মায়াজলধির তীরে—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" পুরুষোত্তম বিরাজমান। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম সেখানে বিলুপ্ত। সকলেই সমান—একরস। সমত্বের সমীপে বর্ণভেদ জাতিভেদ তিরোহিত। পূজা নাই, অর্চ্চনা নাই, শুধু দর্শন—আর ভোগ! শুধু দর্শন—আর ভোগ। অতীন্দ্রিয় বস্তুকে এইরূপে ইন্দ্রিয়ভোগ্য করিবার উপায়—এই ভারতে যত বেশী তত বুঝি আর কোনও দেশে নাই। এই দেশের ঋষিগণ, এ দেশের সাধকপুরুষগণ সেই বাক্যমনের অতীত বস্তুকে কত ভালবাসিতেন, কিরূপ ঘনীভূত প্রেমে সেই পরম পুরুষের সহিত আবদ্ধ থাকিতেন; তাহার একটু প্রমাণ—এ দেশের তীর্থ, এ দেশের বিভিন্ন দেবদেবীর মুর্ত্তি, এ দেশের গৃহদেবতা! অতীন্দ্রিয় প্রেম কত ঘন হইলে—আত্মহারা হয়, জড় হইয়া যায়, স্থূলে অভিব্যক্তি লাভ করে, তাহা আমরা ধারণাই করতে পারি না। যতদিন স্থূল দেহ আছে, ততদিন স্থূলের অতীত বস্তুর প্রতি যতই আমরা আসক্তিযুক্ত হই না কেন, স্থূল যে আমাদের একান্তপ্রিয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। আমরা যে অত্যধিক মাত্রায় স্থূলত্বপ্রিয়, আমাদের দেহই তাহার প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। সুতরাং আমরা আমাদের প্রিয়তমকে ঠিক আমাদেরই মত স্থূলে আনিয়া আদর করিব, সেবা করিব ভোগ করিব, ইহা কত স্বাভাবিক! কত সুন্দর! এ তত্ত্ব চিন্তা করিতে গেলেও—বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইতে হয়।

যাঁহারা তীর্থ, দেবমূর্ত্তি প্রভৃতিকে অজ্ঞান-কল্পিত ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের অর্থোপার্জ্জনের কৌশলমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা একবার ধীরভাবে এ তত্ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ঐ সকলের মধ্যে অজ্ঞান, ভ্রান্তি এবং প্রবঞ্চনা যে মোটেই নাই—এ কথা বলিতে পারি না; কিন্তু একটা মহাসত্যজ্ঞান ও ঘনীভূত প্রেম যে ভারতবাসীর

মজ্জাগত সংস্কার, ইহা অস্বীকার করিবার উপাই নাই। তীর্থ এবং দেবমূর্ত্তিসমূহই উহার সমুজ্জ্বল প্রমান। যদিও স্থূল দেবদেবী-মূর্ত্তির পূজা করিয়া, যাত্রা থিয়েটারের কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব দুর্গা দেখিয়া, এবং কথক ঠাকুরের মুখে পৌরাণিক গল্প শুনিয়া, অধিকাংশ নরনারীই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক ভূল ধারণা পোষণ করে, তথাপি ঐ ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে ধরিয়াই তাহাদিগকে যথার্থ জ্ঞানের পথে সহজে আনয়ন করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই ঐরূপ ভ্রান্তি বা বিপরীত ফল দাঁড়ায়। তাই বলি—ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না! যাহা আছে তাহাকেই উজ্জীবিত কর—প্রাণময় কর। নূতন কিছু শিখিতে হইবে না, নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে হইবে না। যাহা আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর; নিজে বুঝিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দাও, দেশের অজ্ঞান দূর হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ এমন কিছু বলিতে বা প্রকাশ করিতে বাকী রাখেন নাই, যাহা আমাদের মস্তিষ্ক-ধর্ম্মের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। শুধু তাঁহাদের আদেশ পালন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিধি-নিষেধগুলির অনুশীলন করিলেই মানুষ ধন্য হইতে পারে।

ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সমস্ত দেবগণের তেজোরাশি সমুদ্ভবা সেই দেবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া, মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। অসুর-অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ অতিশয় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত বিশিষ্ট চৈতন্য সমূহ সঞ্চিতকর্ম্ম-সংস্কারের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল; তাই মায়ের অবির্ভাব হইয়াছে।

মহিষকর্ত্তৃক অর্দ্দিত না হইলে, তেজোরাশিসমুদ্ভবার আবির্ভাব হয় না। জীবমাত্রকেই এই অর্দ্দন বা উৎপীড়ন উপলব্ধি করিতে হয়। "আমি বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়বর্গের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত", এইরূপ বোধ যে মুহূর্ত্তে যথার্থভাবে প্রাণে ফুটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই মা আমার চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইবেন। আরে, সন্তান উৎপীড়িত হইলে, মাতা কি কুপিতা না হইয়া থাকিতে পারেন? এ ত আর পাতান মা নয়, সত্যি মা যে! যতক্ষণ দেখিবে—তুমি খুব আর্ত্ত হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতেছ, অথচ মায়ের আবির্ভাব বুঝিতে পারিতেছ না, ততক্ষণ বুঝিবে—তুমি যথার্থ আর্ত্ত হইতে পার নাই, শুধু আর্ত্তের মত ভাণ করিতেছ। উহাও নিন্দনীয় নহে, ঐ রকম আর্ত্তের ভাণ করিতে করিতেই একদিন যথার্থ আর্ত্তভাব ফুটিবে।

মা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মহিষকর্ত্তৃক উৎপীড়িত করিতে থাকেন। যতদিন না ঐ উৎপীড়ন আমাদের বোধে আসিতে থাকে, যতদিন এই সংসারকে সত্যই অনিত্য এবং অসুখময় বলিয়া প্রতীতি না হইতে থাকে, ততদিন মা আমার উৎপীড়নরূপেই আসিয়া থাকেন। তারপর যখন এই সংসার, এই দেহধারণ, এই দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধির মধ্য দিয়া বিচরণ, এইগুলিকেই একটা মহা উৎপীড়ন বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তখনই জীব কাতর হইয়া সজলনেত্রে বলিতে থাকে—"আর সহ্য হয় না মা! আমরা বড়ই উৎপীড়িত দীন সন্তান, একবার এসে দেখ মা, আমাদের জীবন কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাময়, আর যে সহিতে পারি না! বুঝি—ইহা উৎপীড়ন, অথচ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না।" ঠিক এইরূপ ভাবটা যখন প্রাণের অন্তস্থল হইতে ফুটিয়া উঠে, তখনই মা পরিত্রাণ-পরায়ণা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। সাধক! মুখে সহস্রবার "শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ-পরায়ণা" বলিলে বিশেষ ফল কিছুই হয় না। তোমাকে শরণাগত, দীন এবং আর্ত্ত হইতে হইবে। এই তিনটী লক্ষণ তোমাতে প্রকাশ পাইলেই মা পরিত্রাণ-পরায়ণা-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তোমারই

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দের প্রকাশসত্তা হইতে মাতৃ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইবে। দেবগণ মুদান্বিত হইবেন। তুমিও পরমানন্দ লাভ করিবে।

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। ত্রিশূলধারী শিব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই দেবমূর্ত্তিকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণও স্বকীয় চক্র হইতে চক্র উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্র হইতে ক্রমান্বয় একাদশটি মন্ত্রে দেবগণের অস্ত্রাদি সমর্পণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি বিশিষ্ট অস্ত্র আছে। ঐ অস্ত্রই তত্তৎ দেবতার শক্তি। মনে রাখিও সাধক, বিশেষ বিশেষ ভাবান্বিত চৈতন্যই দেবতা। যদিও একথা, পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তথাপি ঐ মূল তত্ত্বটী বিস্মৃত হইলেই প্রকৃত বিষয়টী দুরধিগম্য হইয়া পড়িবে; তাই, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। যাহা হউক, চৈতন্য যেরূপ কোনও বিশেষ ভাব নিয়া প্রকাশ পাইলে দেবতা-শব্দবাচ্য হয়েন, সেইরূপ তত্তৎভাব প্রকাশের যে শক্তি অর্থাৎ যে বিশিষ্টশক্তি-প্রভাবে চৈতন্য ঐরূপ খণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পান, সেই শক্তিই সেই দেবতার অস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমর্পণ শব্দের স্ব স্ব ব্যষ্টিশক্তি সমর্পণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বিভিন্ন দেবতার তেজ নির্গত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, উহা দেবতাগণের বিভিন্ন প্রকাশভাবে নির্গম, আর এই অস্ত্র-সমর্পণ শব্দে স্ব স্ব কার্য্যকরী শক্তির সমর্পণ, ইহা বুঝিতে পারিলেই অস্ত্র অর্পণের রহস্য উপলব্ধি হইবে। ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

এই শক্তিসমর্পণ ব্যাপারটা কি? স্ব স্ব খণ্ড শক্তিকে এক অদ্বিতীয় মহতী অখণ্ড শক্তিরূপে বুঝিতে পারার নামই শক্তি-সমর্পণ।

একমাত্র সর্ব্বশক্তিময়ী মাতৃ-শক্তিই যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই শক্তি-সমর্পণ হয়। শক্তিসমুদ্রের যে ক্ষুদ্র অংশটুকুকে আমার শক্তি বলিয়া গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছি, এক কথায় যাহাকে আমরা পুরুষকার—যত্ন বা অধ্যবসায় বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, উহা যে একমাত্র মাতৃ-শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে—যিনি একমাত্র পুরুষ, তাঁহারই কৃতির নাম যে পুরুষকার ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, শক্তি-সমর্পণ করা হয়। শুধু মুখে বলিলে হইবে না—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। উহা উপলব্ধি করিতে হইবে—যথার্থই ইন্দ্রিয়াধীশকে হৃদয়ে দেখিতে হইবে। হৃষিকেশ-দর্শনের পূর্ব্বে ওরূপ বলা মিথ্যাচার মাত্র। এই হৃষিকেশ-দর্শন এবং শক্তি-সমর্পণ, প্রায় এক কথা। এক অখণ্ড চৈতন্যরূপিণী মা-ই যে আমাদের ইন্দ্রিয়প্রণালীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার-রূপে, প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুরূপে, ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ ভূতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই শক্তি সমর্পণ হইয়া যায়।

একদিন উহা হয় না, প্রথমে ঐ শক্তিগুলি যেন আমরাই শক্তি, এইরূপ ভাবে ধরিয়া ধরিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে হয়। পত্র পুষ্প ফলাদির অর্পণ বা দ্রব্যযজ্ঞ হইতে উহার আরম্ভ হয়, ক্রমে ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি তপোযজ্ঞ এবং যম নিয়মাদি যোগযজ্ঞের ভিতর দিয়া সর্ব্বশেষে স্বাধ্যায়ে বা জ্ঞানযজ্ঞে উপনীত হইতে হয়। তখন সাধক স্ব-কে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ অখণ্ডজ্ঞান বা পরমাত্মার সন্ধান পায়। ইহাই চরম সমর্পণ। এইরূপ সমর্পণের নাম আত্মসমর্পণ। আত্মলাভ আত্মসমর্পণ ব্যতীত হয় না—হইতে পারে না। সাধক! যতদিন দেখিবে তোমার "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এই অবস্থার উপলব্ধি আসে নাই, ততদিন বুঝিতে হইবে—আত্মসমর্পণ হয় নাই। "আমি" কে সম্যক্‌রূপে মাতৃ-চরণে অর্পন করিতে হইলে—প্রতি কর্ম্মে মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়। "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ

পরমেশ্বর” বলিয়া প্রতিদিন আত্ম-নিবেদন করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে তবে আত্ম-সমর্পণের যোগ্যতা লাভ হয়। শক্তি-সমর্পণ উহার মধ্যাবস্থা। এই যে দেখিতেছি, এই দর্শন-শক্তি আমার নহে, মায়ের। মা! তুমিই আমার অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়া এই দৃক্‌শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছ। এই যে শব্দ শুনিতেছি, এই শ্রবণশক্তিরূপেও তুমি মা! এইরূপ ঘ্রাণশক্তি স্পর্শশক্তি আস্বাদনশক্তি এবং আদান গমণ বাক্যপ্রয়োগ প্রজনন বিসর্জ্জনরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তিরূপেও তুমি মা নিত্য বিরাজিতা। আবার স্মৃতি কল্পনা অভিমান ও বিবেক-রূপ অন্তকরণ শক্তিও তুমি মা! এইরূপ সর্ব্ব বিশেষশক্তিকে যখন মাতৃ-শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন যথার্থ শক্তিসমর্পণ করা হয়। ইহার পরে হয় আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ হইলেই জীবত্ব-বোধ তিরোহিত হইয়া যায়, পরমানন্দময় পরমাত্মবোধ উদ্ভাসিত হয়।

মা মা! আমারা যে কিছুই দিতে জানি না, মুখেই শুধু বলি—ইহা আমার নয়—তোমার। কার্য্যতঃ কিন্তু সকলই আমার বলিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখি। ওগো, আমারা যে এই ছোট আমিটাকে—এই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপিষ্ট, সংসার তাপে জর্জ্জরীভূত আমিটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই; তাই তোমাকে কিছু দিতে পারি না; দিতে ইচ্ছাও হয় না, দিবার সামর্থ্যও নাই। মা! মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কেই ধরিয়া তোমার পায়ে দিব, আমার আমিকে ধরিয়া তোমার চরণে উৎসর্গ করিব, এসব ত সূক্ষ্ম, অতি দূরের কথা। যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—যাহা অতি স্থূল, যাহার সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, সেই অতি তুচ্ছ ধন বস্ত্র ভূষণ ইত্যাদি ধরিয়া অকপট প্রাণে তোমার চরণে নিবেদন করিতে পারি না! এত সঙ্কীর্ণ আমরা, এত ক্ষুদ্রতার গণ্ডির ভিতরে আমাদের অবস্থান! হায়! ইহা ভাবিতেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়! কল্যাণময়ি! তুমি দিবারাত্র আমাদের কল্যাণ-কামনায় বলিতেছ—“ময্যেব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়” কিন্তু কই মা, তোমার সে আশীর্ব্বাদবাণী আমরা ত শুনিয়াও শুনি না! যদি শুনিতাম, তবে

তোমাকে মন বুদ্ধি সমর্পণরূপ যোগ-যজ্ঞের যাহা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান, সেই অতি স্থূল দ্রব্যযজ্ঞ করিতেই কুণ্ঠাপ্রকাশ করিতাম কি? আমাদের মনে হয়—তোমাকে কিছু দিতে গেলে, তোমার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্রব্যসম্ভার উৎসর্গ করিতে হইলে, আমার অপচয় হইবে। যে তোমাতে আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হইবে, সেই তোমাকে আমার অতিদূরে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্যসম্ভার অর্পণ করিতেও কৃপণতা করি! মা আমাদের এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দাও! দ্রব্য-যজ্ঞে অধিকারী কর! তবেই আমরা দিন দিন শক্তিসমর্পণের মধ্য দিয়া আত্মসমর্পণের অধিকারী হইব—মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব। মা, তোমার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহা যে সহস্রগুণে গুণিত হইয়া আবার আমাতেই ফিরিয়া আসে, শত প্রমাণ পাইয়াও এ ধারণা দৃঢ়রূপে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারি না! তুমি সে আত্মা—তোমাকে দিলে, তাহা যে আমাকেই দেওয়া হয়, ইহা কবে বুঝিতে পারিব! ইহা বুঝি না বলিয়াইত মা তুমি উৎপীড়নরূপে মহিষাসুরমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, নানা উপায়ে আমাদিগের মর্ম্মস্থানে শত আঘাত দিয়া, জাগাইতে চেষ্টা কর। দেবতাগণের শুভদিন সমাগত, তাই তাঁহারা স্ব স্ব শক্তিরূপ অস্ত্র-শস্ত্র তোমার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন।

যতদিন ব্যষ্টিশক্তিসমূহের উপর একটা অভিমান থাকে অর্থাৎ "আমার শক্তি" বলিয়া প্রতীতি হয়; ততদিনই উহার ক্ষয়-উদয় থাকে ততক্ষণই উহারা আগমাপায়িরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু যেদিন জীব বুঝিতে পারে—সমস্ত শক্তিবিন্দুগুলি সেই মহতী-শক্তিসিন্ধুরই বিন্দুমাত্র, সেদিন কি আর উহাকে "আমার শক্তি" বলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে? তখন যাঁহার শক্তি তাঁহাকে দিবার জন্য স্বতঃই একটা উদ্বেলন আসিতে থাকে; অথবা তখন আর দেওয়া বা অর্পণ বলিয়া কিছু থাকে না, শুধু দর্শন—ওগো, তুমিই যে সব গো! আমার সব তুমি, আমার সর্ব্বস্ব তুমি! আমার আমিটাই যে তুমি।

এতদিন ইহা দেখি নাই—"আমার জ্ঞান, আমার ধন, আমার পুত্র, আমার ইন্দ্রিয়, আমার যশঃ" ইত্যাদি বলিয়া, তাহাতেই মুগ্ধ ছিলাম; তাই, বার বার অসুরের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। এতদিন আমিত্ববোধ লইয়া জীবত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, অসুরের বিরুদ্ধে স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া কত লাঞ্ছিত হইয়াছি! আর পারি না মা! এইবার তোমার শক্তি তুমি গ্রহণ কর, আমাদিগকে অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ কর।

উপনিষদে এ বিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। একদা অসুরগণকে পরাজিত করিয়া, দেবতাবৃন্দ গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় মা আমার হৈমবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া, অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমার কি শক্তি আছে? অগ্নি বলিলেন—আমি এই বিশ্বকে ভস্মীভূত করিতে পারি। মা বলিলেন, আচ্ছা ভাল; এই সম্মুখস্থ তৃণটাকে দগ্ধ কর! অগ্নি তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। এইরূপ পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের প্রত্যেকেই একটা তৃণের প্রতি স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। এবং অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—আমাদের বাস্তবিক কোন শক্তিই নাই, আমরা সকলেই এই হৈমবতীর শক্তিতে শক্তিমান্।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই উপাখ্যান অর্থাৎ অসুর-উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দের তেজোরাশি হইতে দেবীর আবির্ভাব এবং তদুদ্দেশ্যে দেবতাগণের অস্ত্রাদি অর্পণ প্রভৃতিও এই শ্রুতিমূলক কি না, তাহা সাধকগণ বিবেচনা করিবেন। সে যাহা হউক, এইবার আমরা মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শিব তাঁহার শূল হইতে অপর একটি শূল নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক দেবীকে অর্পণ করিলেন। শিব—বিজ্ঞানময় গুরু, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি। ত্রিশূল তাঁহার অস্ত্র। জ্ঞানশক্তি ত্রিপুটী। জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই ত্রিপুটী হইয়াই জ্ঞানের বিকাশ হয়। আমি বৃক্ষ দেখিতেছি", এস্থলে আমি জ্ঞাতা, বৃক্ষ জ্ঞেয় এবং বৃক্ষবিষয়ক যে প্রতীতি, উহার নাম জ্ঞান।

সাধারণতঃ জ্ঞান এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পায়। যেখানে জ্ঞান সেখানেই এই ত্রিপুটি। তাই, শিবের হস্তে নিত্যই ত্রিশূল বিরাজিত। (অবশ্য ত্রিপুটিশূন্য জ্ঞানও আছে, সে স্বতন্ত্র কথা)। জ্ঞানের এই ত্রিপুটিভাব মহতী শক্তিরই বিশেষ বিকাশ মাত্র। ইহা উপলব্ধি করার নামই ত্রিশূল-সমর্পণ। যে শক্তি-প্রভাবে একই জ্ঞান ত্রিধা বিভক্ত হয়, উহা যে মহামায়ার শক্তি, ইহা বুঝিতে পারিলেও ত্রিপুটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তাই, শূল হইতে শূল নিষ্ক্রামণের কথা উক্ত হইয়াছে। শিবের ত্রিশূল শিবেরই থাকে; শুধু ত্রিশূল-গত যে মমত্বাভিমান তাহাই দূরীভূত হয়। পরবর্ত্তী বিষ্ণুর চক্রাদি অর্পণস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার অখণ্ডজ্ঞান প্রতিনিয়ত রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হইতে গিয়া জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইতেছে। যিনি ঐরূপ ত্রিপুটি নিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, উনিই মা। তুমি "আমার জ্ঞান" বলিয়া অভিমান করিও না। জ্ঞানরূপিণী মা-ই যে তোমার ভিতর দিয়া ঐরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ইহাই শিবকর্ত্তৃক ত্রিশূল সমর্পণের রহস্য।

বিষ্ণু স্বকীয় চক্র হইতে চক্র উৎপাদনপূর্ব্বক দেবীকে অর্পণ করিলেন। বিষ্ণু প্রাণময় বিশ্বব্যাপী পুরুষ। চক্র শব্দের অর্থ প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। এই সংসারই বিষ্ণুর চক্র। সংসারস্থিতিরূপ সুদর্শনচক্রে এতদিন "আমার" বলিয়া অভিমান ছিল; তাই মহিষাসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে। এখন উহা যে মায়েরই শক্তি, ইহা বুঝিতে পারিয়া, যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করিয়া বিষ্ণু নিশ্চিন্ত হইলেন। সাধক! তুমিও দেখ তোমার ঐ ক্ষুদ্র সংসারটি, ঐ স্ত্রীপুত্র পরিজন, যাহাদিগকে তুমি ভরণ-পোষণ করিতেছ বলিয়া অভিমান করিতেছ, উহা অজ্ঞান মাত্র। ঐ ভরণ পোষণের শক্তিরূপে যিনি তোমার ভিতর দিয়া প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, উনিই মা। উঁহাকে আদর কর, উঁহার জিনিষ উঁহাকেই

অর্পণ কর। মা-ই যে তোমার অন্তরে ঐ শক্তিরূপে বিরাজিতা, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই অর্পণ সিদ্ধ হয়। এবং এইরূপ অর্পণে সিদ্ধ হইলেই দেখিবে, সংসারিক বিবিধ চিন্তারূপ গুরুভার তোমার মস্তক হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥ ২০॥

অনুবাদ। সেই দেবমূর্ত্তিকে বরুণ দিলেন—শঙ্খ, অগ্নি দিলেন—শক্তি এবং বায়ু দিলেন—বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় সহ ধনু।

ব্যাখ্যা। দেবতা-প্রধান শিব ও বিষ্ণু যখন স্বকীয় শক্তি মাতৃ-চরণে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন অন্যান্য দেবতাবৃন্দও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বরুণ জলাধিপতি। সমষ্টিজল যে বোধে অবস্থিত, তাহাই জলাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা বরুণ-দেবতা। তিনি শঙ্খ অর্পণ করিলেন। এই শঙ্খ শব্দটি নিয়া একটি মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন শঙ্খ বিষ্ণুর অস্ত্র। পূর্ব্ব মন্ত্রে বিষ্ণুর চক্র অর্পণের কথা আছে; আর এ মন্ত্রের প্রথমেই শঙ্খ শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে—উহা বিষ্ণুরই অস্ত্র। এ মতে বরুণ এবং বহ্নি উভয়ই "শক্তিং দদৌ" স্ব স্ব শক্তি অর্পণ করিলেন, এইরূপ অর্থ করিতে হয়। আবার ইহার পরেই উক্ত হইবে "পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ" অম্বুপতি অর্থাৎ বরুণ পাশ-অস্ত্র দিয়াছিলেন। বরুণের পাশ-অস্ত্র প্রসিদ্ধ। (ইহার অর্থ সেই মন্ত্রে করা হইবে।) আবার কেহ বলেন, পূর্ব্ব মন্ত্রে "চক্রঞ্চ" এই 'চ'কার থাকায়, চক্র এবং গদা এই উভয় অস্ত্রই বুঝা যায়। এ সকলের প্রকৃত মীমাংসা করিতে গিয়া, কেহ বা বৈকৃতিক রহস্যোক্ত মহালক্ষীমূর্ত্তির অষ্টাদশ ভূজে যে অষ্টাদশ অস্ত্র আছে, তাহার গণনা করিতে বাধ্য হন। বাস্তবিক তাহাতেও

গোলযোগ দূর হয় না। যাহা হউক, আমরা শঙ্খকে নাদ-শক্তির প্রতিভূস্বরূপ বুঝিয়া লইব। তারপর উহা বিষ্ণু সমর্পণ করুন, আর বরুণ সমর্পণ করুন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে বিষ্ণুর সমর্পণ-পক্ষই উত্তম; শঙ্খ—অব্যক্ত নাদশক্তি—যাহা হইতে ব্যাক্তনাদরূপ এই শব্দময় বিশ্ব প্রকাশিত, সেই শক্তিও যে মা, উহা উপলব্ধি করার নামই মাতৃ-চরণে শঙ্খ সমর্পণ। নাদ-রহস্য পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

জলের শক্তি—ক্লেদন বা আর্দ্রীকরণ, হুতাশনের শক্তি—দাহ এই উভয় শক্তিই যে মাতৃ-শক্তিমাত্র, উহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বহ্নি বরুণের অস্ত্র সমর্পণ রহস্য বুঝা যায়। জলাধিষ্ঠিত চৈতন্য এবং তেজস্তত্ত্বাধিষ্ঠিত চৈতন্য, এতদিন আর্দ্রীকরণ ও দাহিকা শক্তিতে অভিমানাবদ্ধ ছিল, এইবার তাহা বিদূরিত হইল। এইরূপ মারুত অর্থাৎ বায়ুদেবতা ধনুঃ এবং শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় দিয়াছিলেন। ধনুঃ ও শর—প্রবাহ-শক্তির পরিচায়ক। তূণীর—বাণাধার। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভেদে প্রবাহশক্তির দ্বিবিধপ্রকাশ; তাই, মন্ত্রে দুইটি তূণীরের উল্লেখ আছে। যে বায়ুমণ্ডলমধ্যে বসুন্ধরা অবস্থিত, সেই বায়ু যে চৈতন্য সত্তায় অধিষ্ঠিত, তাহাই বায়ুদেবতা। প্রবহণ তাহার শক্তি। এতদিন ঐ শক্তিতে "আমার" বলিয়া অভিমান ছিল; আজ তাহা মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়া সে যথার্থ শক্তির সন্ধান পাইল।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার স্থূল শরীরে অপ্ তেজ এবং মরুত্তত্ত্বের যে বিভিন্ন শক্তি, তাহা একা অদ্বিতীয়া মহতী শক্তিরই বিভন্ন প্রকার বিকাশমাত্র। যাঁহার শক্তি তোমার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাকে অর্পণ কর। দেখিবে—তুমি একটি ভৌতিক দেহধারী সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র নও। তুমি উহার অনেক উচ্চে। কিরূপে অর্পণ করিবে? প্রথমে অপ্‌তত্ত্বই ধর—তোমার শরীরমধ্যগত যে জলীয় অংশ, উহাকে বোধ কর। (যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে এইরূপ বোধ একান্ত সহজ) মুখে বল "জল সত্য" আর অন্তরে ঐ জল-বোধকে ধরিয়া

রাখ। (স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্রে বরুণবীজ অবলম্বনে ঐরূপ ধারণা অনেকটা সহজসাধ্য হয়।) যখন ঐ জলবোধটি ঘনীভূত হইয়া আসিবে, তখন উহাকেই মা বলিয়া—আত্মা বলিয়া আদর কর। তারপর উহাকে বাহিরেও ধারণা কর অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। দেখ—ঐ জলময়সত্তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে জলধারা রূপে, ভূপৃষ্ঠে নদ নদী সমুদ্র ইত্যাদি রূপে, বৃক্ষাদিতে রসরূপে, পর্ব্বতে প্রস্রবণরূপে, আকাশে মেঘরূপে অবস্থিত। দেখ—তোমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অন্তরে বাহিরে অন্তরীক্ষে—প্রতি পরমাণুর মধ্যে জলময়সত্তা। দেখ, আর বল—"ইদং জলং সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য জলস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু"। দেখ—তোমার অন্তরে বাহিরে ঊর্দ্ধে নিম্নে জল ব্যতীত আর কিছুই নাই। তারপর বল—"অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম্ অমৃতম্, ইদং সর্ব্বম্।"

এইরূপ তেজস্তত্ত্বকে বোধ কর। শরীরস্থ তাপ ও জঠরাগ্নি হইতে আরম্ভ কর; (মণিপুর কেন্দ্রে বহ্নিবীজ অবলম্বনে এইরূপ ধারণা সহজসাধ্য হয়।) মুখে বল—"অগ্নি সত্য", আর ঐ অগ্নি-বোধকে প্রসারিত কর—ভূমধ্যে তাপরূপে, ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় বস্তুতে তাপরূপে, জলে বাড়বাগ্নিরূপে, অরণ্যে দাবানলরূপে, সূর্য্যে চন্দ্রে জোতিষ্কমণ্ডলে বিদ্যুতে প্রকাশরূপে, এইরূপ সর্ব্বত্র দেখ। তোমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর তোমার জ্ঞানচক্ষু প্রসারিত হইতে থাকে, দেখ—অগ্নি ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, বিশ্বময় এই অগ্নিময় সত্তাটি বোধ করিয়া বল দেখি ভক্তির সহিত—"অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানং মধু, অস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভুতানি মধু" দেখিতে দেখিতে তোমার বোধটা অগ্নিময় হইয়া উঠিবে। তখন বলিবে—"অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম অমৃতম্, ইদং সর্ব্বম্"।

এইরূপ মরুৎতত্ত্ব। মুখে বল—"বায়ু সত্য", তারপর দেখ—তোমার শ্বাস প্রশ্বাস এবং সর্ব্বশরীরগত বায়ুপ্রবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জলস্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র বায়ুময়। (অনাহত-কেন্দ্রে বায়ুবীজ অবলম্বনে

এইরূপ ধারণা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।) তোমার অন্তরে বাহিরে বায়ুছাড়া কোথাও কিছু নাই ; এইরূপ বোধ করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ ঋষির স্বরে স্বর মিলাইয়া উপনিষদের মন্ত্রে পড়—"অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু, অস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু"। আর দেখ—ঐ মা, যাঁকে তুমি চাও, যাঁর অন্বেষণে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ঘুরিতেছ, সেই মা এই রূপে—এই বিশ্বব্যাপী বায়ুরূপে তোমার সম্মুখে বিরাজিত, উহাকে আত্মদান কর—আত্মা বলিয়া আদর কর। বল—"অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম অমৃতম, ইদং সর্ব্বম্"।

এইরূপ করিতে অভ্যস্ত হইলে বুঝিবে—শক্তি-সমর্পণ বা দেবতাগণের অস্ত্রত্যাগের রহস্য কি। যদিও এ সকল সাধনার রহস্য পুস্তকে লিখিয়া এরূপভাবে প্রকাশ করায় অনধিকারীর হস্তে পড়িলে গুরু-বেদান্ত-বাক্যের অবমাননা হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ; তথাপি বর্ত্তমান দেশকাল পাত্র বিবেচনায় প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। যদি সহস্রের মধ্যে একজনও এ পথে অগ্রসর হয় অথবা এসকল তত্ত্বকে সত্য বলিয়া আদরের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করে, তবে এই আত্মকৃত বিধিবিগর্হিত কর্ম্মজন্য অনুশোচনার মধ্যেও একটা অনাবিল আনন্দভোগের সুযোগ ঘটিবে।

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষোঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। অমরাধিপ সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন এবং ঐরাবত গজ হইতে ঘণ্টা আনয়নপূর্ব্বক সেই দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্র—দেবাধিপতি। বজ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ ইহার অস্ত্র বা শক্তি। আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরা যে একটি তড়িৎ-যন্ত্রমাত্র ইহা আধুনিক বিজ্ঞান্‌বিদ্‌গণও এতদিনে স্বীকার করিতেছেন। যদিও

তাঁহাদের চক্ষুতে উহা এখনও একটি জড়শক্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তথাপি আমরা উহাকে জড়রূপে প্রকাশিত চিৎশক্তি বলিয়াই বুঝি। যে চৈতন্যসত্তা স্থূলে তড়িৎ-শক্তিরূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ তড়িৎশক্তির অধিষ্ঠিত যে চৈতন্য, তিনিই ইন্দ্রদেবতা নামে অভিহিত। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণ ইন্দ্রয়াধিপতিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আর এখানে শক্তির দিক্ হইতে বর্ণিত হইতেছে। চিন্তাশীল পাঠক ইহাতে কোন বিরোধ দেখিতে পাইবেন না। ইন্দ্রিয়ের দিক্ দিয়া পাণীন্দ্রিয়কে এবং শক্তির দিক হইতে তড়িৎশক্তিকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রদেবতাকে বুঝিতে হয়। আর বাস্তবিক পক্ষে, আদান ও তড়িৎশক্তি পরস্পর অবিনাভাবযুক্ত। যাহা হউক, ইন্দ্রদেব এতদিন বিশ্বময় তড়িৎশক্তি বা বজ্রকে আমার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে মহিষাসুর-কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। আজ ইন্দ্রদেব উহা চিন্ময়ী-মাতৃচরণে উপহার দিয়া, মহিষাসুর নিধনের পূর্ব্বায়োজন সম্পন্ন করিলেন। বজ্ররূপ যে শক্তির উপর ইন্দ্রদেবের আধিপত্য, ঐ শক্তি যে তাঁহার নয়, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করার নামই বজ্র-সমর্পণ। বজ্রটি ইন্দ্রেরই রহিল, মাত্র বজ্রবিষয়ক মমত্বাভিমান বিদূরিত হইল। তাই বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদনপূর্ব্বক অর্পণের কথা মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্রাদি প্রদান-সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে। পূর্ব্বেও একবার একথা বলা হইয়াছে।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার দেহস্থ তড়িৎশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জলে স্থলে অন্তরিক্ষে বিশ্বব্যাপী যে তড়িন্মণ্ডল রহিয়াছে, উনিই চিন্ময়ী মা। উহাকে সরলপ্রাণে সত্যজ্ঞানে মা বল! দেখ—"ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু", অস্যা বিদ্যুতঃ সর্ব্বানি ভূতানি মধু"। সর্ব্বভূতে বিদ্যুৎ পূর্ণভাবে মধুরূপে আত্মারূপে অমৃতরূপে বিদ্যমান। আবার সর্ব্বভূত এই বিদ্যুৎসত্তায় সত্তাবান্ হইয়া বিদ্যুতের মধুরূপে অমৃতরূপে অবস্থিত, দেখ—শুধু মধুময় জগৎ। শুধু আত্মদানের বিশুদ্ধ আনন্দ। পরস্পর

পরস্পরের প্রিয়তম—মধু—আত্মা—বড় ভালবাসার বস্তু। দেখ—শক্তিরূপিণী মা আমাদিগকে বড় ভালবাসেন ; আবার আমরাও মাকে কত ভালবাসি! দেখ—মায়ের বুকে আমরা, আবার আমাদের বুকে মা। আমরা মায়ের মধু, মা আমাদের মধু! ও কি সাধক! তোমার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে? কাঁদ আর বল—মা, তুমি আমার প্রাণ! তুমি আমার প্রাণ! ওগো দেখ—শুধু প্রাণের আদান প্রদান। আমি তোমাদের প্রাণ, তোমরা আমার প্রাণ। বুঝিবে কি এ তত্ত্ব? বল, এই জড়বিদ্যুৎকেই বল—অয়মেব সঃ—যোঽয়মাত্মা, ইদং ব্রহ্ম, ইদম্‌ অমৃতম্‌, ইদং সত্যম্‌। দেখিবে—মহিষাসুরবধ কত সহজ। কিন্তু সে অন্য কথা।

ইন্দ্রদেব ঐরাবত হইতে ঘণ্টা দিয়াছিলেন। ইর্‌ ধাতুর অর্থ গতি বা বেগ। ইরাবান্‌ শব্দের অর্থ গতিশক্তি-বিশিষ্ট। ইরাবানের অপত্য বা তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে ঐরাবত কহে। ঐরাবত—ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্রের অপর একটি নাম মেঘবাহন। মেঘ ও ঐরাবত অভিন্ন। তবে ঐরাবতকে হস্তী বলা হয় কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইন্দ্র বজ্রের অর্থাৎ তড়িৎশক্তির দেবতা। ঐরাবত ঐ তড়িৎশক্তির পরিচালক। যে স্থূল গমনশীল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া তড়িৎশক্তি পরিচালিত হয়, তাহার নাম—ঐরাবত হস্তী। যদিও পৃথিবীর বহুবিধ পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই এই শক্তি পরিচালিত হয়, তথাপি বিশেষভাবে মেঘই ইহার বাহন অর্থাৎ পরিচালক। মেঘগুলি বর্ণে বা গঠনে অনেক সময় হস্তীসদৃশই হইয়া থাকে। অদ্যাপি প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত সময় যে জলস্তম্ভ উত্থিত হয়, লোকে তাহাকে স্বর্গ হইতে ঐরাবতের অবতরণ বলিয়া থাকে। ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেন জলভারে অবনত হইয়া পড়ে, আর প্রবল ঘূর্ণবায়ু প্রভাবে নদী প্রভৃতি হইতে উৎক্ষিপ্ত স্তম্ভাকৃতি জলরাশি শুণ্ডের আকারে যেন মেঘকে স্পর্শ করে; দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিলে—সত্যই বলিতে হয়—স্বর্গ হইতে ঐরাবত নামিয়া আসিয়া জলপান করিতেছে। সে যাহা হউক, যে বস্তু বিদ্যুৎপরিচালক, তাহাই শব্দবাহী ; কারণ গতি বা কম্পন হইতেই

শব্দ প্রকাশ পায়; তাই ঐরাবতকণ্ঠে শব্দ-উৎপাদিকা ঘণ্টা দোদুল্যমান। ইন্দ্রদেব বজ্র-অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রসহকৃত ধ্বনি পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেন। অর্থাৎ বজ্রধ্বনিটি পর্য্যন্ত যে মাতৃ শক্তিমাত্র, ইহা উপলব্ধি করিলেন। ঘণ্টা-সমর্পণের ইহাই রহস্য।

এস্থলে আবার আমরা পাঠকবর্গের সংশয়-নিরাসকল্পে বলিয়া রাখি—ইন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতির এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া গজারূঢ়, বজ্রপাণি ইন্দ্রমূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হইবেন না। যদিও পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি ইন্দ্রাদি দেবতার মূর্ত্তির অপলাপ করিয়া মাত্র মন্ত্রাত্মক দেবতা স্বীকার করিয়াছেন; তথাপি আমরা মূর্ত্তিবিশেষের অস্বীকার করিতে পারি না; কারণ, একেত ইহাতে পরিপূর্ণা সর্ব্বশক্তিময়ী মায়ে একটা অভাব কল্পনা করিতে হয়, তা ছাড়া যথার্থই ঐ সকল বিশিষ্ট মুর্ত্তির দর্শন হয়। (কিরূপে মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে।) আর মহর্ষি জৈমিনি যে মন্ত্রময় দেবতা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নহে; কারণ দেবমূর্ত্তিসকল ভাবময়। সাধকের বিশিষ্টমূর্ত্তি-বিষয়ক ভাব (ভাববস্তু চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে) ঘনীভূত হইয়া স্থূলে মূর্ত্তির আকারে প্রকাশ পায়। মন্ত্রসমূহ ঐ ভাবের উদ্দীপক। ভাব বলিলেই সেই ভাবমূলক কোন শব্দ আছে, ইহা বুঝিতে হয়। শব্দশূন্য ভাব হইতেই পারে না। একমাত্র "ভাবাতীত" স্বরূপকে অশব্দ বলা হয়। শব্দই মন্ত্র। যে শব্দ যেরূপ দেবমূর্ত্তি-বিষয়ক ভাবকে সহজে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া দেয়, সেই শব্দই সেই দেবতার মন্ত্র। সুতরাং মন্ত্রময় দেবতা বলায় কিছুই দোষ হয় না। তারপর যদি কেহ বলেন—দেবতাদিগের মূর্ত্তি থাকিলে দুইটি অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ—একজন দেবতা এককালীন বহু স্থানে পূজা গ্রহণ করিতে পারেন না, দ্বিতীয়—গজারূঢ় বজ্রপাণি ইন্দ্রদেব যদি পূজাস্থলে আবির্ভূত হয়েন তবে মৃন্ময়মূর্ত্তি কিংবা ঘটাদি চূর্ণ হইয়া যাইবে। (এসকল শৈশবীয় আপত্তি মীমাংসাদর্শনেই আছে) তাহার উত্তরে বলিতে হয়—ঐরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর;

কারণ, দেবতাসমূহ প্রত্যেক সাধকের অন্তরেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। সুতরাং এককালীন বহুস্থানে পূজাদি গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। তারপর দেবতাদিগের মূর্ত্তি আমাদের দেহের মত ভৌতিক নহে যে, উহার আবির্ভাবে ঘট চূর্ণ হইয়া যাইবে। দেবমূর্ত্তি চিন্ময় অর্থাৎ কেবল চৈতন্য দ্বারা গঠিত। সাধকের ভক্তি-হিমে—প্রবল প্রার্থনায় সাধকেরই অন্তরস্থিত চৈতন্যময় দেবতাবিষয়ক ভাব ঘনীভূত হইয়া স্থূলে প্রকাশ পায়। এ সিদ্ধান্তে হয়ত অপর কেহ আপত্তি করিবেন—দেবতাগণ যদি সূক্ষ্মরূপে প্রতিজীবের অন্তরেই অবস্থান করেন, তবে জীবভেদ দেবতাভেদ হইয়া পড়ে অর্থাৎ ইন্দ্রাদির মত এক এক দেবতাই যে অসংখ্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে ত এরূপ উল্লেখ নাই। একথা সত্য; ইহার উত্তর এই যে, চৈতন্য যেরূপ বস্তুতঃ এক—অভিন্ন হইয়াও প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, ইহাও সেইরূপ। পূর্ব্বেও এই দেবতাতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দেবতাদিগের মূর্ত্তিসম্বন্ধে এত কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে, একদল লোক আছেন, তাঁহারা মাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব স্বীকার করেন। অপর একদল—দেবমূর্ত্তি প্রভৃতিকে অজ্ঞলোকদিগের জন্য রূপকমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির যথার্থ রহস্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মনে করেন—দেবতাদিগেরও আমাদেরই মত বাড়ী ঘর আছে, বিবাহাদি ব্যাপার আছে, তাঁহাদের দেহও আমাদের মত পঞ্চভূতে নির্ম্মিত ইত্যাদি। এ সকলই জ্ঞানের একাংশমাত্র। এইজন্য পুনঃ পুনঃ এ সকল তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। শুধু একটা কথা স্মরণ রাখিয়া শাস্ত্রীয় রহস্যে অবতীর্ণ হইলে, আর কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় না। সে কথাটী এই যে—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ তিনই সত্য। এবং এই তিনের সামঞ্জস্যই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। তবে এই তিনটীর মধ্যে কারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সূক্ষ্ম ও স্থূলের গতি যেন কারণাভিমুখী থাকে। কারণের দিকের লক্ষ্য

পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল অথবা কেবল সূক্ষ্মবিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত করিতে গেলেই, তাহা ভ্রমপূর্ণ হইবে। স্থূল যেন সূক্ষ্মাভিমুখী থাকে এবং সূক্ষ্ম যেন কারণাভিমুখী হয়। এরূপ হইলে আর শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে সংশয়াকুল হইতে হয় না। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ কি তাহাও বলিয়া রাখিতেছি। কারণ—পরমাত্মা বিশুদ্ধচৈতন্য ; সূক্ষ্ম—শক্তি—মায়া বা প্রকৃতি এবং স্থূল—কার্য্য অর্থাৎ এই জীবজগৎ।

এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই—দেবলোক সূক্ষ্ম, ইহাদের বিশিষ্টমূর্ত্তি স্থূলভাবাপন্ন হইলেও, সূক্ষ্মলোকেরই অন্তর্গত। তড়িৎ—স্থূল। যে চৈতন্যের বহির্বিকাশ তড়িৎ, উহাই ইন্দ্রশক্তি। যদি কেহ ঐ বিশিষ্ট চৈতন্যে সমাহিত হইয়া ইন্দ্রমূর্ত্তিদর্শনের অভিলাষী হয়, তবে সে অনায়াসে ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহার অন্যথা কখনও হয় না,—হইতে পারে না।

———

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥ ২২॥

অনুবাদ। যম (স্বকীয়) কালদণ্ড হইতে দণ্ড, (এইরূপ) বরুণ—পাশ, প্রজাপতি—অক্ষমালা এবং ব্রহ্মা—কমণ্ডলু দান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। যম—মৃত্যুপতি। যে চৈতন্য মৃত্যুরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম যম। সর্ব্বজীবের সংযমন-কর্ত্তা এই মৃত্যুপতি ; তাই ইহাকে যম বলা হয়। কালদণ্ড ইহার অস্ত্র। জীব যতই উচ্ছৃঙ্খল গতিতে চলুক না কেন, ইনি কালরূপ দণ্ডপ্রভাবে জীবকে সংযত করিবেনই। তাই কালদণ্ডই যমের অস্ত্র।

বরুণ—অম্বুপতি। পূর্ব্বে ইহার শক্তি বা শঙ্খ-অর্পণের বিষয় বলা হইয়াছে। এইবার ইহার প্রধান অস্ত্র পাশ-অর্পণের কথাও বলা

হইল। পাশ—বন্ধন-সাধন রজ্জুবিশেষ। অনুরাগ বা আসক্তিই জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে; তাই অনুরাগই পাশ। রসতত্ত্ব হইতেই অনুরাগ সঞ্জাত হয়; সুতরাং বরুণের বিশেষ অস্ত্র পাশ। আপত্তি হইতে পারে—কেবল অনুরাগ হইতেই ত জীবের বন্ধন হয় না; দ্বেষ হইতে হয়। সত্য, দ্বেষ অনুরাগেরই রূপান্তর মাত্র। অনুরাগ যেখানে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেইখানেই উহা দ্বেষের আকারে প্রকাশ পায়।

প্রজাপতি—অক্ষমালা। পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণমালাই অক্ষমালা। বর্ণময় এই জগৎ। যাঁহারা মাতৃকান্যাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—জীবের দেহ বস্তুতঃ অকারাদি পঞ্চাশটী বর্ণদ্বারাই রচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই মূর্ত্তি, ভাবসমূহ শব্দমূলক, শব্দ আবার কতকগুলি বর্ণে সমষ্টিমাত্র। এইরূপ বর্ণমালা হইতেই জীবজগৎ বা প্রজাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই, প্রজাপতির শক্তি অক্ষমালা।

ব্রহ্মা—কমণ্ডলু। সৃষ্টির বীজসমূহ যে স্থানে অব্যক্তভাবে থাকে সেই অব্যক্ত বীজাধারই কমণ্ডলু। আমরা যে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করি অথবা জীবনকালেই মূহুর্মুহু ভাবচাঞ্চল্য অনুভব করি, উহা অব্যক্ত বীজের ব্যক্ত ভাবমাত্র। এই অব্যক্ত আধারটী অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টির বীজসমূহ গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে উহাই ব্রহ্মার কমণ্ডলু।

এইরূপে যম, বরুণ, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা, ইহারা যথাক্রমে কালদণ্ড, পাশ, বর্ণমালা এবং কমণ্ডলু অর্পণ করিলেন।—তাঁহাদের ঐ সকল শক্তি যে মায়েরই শক্তিমাত্র ইহা সমক্ উপলব্ধি করিলেন। সাধক! তুমিও তোমার মৃত্যুভয়, অনুরাগ স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহগত গঠনশক্তি এবং অব্যক্ত সংস্কারসমূহ মাতৃচরণে উপহার দিয়া, মমত্ব হইতে—অভিমান হইতে মুক্ত হও। মুক্তিমার্গে অগ্রসর হও! কিরূপে এই সকল অর্পণ করিতে হয়, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি ধরিয়া দেখাইতে হইলে, পুস্তকের কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি অসম্ভব নয়।

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং ভস্ম্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্॥ ২৩॥

অনুবাদ। দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকূপে স্বকীয় রশ্মি প্রদান করিলেন। এবং কাল খড়্গ ও নির্ম্মল চর্ম্ম দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। সূর্য্যের প্রকাশশক্তি মায়ের সমস্ত অঙ্গময় প্রতি-রোমকূপে উদ্ভাসিত হইল; অর্থাৎ সূর্য্যদেব বুঝিতে পারিলেন—যে প্রকাশ শক্তির প্রভাবে আমি বিশ্ব-প্রকাশক, উহা মাতৃ-প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, আমার নিজস্ব কোনও প্রকাশশক্তি নাই। ইহারই নাম মাতৃ-অঙ্গে সূর্য্যের রশ্মিদান। উপনিষদ্‌ও বলেন—"ন তত্র সূর্য্যোভাতি" "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্"।

কাল—খড়্গ ও চর্ম্ম প্রদান করিলেন। কাল—কালাত্মক চৈতন্য—যাহাতে জগৎ পরিধৃত। "কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে" কালই জগতের আধার, কালের আধার কেহ নাই। পূর্ব্বে মৃত্যুপতি দেবীকে কালদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। সে কাল সংহরণ-শক্তিস্বরূপ। আর এখানে কালশব্দে জগদাধারস্বরূপ মহাকাল বুঝিতে হইবে। কাল সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাল আমাদের নিকট ভূত ভবিষৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ কাল এক অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য বর্ত্তমান। "জগৎ আছে"; এস্থলে "আছে" এইটী কালের দ্যোতক, অর্থাৎ বর্ত্তমানকালরূপ আধারে জগতের বিদ্যমানতা বুঝায়। এই রূপ "জগৎ ছিল", "জগৎ থাকিবে" ইত্যাদি স্থলেও কাল আধররূপেই অনুভব হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। যদিও আমরা অনেক সময় "কাল আছে" এরূপ অর্থ প্রয়োগ করি এবং তাহার একটা অস্ফুট অর্থও বোধ করিয়া লই; উহা কিন্তু বস্তুশূন্য একটা বিকল্প-জ্ঞানমাত্র; কারণ, কাল আছে বলিলে—কালের অধিকরন বুঝায়। কালের বস্তুতঃ অধিকরণ কিছু নাই। কালই নিত্য আধার। এ আধারে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা

অতীত বা ভবিষ্যৎ বলি, তাহাও "আছে" এই বর্ত্তমানবাচক শব্দ দ্বারাই বুঝি। জিজ্ঞাসা হইবে—তবে অতীত এবং ভবিষ্যৎ অংশদ্বয়কে কেন আমরা বর্ত্তমানরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না? তাহার হেতু—স্মৃতি ও আশা। আমাদের স্মৃতি, কল্পনা এবং আশা এই তিনটীই কালের স্থূল প্রকাশ। যদি আমরা অন্তর হইতে স্মৃতি, কল্পনা এবং আশাকে মুছিয়া ফেলিতে পারি, তবে আর কাল বলিয়া কোন প্রতীতিই থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ তিনের একটীও থাকে না; সুতরাং কালজ্ঞানও থাকে না। স্মৃতি—অতীত কাল এবং আশা—ভবিষ্যৎ কালরূপ একটী প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী হন, তাঁহারা চিত্ত হইতে ঐ দুইটীকে সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া দেন; তাই তাঁহাদের অতীতানাগত জ্ঞান হয়। আমাদের কোন কল্পনাই বিশুদ্ধ নহে; উহা অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ আশার সহিত মিশ্রিত হইয়া জ্ঞানশক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে, তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ অংশ অপ্রত্যক্ষ থাকে।

যাহা হউক, জগদাধার কাল—বিচ্ছেদকারক খড়্গ এবং আচ্ছাদনকারক চর্ম্ম প্রদান করিলেন। কালের প্রধানতঃ ঐ দুইটী শক্তি। একটী বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত বিচ্ছেদ, অন্যটী উহার অপ্রকাশ। পরমাত্মায় সর্ব্ব প্রথম দিক্ ও কাল কল্পিত হয়। পরমাত্মা যখন কালাত্মক হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই শুদ্ধ নিরঞ্জনসত্তা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন; ইহাই খড়্গ। এবং ঐ বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরঞ্জনসত্তা আবৃত হয়, ইহাই চর্ম্ম। আবার অন্যদিক দিয়াও দেখা যায় কালই সকলকে বিচ্ছিন্ন করে এবং স্বকীয় স্বরূপকে অপ্রকাশিত রাখে। ইহাকেও খড়্গ চর্ম্ম বলা যায়। এতদিন কাল, ঐ দুই শক্তিতে মমত্ববোধে অভিমানবদ্ধ ছিল, আজ তাহা মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইল।

সাধক! তুমিও তোমার কালজ্ঞানকে মাতৃ-চরণে অর্পণ কর। তোমার স্মৃতি, কল্পনা ও আশাকে মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর; যখন অতীতের স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতের মোহিনী আশা আসিয়া তোমাকে

ব্যথিত কিংবা উৎসাহিত করিবে, তখন কাঁদিয়া বলিবে—"মা! তুমি নিত্য বর্ত্তমানস্বরূপা হইয়াও কেন আমার বুকে স্মৃতির আকারে, আশার আকারে ফুটিয়া উঠিতেছ? আমার চিরসন্তপ্ত বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ! মা! একবার কালাতীতস্বরূপে দাঁড়াও, অন্তর হইতে অতীত ও ভবিষ্যতের ছবি চিরতরে মুছিয়া যাউক! আমি শান্তি লাভ করি।" এরূপ কাঁদিতে পারিলে তুমিও কালাতীতস্বরূপের সন্ধান পাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে।

———

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৪ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্‌গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্।
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। ক্ষীরোদসমুদ্র দেবীকে মনোরম হার, চিরনূতন বস্ত্রযুগল, মস্তকভূষণ চূড়ামণি, কর্ণভূষণ দিব্যকুণ্ডলদ্বয়, বলয়সমূহ, অর্দ্ধচন্দ্র, বাহুভূষণ কেয়ূর, পাদভূষণ বিমল নূপুরদ্বয়, কণ্ঠভূষণ অনুত্তম গ্রৈবেয়ক (হার) এবং অঙ্গুলিসমূহে রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ক্ষীরোদসমুদ্র—শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। অর্থাৎ রজস্তমোগুণ কর্ত্তৃক অনভিভূত প্রকাশশীল নির্ম্মল বুদ্ধি-সত্ত্ব। কথায়ও বলে জীবদেহেই সপ্তসমুদ্র বিদ্যমান। এস্থলে সংক্ষেপে আমরা সেই জীবদেহস্থ সপ্তসমুদ্রের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। (১) বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ—ক্ষীরোদ বা দুগ্ধসমুদ্র। (২) ঈষৎ রজোগুণদ্বারা উপরক্ত সত্ত্বগুণ—সর্পিঃসমুদ্র। (৩) ঈষৎ তমোগুণ দ্বারা উপরক্ত সত্ত্বগুণ—দধিসমুদ্র। (৪) রজোগুণ—সুরাসমুদ্র। (৫) সত্ত্ব গুণোপরক্ত

রজোগুণ—ইক্ষুসমুদ্র। (৬) তমোগুণাভিভূত রজোগুণ—লবণ-সমুদ্র। (৭) তমোগুণ—জলসমুদ্র। গুণত্রয় অনাদি এবং অসীম; তাই, সমুদ্রের সহিত উপমিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমুদ্র শব্দটীর নিরুক্তি হইতেও ঐ উপমার সার্থকতা রক্ষা হয়—উন্দ্ ধাতুটী ক্লেদন অর্থাৎ আর্দ্রীকরণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। সম্যক্ প্রকারে ক্লিন্ন করে বলিয়াই ইহার নাম সমুদ্র। বিশুদ্ধ চৈতন্যকে লীলারসে আর্দ্রীভূত করে; তাই গুণত্রয় সমুদ্র-স্থানীয়। পরস্পর সংযোগ-তারতম্যে উহাদের সপ্তধা ভেদ হয়। উহাই পুরাণাদি-শাস্ত্রবর্ণিত "লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ জলন্তকাঃ" নামক সপ্তসমুদ্র।

এইরূপে জীবদেহে সপ্তসমুদ্রের বিদ্যমানতা দর্শিত হইল বলিয়া, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তসমুদ্রের অভাব-কল্পনা নিন্দনীয়। যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—ভগবৎসৃষ্টির এমনই মহিমা—যাহা বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান, তাহাই প্রতি জীবদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাই, আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ যেন একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ইহাকে ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারিলেই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলেন—"আত্মনো বা অরে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"।

যাহা হউক, এই সপ্তসমুদ্র মধ্যে ক্ষীরোদসমুদ্রই এস্থলে প্রস্তাবিত এবং উল্লেখযোগ্য। ইনি অনন্তরত্নের আকর। দেবতাবৃন্দ ইহাকে মন্থন করিয়া নানাবিধ রত্ন এবং অমৃত লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। আবার এদিকে দেখ—বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হইলেই, নানারূপ যোগবিভূতি লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ লাভ—অমৃত। যাহা পান করিয়া জীব অমর হয়। একমাত্র পরমাত্মাই অমৃত, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই পরমাত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়, জন্মমৃত্যু-সংস্কার দূরীভূত হয়, জীব অমর হয়। সাধারণতঃ রজোগুণ-জনিত চাঞ্চল্য এবং তমোগুণ-জনিত আবরণ, বুদ্ধিসত্ত্বেরও প্রাকাশশীলতাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে; কিন্তু তীব্র ঈশ্বরপ্রণিধানে—মাতৃ-কৃপায় যখন উহারা অভিভূত হইতে থাকে, তখনই নানারূপ যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়। যিনি মাত্র ঐ সকল

ধনরত্নাদির লোভে মুগ্ধ থাকেন, তাহার পক্ষে কিছুদিন অমৃতলাভের পথ রুদ্ধ থাকে ; বরং হলাহল উৎপন্ন হয়। তারপর বিজ্ঞানময় মহেশ্বর—শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং আসিয়া সে বিষপান করেন। জীবকে —শিষ্যকে অমৃতপান করাইয়া, অমর করিয়া দেন। তাই বলি সাধক, যোগৈশ্বর্য্য-লাভের আশায় সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইও না। শুধু আত্মদান—আত্মাহুতিই এ সমরের অবসান। মাতৃ-চরণে আত্মবলি দাও, মাতৃ লাভ হইবে। পথের ধূলি—যোগৈশ্বর্য্য, আপনা হইতে আসিবে। তুমি উপেক্ষা করিয়া শুধু মা মা বলিয়া ছুটিয়া চল! আপনাকে মায়ের পায়ে ঢালিয়া দাও। ব্রাহ্মণত্বলাভ হইবে—শাশ্বৎ শান্তির নিত্যাধিকারী হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা—

ক্ষীরোদসমুদ্র দেবীকে কি কি আভরণ দিয়াছিলেন ; এস এইবার আমরা তাহার আলোচনা করি।

(১) অমলহার, (২) অজর অম্বরযুগল, (৩) দিব্যচূড়ামণি, (৪) কুণ্ডলদ্বয়, (৫) কটকসমূহ, (৬) শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, (৭) কেয়ূর (৮) বিমল নূপুর, (৯) অনুত্তম গৈবেয়ক এবং, (১০) অঙ্গুলীয়ক রত্ননিচয়। অনন্ত রত্নের আকর ক্ষীরোদসমুদ্র স্বকীয় অনুত্তম রত্নরাজীদ্বারা মাতৃ-পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ধন রত্ন অনেকেরই থাকে ; কিন্তু উহা যদি মাতৃ-অঙ্গের সৌষ্ঠব-সম্পাদন না করে—মাতৃ-যজ্ঞের আহুতি না হয়, "আমার ধন" বলিয়া অভিমান থাকে, তবে সে ধনের অর্জ্জন রক্ষণ ও অযথা ব্যয়জনিত বহুবিধ সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। অসুরগণ ছলে বলে সে ধন হরণ করে। আর যদি কেহ উহা মায়ের ধন বলিয়া, অভিমানকে অকপটচিত্তে বলি দিতে পারে, তবে দেখিতে পায়—ধনের সদ্ব্যবহার-জনিত নির্ম্মল শান্তি ধনীকে দিন দিন অমরত্বের পথে- অগ্রসর করিয়া দিতেছে। তাই, আজ ক্ষীরোদসমুদ্র তাহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য দিয়া মায়ের বরবপু সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

(১) অমলহার—বিশুদ্ধ প্রকাশশক্তি। বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হইলে

প্রকাশ-শক্তি অক্ষুণ্ণ হয়। যাবতীয় বৈষয়িক প্রকাশ বুদ্ধিতে গিয়া পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির পরে আর বৈষয়িক প্রকাশ নাই। রজো-গুণের চাঞ্চল্য বশতঃ সাধারণ জীবের ঐ প্রকাশশক্তি অতি ক্ষীণ—যে কোন পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার অতি সামান্য অংশকে প্রকাশিত করে। মনে কর, তুমি বৃক্ষ দেখিতেছ। তোমার বুদ্ধিসত্ত্ব বা প্রকাশ-শক্তি বলিয়া দিল—"ইহা বৃক্ষ"। বৃক্ষের কিন্তু সামান্য অংশই তোমার জ্ঞানগোচর হইল। উহার অতীত অনাগত অবস্থা, অভ্যন্তরস্থিত রস-প্রবাহ ইত্যাদি, সকলই তোমার অজ্ঞাত রহিল। বুদ্ধিসত্ত্বের মলিনতাই উহার একমাত্র হেতু। কিন্তু সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হইলে, এরূপ হয় না; বিষয়ের যাবতীয় অংশ যুগপৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই শক্তির নাম অমলহার। উহা যে একমাত্র সর্ব্বশক্তিময়ী মাতৃশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, উহাতে যে আমার বলিয়া অভিমান করিবার কিছু নাই; উহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই মাকে অমলহার পরাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষীরোদসমুদ্রের অমলহার-অর্পণের ইহাই রহস্য। অন্যান্য আভরণ-অর্পণও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা পুনঃ পুনঃ অর্পণের রহস্য না বলিয়া, মাত্র আভরণ গুলির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(২) অজর অম্বরযুগল—অবিনাশী বস্ত্রদ্বয়। মায়া এবং অবিদ্যা, ইহারাই মায়ের হেম বপুর আচ্ছাদন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—মা বলিতেছেন "মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি সতত সঙ্গোপনে থাকি।" মা যেখানে ঈশ্বরবোধে উদ্বুদ্ধা, সেখানেই মায়াশক্তির বিকাশ। আর যেখানে জীববোধে উদ্বুদ্ধা, সেইখানে অবিদ্যাশক্তির বিকাশ। এতদুভয় অনাদি; তাই মন্ত্রে "অজর" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। মায়া এবং অবিদ্যাশক্তির স্বরূপ কি, উহারা কিভাবে মাতৃ-অঙ্গের আচ্ছাদন, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলেই বুঝিতে পারা যায়।

(৩) দিব্য চূড়ামণি—স্বর্গীয় শিরোভূষণ। ইহা দিব্য জ্ঞানশক্তি—যে জ্ঞানের ফলে জগতের সমস্ত তত্ত্ব অসঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করা

যায়। সাধারণতঃ আমরা যে জ্ঞানে বিচার করি, উহা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত জ্ঞান। আমাদের যখন বৃক্ষজ্ঞান হয়, তখন উহার কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্প ত্বক্ বর্ণ অবকাশ প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন জ্ঞানের সাঙ্কর্য্যমাত্র হয়। বৃক্ষত্ববিশিষ্ট একটি অবিমিশ্র জ্ঞান হয় না। এইরূপ কোন একটি বস্তুরও যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা সাধারণ জীবের জ্ঞানগ্রাহ্য নহে। কিন্তু দিব্য জ্ঞানশক্তি লাভ হইলে, আর ঐ সঙ্কার্ণতা থাকে না। তখন প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম্ম, অসঙ্কীর্ণভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বুদ্ধিসত্ত্ব-নির্ম্মলতার উহাই অবিসংবাদি লক্ষণ।

(৪) কুণ্ডলদ্বয়—কর্ণভূষণ। অতিদূরে যে সকল ধ্বনি হয় এবং অন্তরে যে অনাহত শব্দ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিবার সামার্থ্যকেই দিব্য শ্রবণ-শক্তি কহে। ইহাই যথার্থ কর্ণভূষণ।

(৫) কটক—হস্তাভরণ, বলয়বিশেষ। ইহা দিব্য গ্রহশক্তির দ্যোতক। একস্থানে অবস্থান করিয়া, বহুদূরস্থিত কিংবা ব্যবহিত বস্তু পরিগ্রহণের যে শক্তি, তাহাই কটক বা হস্তাভরণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৬) শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র—ললাটভূষণ, দিব্যজ্যেতিঃ। আজ্ঞাচক্র হইতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানজ্যোতির প্রকাশ হয়। উহার প্রভাবে বিপ্রকৃষ্ট ব্যবহিত ও সূক্ষ্ম বস্তু অনায়াসে দর্শন করা যায়। ইহাকে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদর্শণ-শক্তি বলা হয়! যোগশাস্ত্রে ইহা "প্রবৃত্ত্যালোক" নামে অভিহিত।

(৭) কেয়ূর—বাহুভূষণ, বিধারণশক্তি। ইহাকেই দিব্য ধারণ-শক্তি বলা হয়। যে শক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন।

(৮) নূপুর—পাদভূষণ, দিব্য গতিশক্তি। এই শক্তি-প্রভাবে দুর্গম স্থানে গমন, মৃত্তিকা কিংবা প্রস্তরাদি মধ্যে প্রবেশ, আবদ্ধ স্থান হইতে অনায়াসে নির্গম প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সিদ্ধ হয়। দন্তী আছে—মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে কারাগারে আবদ্ধ করা

হইলে, তিনি অনায়াসে বাহিরে আসিয়াছিলেন। উহা এই দিব্য গতিশক্তিরই ফল।

(৯) গ্রৈবেয়ক—গ্রীবার আভরণ, কণ্ঠভূষণ। ইহা দিব্যকণ্ঠ। যাহার বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল, তাহার কণ্ঠস্বর জনপ্রিয় হয়। তাহার কথাগুলি যেন সকলেরই নিকট মধুর প্রতীত হয়। সে গালি দিলেও মানুষ বিরক্ত হয় না। ইহাকে "স্বর-প্রসাদ" বলে।

(১০) অঙ্গুরীয়ক রত্ন—দিব্য স্পর্শশক্তি। এই শক্তি-প্রভাবে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুকে অনায়াসে স্পর্শ করিয়া, তাহার কাঠিন্য বা কোমলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হইলেই প্রাভিত জ্ঞান হয়। যোগসূত্রে আছে —"প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বম্।" প্রাতিভ নামক জ্ঞান হইলে, সর্ব্ববিধ যোগবিভূতি লাভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—শুদ্ধসত্ত্বগুণই ক্ষীরোদ-সমুদ্র। উহাতে যে সকল রত্ন বা অলৌকিক শক্তি আছে, সে সকলই মাতৃ-শক্তি অর্থাৎ মাতৃ-অঙ্গে আভরণ জ্ঞানে তাহাকে অর্পণ করিয়া, সাধক সর্ব্ববিধ অভিমান হইতে বিমুক্ত হয়। যাঁহারা যথার্থ মুক্তিকামী সাধক, যাঁহারা যথার্থ মাতৃস্নেহে আত্মহারা সন্তান, তাঁহাদেরও প্রারব্ধফলে ঐ সকল যোগবিভূতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ববোধ না থাকাতে, উহাদ্বারা তাঁহারা কোন অলৌকিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। যাঁহারা শরণাগত ভাবের সাধক তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মকর্তৃত্ব মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত জগতের কার্যগুলি করিয়া যান। তথাপি কিন্তু সময় সময় তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। উহা তাঁহাদের অভিমানকৃত নহে, মাতৃপ্রেরণাই ঐ সকল শক্তিপ্রকাশের হেতু। যাঁহারা যথার্থ মাতৃস্নেহে মুগ্ধ, তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া জগতে খ্যাতিমান্ হওয়ার সাধ বিন্দুমাত্রও থাকে না। এ জগতের জয়ধ্বনি তাঁহাদের নিকট পৌঁছায় না। মহতী শক্তির অঙ্কে আত্মকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারা জগতের স্তুতি-নিন্দার অনেক উপরে চলিয়া যান। কিন্তু সে অন্য কথা।

বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্মৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্॥ ২৬॥

অনুবাদ। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অতি নির্ম্মল পরশু, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ম্ম প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা। বিশ্বকর্ম্মা—ত্বষ্টা। শ্রুতি আছে—"ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।" বিশ্বকর্ম্মাই জগতের রূপ ও নাম ব্যাকৃত করেন। অব্যাকৃত মূল-প্রকৃতিকে যিনি বিশিষ্ট নামে ও রূপে পরিণমিত করেন, তিনিই বিশ্বকর্ম্মা। যেরূপ শিল্পী একখণ্ড প্রস্তর কাটিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি বা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে সেইরূপ বিশ্বকর্ম্মাও নামরূপ-হীন অব্যক্ত প্রকৃতিকে নামরূপাদি স্বরূপে ব্যক্ত করেন। এই বিশ্ব-সংগঠন শক্তি যে মায়েরই শক্তি, ইহা উপলব্ধি করার নামই বিশ্বকর্ম্মার পরশু এবং অন্যান্য অস্ত্র প্রদান। অভেদ্য কবচ প্রদানেরও একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে—বিশ্বকর্ম্মা এত বৈচিত্র্যময়—এত বহুভাবময় জগৎকে প্রকটীত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। যেরূপ অভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া যোদ্ধা অগণিত শত্রুকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াও স্বয়ং অক্ষত থাকে, সেইরূপ বহুনামে বহুরূপে ব্যাকৃত হইয়াও বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং অব্যাকৃত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বরূপে অবস্থান করেন। ইহা যে শক্তির প্রভাব উহাই বিশ্বকর্ম্মার অভেদ্য কবচ। উহাও যে, মায়েরই শক্তি, ইহা উপলব্ধি করার নামই বর্ম্মসমর্পণ।

অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্।
অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্॥ ২৭॥

অনুবাদ। সমুদ্র একটী অম্লানপঙ্কজের মালা মস্তকে ধারণ করিবার জন্য এবং অপর একটী মালা বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাঁহাকে দিয়ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অতি সুশোভন আরও একটী পঙ্কজ (হস্তে ধারণ করিবার জন্য) দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। জলধি—জলসমুদ্র। পূর্ব্বে সপ্তসমুদ্র-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—তমোগুণই জলসমুদ্র। পঙ্কজমালা—সংস্কারশ্রেণী। পঙ্ক শব্দের অর্থ কর্দ্দম এবং পাপ উভয়ই হয়; সুতরাং পাপ হইতে যাহা জন্মে, তাহাকেও পঙ্কজ বলা যায়। পঙ্ক বা পাপ কি? একমাত্র "অহং" ভাবই পাপ। দেহাদিতে যে অহংবুদ্ধি, তাহাই মূল পাপ। তাই মন্ত্রবর্ণেও উক্ত হইয়াছে—"পাপোঽহং"। আমিবোধ অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে যে আত্মবোধ, তাহাই সর্ব্বপাপের আকর। পৃথিবীতে যত রকম পাপ আছে, তাহা এই আমিবোধের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। কেবল পাপ নহে, যাহাকে সাধারণ কথায় পুণ্য বলে, তাহাও এই "পাপোঽহং" ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এ দৃষ্টিতে পুণ্যও পাপেরই অন্তর্গত। যেরূপ পরিণামাদি-দোষহেতু পুণ্য বা জাগতিক সুখও বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; সেইরূপ আত্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে অনাত্মবোধমাত্রই পাপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই পাপ-পুণ্যেরই দার্শনিক নাম—সংস্কার। সংস্কার সমূহ "পাপোঽহং" হইতেই জন্মে; এইজন্য ইহাকে পঙ্কজ বলা যায়। সংস্কার অসংখ্য বলিয়াই মন্ত্রে মালা শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সংস্কারই বেদান্তের ভাষায় মায়া, সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি, মীমাংসকের ভাষায় অপূর্ব্ব, নৈয়ায়িকের ভাষায় অদৃষ্ট। সংস্কার অনাদি; তাই মন্ত্রে "অম্লান" এই সার্থক বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের নিকট হইতে মায়া বা প্রকৃতি সরিয়া দাঁড়ায় মাত্র; উহার সর্ব্বথা ধ্বংস বা অপচয় নাই, উহা প্রবাহরূপে নিত্য; তাই অম্লান। আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদ্-ভাষ্যে বলিয়াছেন—"অমৃতং কর্ম্মফলম্"।

যাহা হউক, এই পঙ্কজমালা বা সংস্কারশ্রেণী তমোগুণেই বিধৃত থাকে। প্রখ্যা বা প্রকাশ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি বা উদ্বেলন রজোগুণের ধর্ম্ম, এবং স্থিতি বা ধারণ তমোগুণের ধর্ম্ম। তমোগুণের অন্তর্নিহিত অর্থাৎ বীজভাবপ্রাপ্ত সংস্কারগুলি রজোগুণকর্ত্তৃক উদ্বেলিত হয়; এবং তাহারই ফলে—আত্মসত্তা-প্রকাশরূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম

উদ্বোধিত হয়। সুতরাং তমোগুণ বা জলধিই মাকে আমার অম্লান পঙ্কজ মালায় সুশোভিত করিতে সমর্থ। সাধক! মনে রাখিও যদি সত্য সত্যই মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তবে যে সকল সংস্কারের জ্বালায় তুমি নিয়ত উৎপীড়িত, নিয়ত বদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছ, ঐ সংস্কার-শ্রেণীই মাতৃ অঙ্গের ভূষণরূপে শোভা পাইবে।

এই মন্ত্রে আরও রহস্য আছে—দুইটি পঙ্কজমালা এবং পৃথক একটি পঙ্কজ অর্পণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সংস্কারসমূহের ত্রিবিধ অবস্থা সূচিত করে। আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ, এই তিন শ্রেণীতে সংস্কাররাশি বিভক্ত। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। মাতৃলাভ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, উত্তর এবং পূর্ব্ববর্ত্তি-সংস্কার সমূহের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। মাত্র প্রারব্ধ অবশিষ্ট থাকে। উহা ভোগের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আগামী সংস্কারশ্রেণী মায়ের "শিরসি" অর্থাৎ শিরোভূষণরূপে শোভা পায়। সঞ্চিত সংস্কারশ্রেণী মায়ের "উরসি" অর্থাৎ বক্ষস্থলে শোভা পায়। আর বাকী থাকে প্রারব্ধ। যদিও উহা কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টিমাত্র, তথাপি একটি জন্মেই উহার ক্ষয় হইয়া যায়। তাই প্রারব্ধ কর্ম্ম সংস্কারসমূহকে পঙ্কজের মালা না বলিয়া, একটিমাত্র পঙ্কজ বলা হইয়াছে। উহা মায়ের হস্তস্থিত লীলাকমলরূপে শোভা পায়। বাস্তবিকপক্ষে, আত্মদর্শীর জীবনকালের প্রত্যেক কার্য্যই লীলামাত্র; কারণ তাঁহারা সাধারণ জীবের মত রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। মাতৃ-চরণে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া, মাতৃহস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায়, জাগতিক কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন করেন; তাই, এই পঙ্কজটি মাতৃকরস্থিত লীলাকমলরূপে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে একটি আত্মসম্বেদনও আছে—"ব্রহ্মাত্মদ্রষ্টুর্ব্যবহৃত লীলৈব"। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন লীলামাত্র।

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হিমবান্ দেবীর বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্নরাজি এবং ধনাধিপতি কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা।—হিমবান্—ঘনীভূত দেহাত্মবোধ। হিমালয় পর্ব্বত স্থুলত্বের অর্থাৎ জড়াত্মবোধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মনুষ্যদেহটীও জড়ের বা দেহাত্মবোধের চরম আদর্শ। জীব এই স্থুল দেহকে "আমি" মনে করিয়া এমনই বদ্ধ হয় যে, তাহাকে হিমালয়বৎ চৈতন্য-বিমূঢ় না বলিয়া থাকা যায় না।

সিংহ—দেবীর বাহন। প্রথম খণ্ডে এ বিষয়টী বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানুষ যখন স্বকীয় দেহাত্মবোধের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়, তখনই তাহাকে সিংহধর্ম্মী বলিতে হয়। এই জীবভাবের প্রতি হিংসা এবং ব্রহ্মভাব উদ্বোধনের জন্য প্রয়াস, ইহা একমাত্র মনুষ্য-দেহেই সম্ভব। সেইজন্যই মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ, সিংহও পশুশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য যখন স্বকীয় জীবভাবটীকে মায়ের বাহনরূপে অর্থাৎ মাতৃ-শক্তির পরিচালক একটী যন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই এই সিংহ-অর্পণ সিদ্ধ হয়। যতদিন অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধি না হয়, অর্থাৎ আমার "আমিই যে মা" ইহা সম্যকরূপে অনুভূত না হয়, ততদিনই জীবভাবের প্রতি হিংসা বা সিংহভাব থাকে; কিন্তু মাতৃলাভের পর এই হিংসাভাব আর থাকে না; তখন সে মায়ের বাহনরূপে পরিচালিত হইতে থাকে।

নানাবিধ রত্ন অর্থে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম্মফলসমূহ। মানবদেহই যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র। এই দেহেই কর্ম্ম হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠিয়মান কর্ম্মসমূহ যজ্ঞরূপে মাতৃপূজা সম্পন্ন করে। অন্যান্য দেহ অর্থাৎ দেব কিংবা পশুদেহ ভোগভূমিমাত্র—সে সকল দেহে কর্ম্ম হয় না। সাধক যখন "প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং, সয়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং" মন্ত্রে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যখন সাধকের প্রতি

কর্ম্মই একমাত্র মাতৃ পূজারূপে এবং প্রতি কর্ম্মফল মাতৃ-তৃপ্তিরূপে পরিণত হয়, তখনই এই রত্নরাজির অর্পণ সিদ্ধ হয়। গীতায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের মত অশক্ত জীবের জন্য স্বয়ং ভগবান কর্ম্মফল-ত্যাগরূপে যে অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, দেবীমহাত্ম্যের এই হিমবানকর্ত্তৃক বিবিধ রত্নরাজির মাতৃ-চরণে সমর্পণই তাহার যথার্থ সফলতাময় পরিণাম। এইজন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—গীতা সাধনা এবং চণ্ডী সিদ্ধি। সে যাহা হউক, যেরূপ রত্নের লোভে মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও গভীর সমুদ্রে অবগাহন করে, ঠিক সেইরূপ ফলের লোভেই জীব দুস্তর কর্ম্মসমুদ্রে অবগাহন করে। তাই, কর্ম্মফলই রত্ন। সাধক! এই রত্নরাজি মাতৃ-চরণে উপহার দিয়া, কর্ম্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্ত হও।

এস্থলে আর একটু বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, সিংহ-সমর্পণ না হইলে রত্ন-অর্পণ হইতে পারে না। প্রথমে জীব-ভাবকে মাতৃ-বাহনরূপে উপলব্ধি করিতে হয়; তারপর দেখা যায়—কর্ম্মফল-অর্পণ অপনা হইতে হইয়া যাইতেছে। তজ্জন্য আর পৃথক কোন চেষ্টারই আবশ্যক হয় না। সাধক! তোমার জীব-কর্ত্তৃত্বাভিমানকে ধরিয়া মাতৃ-চরণে অবনত কর, দেখিবে—ফলের দিকে লক্ষ্যহীন হইয়াও তুমি বহু বৈচিত্র্যময় কর্ম্মানুষ্ঠানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছ।

ধনাধিপ—জীবনীশক্তি। জীবনই সর্ব্বধনের অধিপতি। তিনি নিয়ত বিষয়ানন্দরূপে সুরাপানেই মুগ্ধ থাকেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই—এ মদিরা কোথা হইতে আসে। এই যে কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ-জানিত তৃপ্তি-সুরা, ইনি কে? ইহা না জানিয়াই ভ মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট। এতদিনের এই অত্যাচারের ফলেই আজ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—এই মদিরাপূর্ণ বিষয়রূপ চষকটিও (পানপাত্র) মা ব্যতীত অন্য কেহ নহে। বহু সৌভাগ্যের ফলে মানুষ এই পানপাত্রটিকেও মা বলিয়া বুঝিতে পারে। বিষয়ানন্দ যে ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আজ ব্রহ্মময়ীর

ব্রহ্মযজ্ঞে বিষয়াদনন্দনপূর্ণ পানপাত্রটি পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া ধনাধিপতি ধন্য হইলেন।

শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।
নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই সর্ব্বনাগাধিপতি শেষনাগ (অনন্ত) দেবীকে মহামণিবিভূষিত নাগহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। শেষ—অবশেষামৃত সংস্কারবীজ। যোগের ভাষায় ইহাকে "কর্ম্মাশয়" বলা যায়; কর্ম্মাশয় হইতেই জীবের জাতি, আয়ু এবং ভোগ নিষ্পন্ন হয়। পার্থিব দেহেই উহা সম্ভব, যেহেতু কর্ম্মাশয় নিয়তই পৃথিবীকে অর্থাৎ পার্থিবভাবসমূহকে ধারণ করিয়া রখিয়াছে, তাই, মন্ত্রে "ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাং" বলা হইয়াছে। আমরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, উহা সূক্ষ্ম বীজাধাররূপ কর্ম্মাশয় হইতে অঙ্কুরিত হয়। প্রতিজীবনে নূতন নূতন কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, সুতরাং প্রতি জীবনেই নূতন নূতন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কর্ম্মের শেষ অবস্থা বলিয়া ইহাকে—এই সংস্কার-বীজকে "শেষ" বলা হয়।

ইহাকে সর্প এবং সর্ব্বনাগাধিপতি বলা হয় কেন? কর্ম্ম বলিলেই একপ্রকার শক্তির স্ফুরণ বুঝায়। দর্শন শ্রবণাদি প্রতিকর্ম্মই এক এক প্রকার শক্তির স্ফুরণ মাত্র। এই শক্তি সমূহ যখন অব্যক্ত বা বীজাবস্থায় থাকে, তখন ইহাদিগের স্বরূপ অনুভূত হয় না; কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইলেই শক্তির সত্তা উপলব্ধি হয়। শক্তি যখন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রবাহশীলা হইয়া কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ইহার গতি সর্পবৎ হইয়া থাকে। সৃপ্ ধাতুর অর্থ—কুটিল গতি। সর্প শব্দও কুটিলগতি-বিশিষ্ট জীব-বিশেষেই প্রসিদ্ধ। শক্তিপ্রবাহ কখনও সরল ভাবে পরিচালিত হয় না। আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও

ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। (আমাদের নিকট কিন্তু শক্তি জড় নহে। শক্তি বলিলেই আমরা চিৎ বা চৈতন্যসত্তাই বুঝিয়া থাকি।) সে যাহা হউক আমাদের অনেক দেবমূর্ত্তি আছেন, যাঁহারা সর্পভূষণ বা সর্পসংস্থিত।

উহার রহস্য এই যে, যে শক্তি ঘনীভূত হইয়া যেরূপ স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, সেই শক্তির প্রবাহময় অবস্থা সূচনা করিবার জন্যই, ঐ সকল মূর্ত্তির সর্পাভরণ দৃষ্ট হয়; এবং এই সত্য অনুধাবন করিয়াই জীবভাবীয় শক্তিকে "কুলকুণ্ডলিনী" বলা হয়। বস্তুতঃ সাধকগণ যখন বিশিষ্ট ক্রিয়াদি করেন, তখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভবও করিয়া থাকেন—শক্তিপ্রবাহ যেন সর্প-গতিতে প্রবাহময় হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্থিত হইতেছে, অথবা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছে।

যাহা হউক, কর্ম্মাশয় হইতেই ক্ষুদ্র মহৎ যাবতীয় শক্তির বিকাশ হয়; তাই "শেষ"কে সর্ব্বনাগেশ" বলা হইয়াছে। ইনি মাকে মহামণি-বিভূষিত নাগহার দিয়াছিলেন। মোক্ষফল সুশোভিত কুলকুণ্ডলিনীই মণিবিভূষিত নাগহার। যদিও বস্তুবিক বন্ধ বা মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই; কারণ, পরমাত্মা নিত্যমুক্তস্বরূপ; তথাপি জীবভাবকে অপেক্ষা করিয়া বন্ধ এবং মোক্ষ উভয়ই আছে; যেহেতু সত্যসঙ্কল্প-ব্রহ্মেই জীবভাব পরিকল্পিত হয়।

সাধক! মূলাধারই কর্ম্মাশয়; উহাতে জীবভাব অবস্থিত। জীবভাবের নামই কুলকুণ্ডলিনী। একটা সর্প কল্পনা করিয়া বিপথগামী হইও না। জীবেরই মুক্তি হয়, তাই কুণ্ডলিনীর মস্তকে মোক্ষরূপ মহামণি সুশোভিত। সর্পগতিতে জীবশক্তি ব্রহ্মাভিমুখী হয়; তাই উহাকে সর্প বলা হয়। এই জীবশক্তিও যে একমাত্র মা, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই নাগহার-অর্পণ সিদ্ধ হয়। মূলাধারবস্থিতা সুষুপ্তা ভুজঙ্গরূপিণী মাকে বল—"মা! তুমি কবে উদ্বুদ্ধা হইবে? কবে এ জীবত্বের নিগড় খসিয়া পড়িবে? মা! যাহারা যোগী, যাহারা শমদমাদি-সাধন-সম্পন্ন, তাহারা নানা উপায়ের সাহায্যে তোমাকে উদ্বুদ্ধা করিতে প্রয়াস পায়। আমাদের যে কোন বল নাই, কোন

সাধনাই নাই মা! তাই বলিয়া কি মা আমার, চিরকাল নিদ্রিতাই থাকিবে? একবার জাগো, একবার পরমেশ্বরী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার এই অধম পুত্রকে আদরে কোলে তুলিয়া লও! এইরূপভাবে সরল প্রাণে প্রার্থনা কর। দেখিবে—মা কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছেন, তোমার জীবত্ব মাতৃ-অঙ্গে মুক্তিরূপ-মহামণি-ভূষিতহাররূপে শোভা পাইতেছে। আর তুমি—তুমি মায়ে মিলাইয়া গিয়াছ।

অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। এইরূপ অন্যান্য দেবগণকর্তৃক বহুবিধ ভূষণ ও আয়ুধদ্বারা সম্মানিতা হইয়া দেবী মুহুর্মুহু অট্টহাস এবং উচ্চনাদ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। প্রধান দেবতাগণের শক্তি-সমর্পণ ব্যক্ত করিয়া অন্যান্য দেবগণেরও আয়ুধ ভূষণাদি-দানের বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক ঋষি এ প্রস্তাব শেষ করিলেন। ঠিক এইরূপই হয়—জীব যখন সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-লিপ্‌সু হইয়া পড়ে, তখন তাহার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি স্থূল দেহের প্রত্যেক পরমাণুটি পর্য্যন্ত মাতৃনামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। মাতৃনামে—প্রণবাদি-মন্ত্রজপে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেও জপাদি চলিতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় অনতি-প্রযত্নে জপ নিষ্পন্ন হইতে থাকে। জপ বলিলে কেহ মালা কিংবা হাতের জপ বুঝিবে না। "তজ্জপস্তদর্থভাবনম"। মাতৃস্বরূপের কিংবা মহত্ত্বের অনুচিন্তনই যথার্থ জপ। যোগযুক্ত অবস্থাই জপের বিশেষ লক্ষণ। সে যাহা হউক, ঐরূপ যোগযুক্তভাব ক্রমে ঘনীভূত হইতে থকে। ক্রমে ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়া সংস্কারানুরূপ ইষ্টমূর্ত্তিরূপে প্রাকাশিত হয়; অথবা বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই সময় সাধক বেশ বুঝিতে পারে—ইনিই একমাত্র কর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর। ইনি এক হইয়াও সর্ব্বভাবের

অধিষ্ঠাতা ও সর্ব্বভাবে অনুস্যূত। এতদিন যাহাতে আমি অভিমান করিতাম, অর্থাৎ আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি ইত্যাদিরূপ যে অভিমানের দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া মূঢ় ছিলাম, উহা অজ্ঞতামাত্র। এখন মাতৃ-কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিলাম—আমি বলিতে মা ব্যতীত অন্য কেহ নাই, আমার বলিতেও মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সৎস্বরূপা মা, সর্ব্বেশ্বরী মা এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতাও মা, এই তিন স্বরূপে মা আমার জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মভাবে নিত্য বিরাজিতা।

"মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই" এই মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই অভিমানের নিগড় খসিয়া পড়ে। তখন সাধক যাহা কিছু পায়, বস্ত্র ভূষণ আয়ুধ ইত্যাদি যাহা কিছু—সকলই ধরিয়া মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে সকল বস্তুতে অভিমান অর্থাৎ মমত্ববোধ ছিল, সে সকলই অকপটভাবে মাতৃপূজার উপকরণরূপে অর্পণ করিয়া মাকে সম্মানিতা করে। আরে, মায়ের আবার অসম্মান বলিতে কিছু আছে না কি যে,—দেবতাবৃন্দ ভূষণআয়ুধাদিদ্বারা মাকে সম্মানিতা করিবে? না গো তা নয়; মা আমার সম্মান অসম্মান উভয়েরই উপরে, তবে দেবতাগণ ঐরূপে পূজা করিয়া নিজেরাই পূজিত বা সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদিও মান্ ধাতুর অর্থ পূজা এবং এস্থলে সম্মানিত শব্দটি সম্যক্‌প্রকারে পূজিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; (১) তথাপি প্রচলিত ভাষায় যাহাকে "মানা" অর্থাৎ মানিয়া লওয়া বা স্বীকার করা বলে, আমরা এখানে সম্মামিত শব্দের সেই অর্থই করিব। সম্যক্‌রূপে মানিয়া লইলেই, মা আমার সম্মানিতা হন।

মা গো! শুধু তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই যে, তোমাকে মানা হয়, তুমি সম্মানিতা হও, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে এই কথাটি বুঝাইয়া দাও। শুধু "তুমি আছ" এই একটা কথা মনে রাখিয়া জীব যদি জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পথে চলে, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইয়া যায়! আমরা মুখে বলি "ভগবান্ আছেন" কিন্তু

(১) গৌরবিত ব্যক্তির প্রীতিহেতু যে সকল অনুষ্ঠান করা যায়, তাহারই নাম পূজা।

কার্য্যকলাপগুলি ঠিক তাহার বিপরীত। এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যতগুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহার মধ্যে কয়টা কার্য্য ভগবানের অস্তিত্ব সম্মুখে রাখিয়া করা হয়? হিন্দুগৃহে কুলললনাগণের স্বামী আছেন কি না, ইহা যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না, তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতিই স্বামীর অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়; ঠিক সেইরূপ যে মানুষ জগৎস্বামীর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছে, তাহার আকৃতি, তাহার প্রতি কার্য্যই ভগবৎসত্তা প্রকাশ করে। মা! আমারা যে তোমার সত্তাই মানি না, তবে আর কোন্ মুখে বলিব—আমায় দেখা দাও! যাঁহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস নাই, তাঁহার দর্শনাভিলাষ কিরূপে হয়! হয়ত "মা আমায় দেখা দাও" বলিয়া কত কাঁদিলাম, কত চক্ষুর জল ফেলিয়া লোকের দৃষ্টিতে ভক্ত প্রেমিক সাজিলাম, হয়ত বা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনিতে নিজেকেই কৃতার্থ মনে করিলাম; কিন্তু বড় সত্য কথা এই যে—যথার্থই তোমার সত্তা মানিয়া লওয়া হয় নাই। তাই বলি মা! তোমার স্বরূপ বুঝিতে চাহি না, তোমার অচিন্ত্য অব্যয় মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে চাই না, শুধু তোমায় মানিতে দাও, তুমি "আমার একজন"—তোমার সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক, শুধু তুমি "আছ", এই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ কর। তোমার সত্তা মানিতে দাও! আমার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমস্বরে বলিয়া উঠুক—"মা সত্য"। স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, সংসার আছে, দেহ আছে, এই "আছে" গুলি কত ঘনভাবে বুকে ফুটিয়া উঠে। বাস্তবিক কিন্তু এই "আছে" গুলিকে নাই বলিলেও কিছুই ক্ষতি হয় না— উহা অজ্ঞানমাত্র। আর যাহা যথার্থই "আছে"—যাহার সত্তা এত ঘন যে, সে সত্তার দিকে দৃষ্টি পড়িলে, অমনি জগৎসত্তা—এই ছোট ছোট "আছে" গুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়; সেই অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

মা গো! বহুদিন বহুজন্ম বহুযুগ ধরিয়া, এই জীবত্বের অসহনীয় পেষণ সহ্য করিয়া আসিতেছি, শুধু ঐ একটীর জন্য শুধু তোমায়

মানি না বলিয়াই, আমাদের জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দুঃখ কষ্ট যত কিছু। এই যে মহিষাসুরের উৎপীড়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বাসনাগুলির অত্যাচার, বহুদিন বহুদিন, মা গো! এইগুলিদ্বারা জর্জ্জরীভূত হইতেছি। আর পারি না মা! ওগো, তুমি তোমার সত্তাটি লুকাইয়া রাখ বলিয়াইত আমরা তোমাকে মানিতে পারি না! আর তারই ফলে এই ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া মরি। কিন্তু আর না! একবার প্রকাশিত হও, একবার দেখ তোমার বড় সাধের সন্তান আজ সংসার সন্তাপে কত উৎপীড়িত!

ঐ দেখ সাধক! যে মুহূর্ত্তে তুমি মাতৃ-সত্তা মানিয়া লইয়াছ যে মুহূর্ত্তে তুমি ঠিক ঠিক বুঝিয়াছ তোমার দুঃখহারিণী মা একজন আছেন, যে মুহূর্ত্তে তুমি আপনাকে অসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত মনে করিয়া অজ্ঞেয় সত্তার দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিয়াছ "এস মা, আমি বড় উৎপীড়িত," ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মা আমার আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "উচ্চৈঃ ননাদ" "সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ"। মা হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন, অট্টহাসিতে দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন; মা আমার চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। কে রে! পুত্রের প্রতি অত্যাচার! মা ভৈঃ! আমি মা তোমার! আমি আসিয়াছি। আর তোমাকে উৎপীড়িত হইতে হইবে না। সন্তান! তোমার উৎপীড়ন-বোধ আমার ক্রোধের উদ্দীপন আনিয়াছে; আমায় চণ্ডী করিয়াছে! আর ভয় নাই! আর তোমাকে অনাত্মভাব বা জড়ত্বকর্ত্তৃক মথিত হইতে হইবে না। আমি যাবতীয় জড়ভাবের—অসুরের বিনাশ-সাধন করিব। আর উহাদের রক্ষা নাই।

সাধক! মায়ের এই অভয়বাণী, এই উচ্চনাদ, এই অট্টহাসি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, জন্ম জীবন সার্থক কর। ভাবিও না ইহা ভাষার ঝঙ্কার বা ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র। সত্যই তুমি যে দিন আপনাকে অসুরের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত বলিয়া বুঝিতে পারিবে, সত্যই তুমি যে দিন মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইবে, সত্যই যে দিন তুমি শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা বলিয়া মাতৃ-আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া

থাকিবে, সেই দিনই বুঝিতে পারিবে—এইরূপ পরিত্রাণ-পরায়ণা মূর্তিতে মাতৃ-আবির্ভাব কত সত্য! কিন্তু সে অন্য কথা।

পুনঃ পুনঃ বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য যে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, যখন উঁহা সমষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে উপলব্ধিযোগ্য হইতে থাকে, তখন সাধক দেখিতে পায়—উহাতে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নাই; অথচ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় সত্তা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। এতদিন অন্ধের ন্যায় বিষয়রূপ যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মসত্তা উদ্বুদ্ধ করিতে হইত কিন্তু এখন আর তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অধিষ্ঠান চৈতন্য বা চিৎসমুদ্রে অবগাহন করিয়া, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াও সাধক পূর্ণ ঘন আত্মসত্তায় উদ্বুদ্ধ থাকিতে পারে। মরি মরি! সে কি অপূর্ব্ব! কি লোভনীয় অবস্থা! যদিও এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করা যায় না, তথাপি, যতটুকু থাকা যায়, তাহার মধুময়ী স্মৃতিই সাধককে ব্যুত্থানকালে আনন্দময় করিয়া রাখে। আবার ঐ অখণ্ড সত্তার মধ্য হইতেই অভীষ্ট মূর্ত্তিদর্শন করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হয়।

যাহা হউক, এ স্থলে দেবতাবৃন্দের তেজোরাশি-সমুদ্ভুতা যে বিশিষ্ট মূর্ত্তির বিষয় বৈকৃতিক রহস্যে উক্ত হইয়াছে, উহা মহালক্ষী-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সমগ্র ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি-সমন্বিতা পূর্ণ ভোগময়ী। তাই ইহার নাম ভোগমায়া। আমরা প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ-নিধনে যে তামসী মহাকালী মূর্ত্তির আর্বির্ভাব দেখিয়াছি, উহা মহাকালী বা যোগমায়া মূর্ত্তি। বিষ্ণুর যোগনিদ্রার অপনয়ন জন্যই সে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। আর এই অধ্যায়ে মায়ের অসীম মহিম-ময়ী অনন্ত ভোগময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দেব-শক্তি-সম্মিলিত এই মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিতে মা আবির্ভূত হইয়া, যেমন একদিকে দেবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করেন তেমনি অন্যদিকে অসুর কুলের নিধন করিয়া, জীবের মুক্তিমার্গ অন্তরায় শূন্য করেন। ক্রমে ইহার রহস্য আরও উদ্‌ঘাটীত হইবে।

তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥ ৩১ ॥
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। তাঁহার (দেবীর) ঘোর নিনাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। অপরিমেয় অতি মহান্ সেই নাদের মহান্ প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাতে লোকসকল বিক্ষুব্ধ, সমুদ্র সকল কম্পিত, বসুন্ধরা চালিত এবং মহিধরগণ প্রচলিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিভাবাপন্ন হইলে, ব্যষ্টিনাদও সমষ্টি-ভাবপ্রাপ্ত হয়। যেরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মিকা মহাশক্তি প্রতি-জীব হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও ভাবাকারে প্রকাশিত হইতে গিয়াই, ব্যষ্টিভাব বা পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়; ঠিক সেইরূপ এক মহান্অব্যক্ত নাদও বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ তালু জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি যন্ত্রে প্রতিহত হইয়া বিভিন্ন নাদরূপে প্রকাশ পায়। যেরূপ, শক্তি এক অখণ্ড, সেইরূপ নাদও এক—অখণ্ড। যতদিন এই অখণ্ড শক্তির বা নাদের সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিনই উহারা বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি—অনির্ব্বচনীয়া, উহার প্রথম অভিব্যক্তি—নাদ। নাদ ও শক্তি পরস্পর অবিনাভাবী। যেখানে শক্তির অভিব্যক্তি, সেইখানেই নাদ। সাধকগণ মাতৃ-কৃপায় মহতী শক্তির সন্ধান পাইলেই এই সুমহান্ নাদেরও সন্ধান পায়। এ জগতে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা অন্তরে যে কোনও ভাবের উদয় হয়, উহা, এক একটী শব্দমাত্র। শব্দ নাই অথচ পদার্থ কিংবা ভাব আছে, ইহা হয় না। জীব এতদিন এক একটী বিশিষ্ট শব্দে আসক্ত ছিল, তাই বহুত্বের বন্ধন—মহিসাসুরের অত্যাচার ছিল। কিন্তু বহু সুকৃতির ফলে আজ অখণ্ড নাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহা মায়েরই নাদ। অব্যক্তা

মা আমার নাদময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইয়াছেন। প্রথমতঃ উহা অনাহত নাদরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, সমুদয় ব্যোমমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সে নাদ উত্থিত হয়; পরে শরীরের প্রতি পরমাণুতে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়া, দেহটী নাদময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সেই অবস্থায় এই সমগ্র বিশ্ব একটি অখণ্ড নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই মনে হয় না। সেই অখণ্ড নাদে আমিত্বকে মিলাইয়া সাধক যে অনুপম আনন্দ ভোগ করেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উহাই মায়ের ঘোর নাদ, উহাতে লোকসকল বিক্ষুব্ধ হয়, সমুদ্র সকল কম্পিত হয়, বসুধা চালিত হয় এবং মহীধরগণ প্রচলিত হইতে থাকে।

লোক—দর্শনার্থক লুক্ ধাতু হইতে লোক শব্দ নিষ্পন্ন। "লোক্যতে ইতি লোকঃ"। যাহা দর্শন করা যায়—জানা যায়, তাহাই লোক। অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাবে নাম ও রূপের সাহায্যে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাকে লোক বলে। এককথায় গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের সাধারণ নাম লোক। সমুদ্র—গুণত্রয়ের সংযোগবৈচিত্র জন্য সপ্তবিধ ভেদ। ইহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বসুধা—পার্থিব দেহ। বসুকে ধারণ করে, অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানরত্নের আকর বলিয়াই ইহাকে বসুধা বলা হয়। মহীধর—ঘনীভূত জড়ত্ববোধ। মহী জড়ত্বের চরম পরিণতি, যে বোধ তাহাকে ধারণ করে—অর্থাৎ যে চৈতন্য জড়াকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে মহীধর কহে। এই সকলই ক্ষুব্ধ, প্রকম্পিত ও প্রচলিত হইয়া উঠে। এ ক্ষুদ্রতা, এ জড়তা, এ মায়া-কল্পিত ইন্দ্রজাল বুঝি আর থাকেনা! সচ্চিদানন্দময়ীর ঘোরনাদ উঠিয়াছে, সে নাদ বুঝি সর্ব্বভাবকে—বহুত্বকে দলিত মথিত করিয়া পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্য-রাজ্যে মিলাইয়া দিবে! বুঝি বা জড়ত্বের অধিকার বিলুপ্ত হয়! তাই ইহাদের ক্ষুব্ধভাব বা কম্পন। যে নাদ মহাশক্তিরূপিণী মাতৃকণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া সপ্তলোক ভেদ করিয়া উত্থিত হয়; সে নাদের কি অপূর্ব্ব প্রভাব!

সাধক! কখনও মাতৃ-আহ্বান—মায়ের সে ঘোর আকর্ষণ-ময়

কণ্ঠস্বর শুনিয়াছ কি? যতদিন মাতৃ-অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসবান্ না হইবে, যতদিন মাতৃ-চরণে পূর্ণভাবে তোমার নিজত্বটী অর্পণ না করিবে, ততদিন সে আহ্বান শুনিতে পাইবে কি? অথবা পাইলেও উহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে কি? সেই চিদানন্দ ক্ষেত্রের অপূর্ব্ব আহ্বান—অনির্ব্বচনীয় নাদ—যদিও ঘোর, যদিও মহান্, যদিও অমেয় তথাপি বড় মধুর! বড় প্রাণ-মাতান সে ধ্বনি! চণ্ডীর চণ্ডস্বরের অভয়বাণী! সে যথার্থই অতুলনীয়। মা! তুইত দিবানিশি অশ্রান্ত অনাহত নাদে আমাদেরই হৃদয় মধ্য হইতে ডাকিতেছিস্। আমরা যে তোর আহ্বান শুনিয়াও শুনি না। জগতের কোলাহল, ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-সন্ধানে ছুটাছুটির গোলমালে, তোর সে ডাক আমাদের কানে পৌঁছায় না। তাইত মা ঘরের ছেলে ঘরে যাই না, বাহিরে প্রচণ্ড রৌদ্রে—শোক দুঃখের প্রবল দাবানলে পুড়িয়াও মোহের খেলনা নিয়ে মত্ত আছি। কত রক্তচক্ষু ক'রে, কত ক্রোধের ভান ক'রে আমাদিগকে ডাক্‌ছিস্, কিন্তু আমাদের এই দুর্ব্বার মোহ কিছুতেই ভাঙ্গে না।

কেন মা আমরা তোর ডাক শুনিনা? আমাদের শোনবার মত কেন ডাক না? যেমন করিয়া ডাকিলে আমাদের বধির. কর্ণেও পৌঁছায়, তেমনি করিয়া ডাক মা! শুনিয়াছি—তোর আহ্বান যে শুনিতে পায়, সে নাকি কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসে। আমাদের কানে একবার সেইরূপ ধ্বনি শুনাও মা! যে নাদে বৃন্দাবনে গোপীগণ লাজ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিত, যে নাদে পশুপক্ষী ব্যাকুল হইত, যে নাদে যমুনা উজান বহিত, সেই নাদ মা, সেই নাদ, সেই সপ্তরন্ধ্র বিশিষ্ট মোহন বংশীনাদ; একবার—একবারমাত্র আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দে! আমরাও এই বিষয়রূপ কুল ছাড়িয়া অকুলে—শ্যামকলঙ্ক সাগরে ভাসি। আমরাও মাতৃহারা বৎসের মত মা মা বলিয়া ছুটি।

মায়ের সে নাদ ও এ নাদে বিভিন্নতা আছে। সে আকর্ষণময় মধুর বংশীনাদ, আর এ উৎপীড়িত সন্তানের অসুরভীতি-নিবারক ঘোরনাদ। নাদ একই, কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। যাহা পুত্রের নিকট মোহন আকর্ষণমন্ত্র, তাহাই পুত্রের বৈরি-সংহারে

ঘোর অভিচার-মন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয়। মা চণ্ডমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। অসুরকুলের ক্ষয়উদ্দেশ্যে বিরাট ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে সমগ্র বিশ্বশক্তি-সমবায়ে মাতৃদেহ বিভূষিত। যদিও পুত্রের দৃষ্টিতে এ মূর্ত্তি অভয়া—আনন্দদায়িনী, তথাপি শত্রুর চক্ষুতে ইহা অতীব ভীষণা—ভীতি-দায়িনী। তাই এস্থলে মাতৃ-হুঙ্কার ঘোর—সুমহান্। ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইবে।

সাধক! তুমিও যখন মা বলিয়া সিংহনাদ ছাড়িবে, সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সত্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, যখন সত্যনাদ তুলিবে—তখন যেন সে নাদে সমস্ত ব্যোমমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠে, তোমার জড়দেহ যেন সত্যনাদে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রতি পরমাণু যেন সত্যের সম্বেদনে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। সত্যকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া "জয় সত্য—জয় মা" বলিয়া এমনই উচ্চধ্বনি করিবে, যেন সমগ্র বিশ্ব—স্থাবর জঙ্গম, তোমার সে নাদে কম্পিত হইয়া উঠে; এ জগৎ যেন জড়ত্ব ছাড়িয়া প্রাণময় ভাব ধারণ করে। এমনই ভাবে মা মা বলিয়া ডাকিবে, যেন সে ডাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মর্ম্মে ভীতির সঞ্চার হয়। ঠিক এমনি অসুরকুলের প্রাণে ভীতি উৎপাদন করিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত সাহসী পুত্রের মত, একবার মা বলিয়া ডাক দেখি! ওরে, একদিন সমগ্র বিশ্বমানবমণ্ডলী সমবেত কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিবে, সে ঘনীভূত ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্র করিয়া দিবে! আর আমি—আমি দূরে দাঁড়াইয়া, সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইব। আসিবে সে দিন—আসিবে।

সে যাহা হউক, এস্থলে নাদতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। নাদই ব্রহ্ম। নাদতত্ত্বে অবগাহন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মদর্শন বা মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? প্রথমতঃ স্মরণ কর—এ জগৎ ব্রহ্মের কল্পনা মাত্র। শ্রুতিও বলেন—"যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। কল্পনা—মনের ধর্ম্ম। "সঙ্কল্পঃ কর্ম্ম মানসম্"। সঙ্কল্প বা কল্পনাই মানসকর্ম্ম। মনে যাহা কল্পিত হয়,

তাহা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র। শব্দশূন্য কল্পনা হয় না। যদি জগতে শব্দ না থাকিত, তবে কল্পনা বলিয়া কিছু থাকিত না। মনে মনে কতকগুলি শব্দের অনুচিন্তন করাই কল্পনা। সুতরাং "ব্রহ্ম কল্পনা করিলেন" বলিলে, বুঝিতে হয়—কতকগুলি শব্দ করিলেন। যেমন—সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ লতা মনুষ্য পশু জগৎ ইত্যাদি। এইরূপ শব্দময় মানস কল্পনাগুলিই এই পদৃশ্যমান জগৎ। সুতরাং এ জগৎ—শব্দময়।

আবার অন্যদিক দিয়াও ইহা বুঝিতে পারা যায়—জাগতিক বস্তুনিচয়ের সাধারণ নাম পদার্থ। ব্যাকরণশাস্ত্রে সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দকে পদ কহে। পদের যাহা অর্থ, তাহাই পদার্থ। পদ—কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি। উহাও শব্দ মাত্র। প্রত্যেক পদের বা শব্দের এক একটি অর্থ আছে। ঐ অর্থ ঐশ্বরিক সঙ্কেত- বিশেষ—"এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থ প্রতীতি হইবে" এইরূপ একটা অনাদিসিদ্ধ সঙ্কেত আছে। "বৃক্ষ" একটি শব্দ। উহা কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। মনে বা মুখে উহা ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ব্যাকরণ মতে যাহা শব্দ, তাহা শুধু বর্ণ সমষ্টি নহে—ধ্বনিস্বরূপ। যাহা হউক "বৃক্ষ" এই পদের অর্থ বা অনাদিসিদ্ধ একটি সঙ্কেত আছে। শাখাপল্লবাদি বিশিষ্ট একটা বস্তুই ঐ সঙ্কেত। কারণ, বৃক্ষ শব্দ উচ্চারণ মাত্র ঐরূপ একটা বস্তুকে প্রতীতি করাইয়া দেয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া একটু ধীরভাবে তৎকালীন মানস ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পদার্থগুলি একটী শব্দময় ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রুতিও বলেন "বাচারম্ভনং নামধেয়ং বিকারঃ"। পদার্থরূপে যাহা কিছু প্রতীত হয়, উহা বাক্য অর্থাৎ শব্দদ্বারাই গঠিত। সুতরাং এ জগৎ যে কতকগুলি শব্দসমষ্টিমাত্র, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেদান্তমতে জগৎ নামরূপ মাত্র। নাম—বস্তুতঃ শব্দ বা নাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এই নাদ দ্বিবিধ। ধ্বন্যাত্মক ও শব্দাত্মক। শঙ্খ মৃদঙ্গাদি হইতে

যে নাদ উত্থিত হয়, তাহা ধ্বন্যাত্মক। উহাতেও জীবের হর্ষ বিষাদ ক্রোধ প্রভৃতির উদ্দীপনা হয়; ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় শঙ্খনাদ, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। যখন্ জড়যন্ত্রাদি হইতে নির্গত নাদের এত ক্ষমতা, তখন চেতন যন্ত্র অর্থাৎ জীবকণ্ঠ হইতে নির্গত শব্দময় নাদ যে, জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি কার্য্যে সমর্থ হইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দুর্য্যোধন বলিল—"সূচ্যগ্র ভূমি দিব না", এই একটি শব্দে ভারতীয় সমুদয় রাজন্যবৃন্দ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অসংখ্য আছে। পক্ষান্তরে আবার একটি শব্দই, শুধু উচ্চারণগত পার্থক্যে অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের তারতম্যে শ্রোতার মনে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক করে। সহধর্ম্মিণীর সহোদরকে ব্যঙ্গকণ্ঠে "শ্যালা" বলিলে, তাহার ওষ্ঠাধরে মধুর হাসি প্রকাশ পায়। আবার উহাকেই ঐ শব্দটি কর্কশকণ্ঠে প্রয়োগ করিলে, সেও কঠোরস্বরে ঐ শব্দটি সুদের সহিত প্রয়োগকর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেয়। ইহাই জগতের নিয়ম। শুধু কতকগুলি শব্দদ্বারা এই জগৎ রচিত, কতকগুলি শব্দদ্বারা পরিচালিত এবং কতকগুলি শব্দদ্বারা ইহার প্রলয় হইতেছে। এ জগৎ কতকগুলি শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রত্যেক পরমাণুরই একটা স্বাভাবিক শব্দ আছে। এই স্বাভাবিক শব্দ হইতেই আণবিক স্পন্দন নির্ব্বাহিত হয়। স্পন্দনের সংযোগ বিয়োগের বৈচিত্র্যবশতঃ, এই বিচিত্র জগৎ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ স্বাভাবিক শব্দটি আমাদের 'অ'কার বর্ণের ন্যায়। কতকগুলি 'অ'কার একসুরে একতানে দীর্ঘপ্লুতভাবে উচ্চারিত হইলে যেরূপ হয়, এই জগতের মূল বা স্বাভাবিক নাদ সেইরূপ। উহাই আদিম শব্দ। ভগবান্‌ও বলিয়াছিলেন—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি 'অ'কার। ব্রহ্ম যখন জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ক কল্পনা হয়, তখন ঐ 'অ'কারটি বিশেষ ভাবে স্পন্দিত বা গতিপ্রাপ্ত হয়, তখন উহা দীর্ঘপ্লুত 'উ'কার বর্ণের ন্যায় ধ্বনিত হইতে থাকে।

সৃষ্টি কল্পনা যখন পরিসমাপ্ত হয়, তখন তজ্জন্য গতি বা স্পন্দনও স্তব্ধ হইয়া যয়ে, সেই সময় উহা "ম্ ম্ ম্" ইত্যাকার শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই "অউম্" বা "ওঁ" সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম নাদ। সাধকগণ কর্ণবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অথবা অন্য প্রক্রিয়াদ্বারা এই নাদ, অনাহত কেন্দ্র হইতে শুনিতে পান। জগদব্যাপী সে নাদ আকর্ষণময়। সেই প্রাণমাতান "অউম্" অউম্" শব্দে মনে হয়, যেন—"আয় মা আয় মা" বলিয়া মা আমায় প্রবল স্নেহের তাড়নায় ডাকিতেছেন! সে যে কি অপূর্ব্ব স্বর, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। সত্যই বলিতে হয়—"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ"। সে যাহা হউক, যেরূপ কোন স্বরযন্ত্রের যে মৌলিক স্বর আছে, বাদকের অঙ্গুলি চালনার বৈচিত্রবশতঃ উহা হইতে নানারূপ স্বর প্রকাশ পায়; সেইরূপ এই মৌলিক প্রণব নাদ, গুণত্রয় রূপ অঙ্গুলি ত্রয়ের সংযোগ বিয়োগের তারতম্যবশতঃ, এই বিভিন্ন নাদময় বিচিত্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি—শক্তির স্পন্দনই এই জগৎ। অখণ্ড জ্ঞান-বক্ষে যে মহতীশক্তি বিরাজিতা, তাঁহারই বিভিন্ন স্পন্দন—রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হয়। স্পন্দন—শব্দমূলক। অর্থাৎ নাদ হইতেই স্পন্দন প্রকাশ পায়। ইহা প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের হস্তপদাদি অবয়বস্থ মাংসপেশীগুলির যে সংকোচ-প্রসাররূপ স্পন্দন হয়, উহাও কতকগুলি শব্দকে আশ্রয় করিয়াই নিষ্পন্ন হয়। কাম ক্রোধাদি বৃত্তির উদয়ে, বিভিন্ন অবয়বস্থ মাংসপেশীগুলি কিরূপ অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। ঐরূপ স্পন্দনের হেতু—ঐ জাতীয় বৃত্তির উত্তেজনামূলক নাদ বা শব্দ মাত্র। মনে বা মুখে যখন কাম ক্রোধাদি বিষয়ক শব্দ সকল উচ্চারিত হইতে থাকে, তখনই বিভিন্ন অবয়বে ঐরূপ বাহ্যিক স্পন্দন প্রকাশ পায়। এইরূপ ভগবদ্ভাবের উদ্দীপক শব্দগুলিও অনেক সময় সাধকের অঙ্গবিক্ষেপের হেতু হয়। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে। যাহা হউক, আমাদের

চিন্তারঙ্গ বা ভাবগুলি যে নাদময়, এবং ঐ নাদই যে মহতী শক্তির বিভিন্ন স্পন্দনরূপে প্রকাশ পায়, ইহা অবিসংবাদি-সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বকালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই নাদ ও স্পন্দনতত্ত্বে এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, মাত্র শব্দের সাহায্যে বিভিন্ন শক্তির স্ফুরণ করিয়া, অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি, এই নাদ ও স্পন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার। ঐ সকল মন্ত্রের সাহায্যে এখন—এই অবিশ্বাসী সত্যজ্ঞানহীন যুগেও অনেক অলৌকিক প্রত্যক্ষফল লাভ হইয়া থাকে। এখনও এ দেশের নিরক্ষর রোজাগণ, শুধু মন্ত্র পাঠ করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকে। হাতচালা, বাটীচালা, নলচালা প্রভৃতি বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া লোককে বিস্মিত করিয়া থাকে।

অল্পদিন হইল—আমাদের পল্লীতে জনৈক পশ্চিম দেশীয় ভৃত্যের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। অন্ততঃ ডাক্তারগণ তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া মৃত বলিয়াই স্থির করেন। অনন্তর তাহার আত্মীয়গণ সন্ধ্যার পর শবদাহ করিবার জন্য শ্মশানঘাটে যাইতেছিল; পথিমধ্যে মৃতব্যক্তির পরিচিত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুটী উহার সর্পাঘাতে মৃত্যুর বিবরণ জানিতে পারিয়া, উহাকে দাহ করিতে নিষেধ করে। পরে স্বয়ং শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়া মৃতের পদাঙ্গুলিতে দড়ি বাঁধিয়া কি কতকগুলি মন্ত্র পড়িয়া দড়ি টানিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মাথায় চপেটাঘাত করিতে লাগিল। এরূপ তিনঘণ্টাব্যাপী কঠোর যত্নের ফলে মৃতদেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সমুদয় রাত্রি ঐরূপ মন্ত্রপাঠ ও চেষ্টার ফলে, সে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঐ ভৃত্যটী যেদিন স্বয়ং আমাদের নিকট ঐ কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, সেদিনও তাহার পায়ের ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই।

গ্রন্থকারও কোনরূপ যোগশক্তি প্রয়োগ না করিয়া, শুধু মন্ত্রশক্তি প্রভাবে কুক্কুরদষ্ট বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন কামলা প্রভৃতি কতকগুলি রোগও এইরূপ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আরোগ্য

করা যায়। সে যাহা হউক, এই মন্ত্রই—নাদ। ঐ নাদের সহিত রোগাদি আরোগ্যকারিণী বিভিন্ন শক্তির যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, ইহা যাঁহারা প্রথম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ধন্য তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন! ধন্য তাঁহাদের দয়া। মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি ষট্ কর্ম্ম, অভীষ্টমূর্ত্তি দর্শন ইত্যাদি ব্যাপার, শুধু মন্ত্রশক্তি প্রভাবেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। নাদের যে এরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে, ইহা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু যথার্থ নাদতত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক উহার শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ লোক নিতান্ত দুর্ল্লভ।

যাহা হউক, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যে রূপ স্থূলজগৎ প্রকাশ পায়, সেইরূপ অব্যক্ত নাদ হইতেই স্থূল বা ব্যক্তনাদ প্রকাশ পায়। গুণ-ত্রয়ের সাম্যবস্থা প্রকৃতি। সে অবস্থায়ও নাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা গুণক্ষোভ অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরস্পর অভিভবরূপ স্পন্দন হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—যেখানে স্পন্দন বা শক্তি বিদ্যমান, সেইখানেই নাদের সত্বা আছে। তবে এ নাদ অতীন্দ্রিয়, তাই ইহাকে শাস্ত্রকারগণ "পরা" আখ্যা দিয়াছেন। প্রকৃতির যেরূপ "পরা" নাম আছে, ব্রহ্মকে যেরূপ "পর" বলা হয়, সেইরূপ এই অব্যক্ত নাদকেও পরাবাক্ কহে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা স্পন্দন—মহতত্ত্ব! ইহা যাবতীয় বৈষয়িক প্রকাশের ক্ষেত্র; এইখানে যে নাদ আছে, তাহার নাম পশ্যন্তী। মাত্র যোগিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা মহৎতত্ত্বে আত্মবোধ লইয়া যাইতে পারেন, তাঁহারই এই নাদের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়াই ইহাকে পশ্যন্তী বলে। তারপর মধ্যমা, ইহা মনোময় ক্ষেত্রে উপলব্ধি হয়। একটু স্থির হইয়া, স্বকীয় সঙ্কল্প বিকল্প প্রভৃতি ভাবগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে, মানুষ মাত্রেই ঐ নাদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহা ধ্বনি-হীন অথচ শব্দ। অনন্তর ভাবগুলি একটু ঘনীভূত হইলেই, কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে এক একটা স্পন্দন প্রকাশ পায়। তাহারই ফলে ব্যক্ত বা স্থূল নাদ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রকারগণ উহাকে

বৈখরী বলেন। ইহা সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। প্রাচীন আচার্য্যগণ "নাদ" শব্দটির ব্যবহার না করিয়া "বাক্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্ ও নাদ অভিন্ন। এস্থলে বাক্ শব্দটী ইন্দ্রিয় অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাক্—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তাই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারিটী সংজ্ঞাই স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। বৈখরীবাকের আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে তিন প্রকার ভেদ আছে। সে সকল আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

আর্য্যশাস্ত্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, বাক্ ও নাদ প্রকাশক বর্ণমালার নাম অক্ষর। গীতায় উক্ত হইয়াছে "অক্ষরং পরম্ ব্রহ্মং"। অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝা যায়। যে অক্ষর শব্দটী পরব্রহ্মের বাচক, তাহাই এ দেশের বর্ণমালার বাচক শব্দ। ইহা অপেক্ষা উচ্চ বিজ্ঞান নাদতত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশে কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। আরও একটী জ্ঞাতব্য কথা আছে—'অ'কার হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত স্বর ব্যঞ্জন মিলিত পঞ্চাশটী বর্ণমালার নাম "মাতৃকা"। সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ঙ্করী মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার বর্ণময়ী নাদময়ী হইয়া, নিত্য সুপ্রকাশ রহিয়াছেন। মাতৃকাধ্যানে আছে—"পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্"। পঞ্চাশটী বর্ণ-দ্বারাই মায়ের আমার মুখ হস্ত পদ মধ্যদেশ বক্ষস্থল প্রভৃতি অবয়ব গঠিত। সাধক! তোমরা কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও! দেখ—তোমার কণ্ঠনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দরূপেই মা, এই জগৎময় যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, ঐ উহাই মা। তুমি যে ইষ্টমন্ত্র জপ কর—ঐ মন্ত্রই ত মা! মনে মনে যে অপ্রকাশিত বাক্ উচ্চারণ কর বা চিন্তা কর—ঐ ত মা। তুমি মা বলিয়া ডাকিলে, ঐ "মা" শব্দটীই যে মা! ওগো নাম ও নামী যে অভেদ! তোমারা মাকে দেখিতে চাও না বলিয়াই দেখিতে পাও না, মা ত আমার সর্ব্বত্র নাদরূপে সুপ্রকাশরূপা! শুধু ইচ্ছার অভাব বলিয়া মাকে পাও না। কিন্তু সে অন্য কথা।

প্রত্যেক জীবদেহে—প্রত্যেক পদার্থই ঐ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী

মাতৃকাদ্বারা বিরচিত। তান্ত্রিক ন্যাসগুলিও (মাতৃকান্যাস, বর্ণন্যাস, ষোঢ়ান্যাস ইত্যাদি) এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই "অং নমো ললাটে, আং নমঃ শিরসি, ইং নমো দক্ষিণচক্ষুষি, ঈং নমো বামচক্ষুষি" ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ঐ সকল স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ন্যাস সমাপ্ত করেন। কিন্তু হায়! উহাতে কি ন্যাসের যাহা যথার্থ ফল, তাহা লাভ হয়? যে উদ্দেশ্যে ঐ সকল বিধান, তাহার দিকে লক্ষ্যহীনতাবশতঃ ঐরূপ অনুষ্ঠান—অঙ্গসঞ্চালনাদিরূপ একটা কসরৎ মাত্রে পর্য্যবসতি হইয়াছে। এস্থলে একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি—যদি একজন লোকও অগ্রসর হয়, তথাপি উদ্দেশ্য সফল হইবে। ললাটাদি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বোধশক্তি অর্থাৎ অনুভূতি লইয়া যাইতে হয়, এবং যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ স্পন্দন অনুভূত হয়, ততক্ষণ ঐ অং ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে (বাক্‌যন্ত্র যাহাতে বেশী কম্পিত না হয়) উচ্চারণ করিতে হয়। মানস উচ্চারণই শ্রেষ্ঠ। প্রথম অভ্যাস করিবার সময় ইহাতে একটু অসুবিধা ও কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিছুদিন পরে ঐ কষ্ট আর থাকে না; তখন ইচ্ছামাত্রে অনুভূতি পরিচালনা করিবার সামর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বীজ উচ্চারণ করিতে থাকিলে অনুভূতি স্পন্দন এবং বীজ যেন এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে হইতে থাকে। এইরূপে মন্ত্র, স্পন্দন এবং অনুভূতি তিনই যখন এক সুরে বাজিয়া উঠে অর্থাৎ যুগপৎ অভিন্নরূপে বোধ হইতে থাকে, তখনই বুঝিবে—ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ চৈতন্যময় ন্যাস করিবার সময়ই, একটা অভূতপূর্ব্ব সুখময় অনুভূতি হইতে থাকে। ইহার আরও বিশেষ ফল আছে—আমি যে দেহবিশিষ্ট একটা জড়পদার্থ মাত্র, এ বোধ তিরোহিত হয়—দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল হয়। শারীরিক ব্যাধি নাশ করিবার পক্ষেও ইহা অব্যর্থ উপায়। এতদ্‌ভিন্ন যথাযথ ন্যাসপুটিত সাধকের অনেক অলৌকিক শক্তিও লাভ হয়।

———

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। দেবতাবৃন্দ আনন্দে সেই সিংহবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া জয়ধ্বনি, এবং মুনিগণ ভক্তিবিনম্র অন্তকরণে বিনত শরীরে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এতদিনে দেবগণের আশা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ব্যষ্টি শক্তিসমূহ মহতী শক্তি হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন বোধ করিয়াছিল; তাই অসুর-অত্যাচারের নিবারণকল্পে, বহু যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে ভাব দূরীভূত হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ মহতী শক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই দেবগণের আনন্দ— তাই জয়ধ্বনি। খুলিয়া বলি—মহৎতত্ত্বে বা বিজ্ঞানময়কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, অস্মিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই অবস্থায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বা বিভিন্ন বৈষয়িক প্রকাশকে আর পৃথক্ সত্তা বলিয়া মনে হয় না। সকলই একমাত্র অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যুহরূপে প্রতীত হইতে থাকে। তখন দেবতাগণের— ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চেতনবর্গের আর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব থাকে না। এক মহৎ কর্ত্তৃত্বে, সকলের কর্তৃত্ব পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। মহতী শক্তিরূপিণী মাও, তখন সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হন! জীবত্ব-হননেচ্ছু সাধকই সিংহ। সাধক তখন যথার্থই স্বকীয় জীবভাবকে হিংসা করিতে আরম্ভ করে। তাই সাধারণ লোক তাহাকে নরশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে। তখন তাহার দেহটি মাতৃ-শক্তির পরিচালক যন্ত্র বা বাহনরূপে পরিণত হয়। কি অভূতপূর্ব্ব সংযোগ। এ অবস্থায় মায়ের ঘোরনাদ—অত্যুচ্চ অভয়বাণী একদিকে যেমন অসুরকুলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, অন্য দিকে তেমনি দেবতাগণের হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া দেয়। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবতাগণ আনন্দে "জয় মা, জয় মা" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল

মুখরিত করিতে লাগিল। আবার মুনিগণ—যাহারা এতদিন মৌনভাবাপন্ন ছিল, সেই সাত্ত্বিক প্রকাশসমূহ, উপযুক্ত অবসরে মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া মায়ের স্তুতি-মঙ্গল গান করিতে লাগিল। ভক্তিভরে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে, করিতে তাহাদের দেহ মন মাতৃ-চরণে সম্যক্ অবনত হইয়া পড়িল।

সাধক! তুমিও যখন অন্তরে অন্তরে মাতৃ-আবির্ভাব উপলব্ধি করিবে, তখন পূর্ণ বিশ্বাসে পূর্ণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিও। যে মুহূর্ত্তে দেখিবে—একটু সত্যের আভাস পাইয়াছ, বিন্দুমাত্র মাতৃ-করুণার প্রমাণ পাইতেছ, সেই মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের সর্ব্ববিধ অবিশ্বাস সন্দেহ দুর্ব্বলতাকে তাড়াইবার জন্য, আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিবে এবং ভক্তি-বিনম্র অন্তঃকরণে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকিবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই দেখিতে পাইবে—দিন দিন তোমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইয়া উঠিতেছে। হৃদয়খানা মাতৃ-সিংহাসন-রূপে পরিণত হইয়াছে। চিত্ত-শুদ্ধির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায়, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। উপনিষদ্ যুগের ঋষিগণ এই উপায়েই চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিতেন।

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ॥ ৩৪॥

অনুবাদ। সমস্ত ত্রিলোককে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া, অমরারিগণ অগণিত সুসজ্জিত সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ উদ্যত-অস্ত্রে সমুত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা। মহর্ষি মেধস দেবপক্ষের আয়োজন বর্ণনা করিয়া, রাজা সুরথকে একবার অসুরকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। দেখ সাধক! মায়ের ঘোর নাদ, দেবতাবৃন্দের জয়নাদ এবং মুনিগণের স্তোত্রনাদ একীভূত হইয়া, সমগ্র ত্রিলোক কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক—মূলাধারাদি চক্রত্রয়,

সে নাদে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ঐ তিন কেন্দ্রই অসুরভাব সমূহের বিকাশস্থান! অমরারিগণ—অমরত্বের বিরোধিদল, অর্থাৎ যাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হেতু, তাহারও এই উদ্যমের প্রতিকূলে সজ্জীভূত হইয়া, স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অসুরগণ ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ দেবশক্তি মথিত করিয়াছে। তাই এবারও পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ জয়লাভের আশায়ই তাহাদের এই সমুত্থান। কিন্তু হায়! অসুরকুল জানে না যে, এবার দেবতাগণ নহে—স্বয়ং মা আমার সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা।

আঃকিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ॥ ৩৫॥

অনুবাদ। আঃ একি! ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া, মহিষাসুর অগণিত অসুর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ্যে অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এতদিনে সন্তানের আনন্দধ্বনি-মিশ্রিত মাতৃ-হুঙ্কার মহিষাসুরের প্রাণে ভীতি এবং উদ্বেগ আনয়ন করিয়াছে। আঃ শব্দটী কোপ ও পীড়ার ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার সমূহের মূলীভূত রজোগুণের মর্ম্মস্থল পীড়িত করিয়া, মাতৃনাদ উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—গুণত্রয় পরস্পর অভিভাব্য অভি-ভাবক ধর্ম্মবিশিষ্ট; সত্ত্বগুণ প্রকট হইলেই অপর গুণের অভিভব হয়। আবার অপরগুণও অভিভূত হইবার উপক্রম হইলেই সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এস্থলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। সত্ত্বগুণের প্রকট ভাব লক্ষ্য করিয়াই আজ রজোগুণও সত্ত্বপ্রকাশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ ত্রিলোক-সংক্ষুব্ধকারী জয়ধ্বনি শুনিতে পাইয়া মহিষাসুর সহকারিবৃন্দের সহিত "কোথা হইতে এই নাদ আসিতেছে" তাহার সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। সহকারি-অসুরবৃন্দের নাম পরে

পাওয়া যাইবে। সাধক! তুমিও দেখ—যখনই তুমি মন্ত্রজপ স্তোত্রপাঠ কিংবা-মাতৃ মহত্ত্ব-কীর্ত্তন প্রভৃতি কোনরূপ সাধনা করিতে থাক, তখনই সঞ্চিত বৈষয়িক সংস্কারগুলি অলক্ষিতভাবে তোমার সেই সাধনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়।

———

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥ ৩৬॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশোভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥ ৩৭॥

অনুবাদ। অনন্তর সে (মহিষাসুর) দেখিতে পাইল—এক দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা। তাঁহার কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে পদভরে পৃথিবী অবনমিত হইয়াছে, কিরীট আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ধনুর জ্যাধ্বনিতে সমগ্র পাতাল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং সহস্র ভুজ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যপ্ত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে মহিষাসুর যতবার দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, ততবারই দেখিতে পাইত—এক একটী ব্যষ্টিশক্তি আপন কর্ত্তৃত্ব লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবারই তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এবার এ কি দেখিল! দেখিল—এক দেবীমূর্ত্তি। দেবী—দ্যোতনশীল। স্বপ্রকাশরূপিণী মহতী চিৎশক্তি। তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্রই বুঝিতে পারিল—এ যে "ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা"। তাঁহার প্রকাশে ত্রিলোক প্রকাশিত। স্বয়ং মহিষাসুরও তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। এমনই দেবীর কান্তি—এমনই সে প্রাকাশশক্তি। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। কেবল সর্ব্বলোক প্রকাশক কান্তি নহে—তাঁহার চরণ স্পর্শে ভূতল অবনত

হইয়াছে। ভূতল—জড়ত্ব। চিন্ময়ীর পাদাক্রমণে—গতিশক্তি-প্রভাবে সর্ব্বত্রগামিনী অচিন্তনীয়া শক্তির প্রভাবে ক্ষিতিতত্ত্ব বা জড়ত্ব অবনত অর্থাৎ অপ্রকাশপ্রায় হইয়াছে। চৈতন্যময়ী মাতৃ-শক্তির প্রকাশে জড় বলিয়া আর কিছুই প্রতীতি হয় না। তাই মা আমার "পাদাক্রান্ত্যা নতভুবম্"। প্রকাশ জিনিষটা গতিবিশিষ্ট বলিয়াই, গমনার্থক পাদ শব্দের প্রয়োগ। আবার পাদ শব্দের অর্থ কিরণও হয়। চিন্ময়ী মায়ের সর্ব্বতোভেদী প্রকাশসত্তার উদয়ে, ভূ অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব বা জড়বস্তু সমূহের সত্তা বিলুপ্তপ্রায় হয়। এই বিলুপ্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই "নতভুবম্" বলা হইয়াছে। তারপর কিরীট-মস্তকভূষণ—বিশুদ্ধবোধ। উহা অম্বর স্পর্শ করিয়াছে। বোধবস্তু আকাশবৎ—নির্লিপ্ত ও সর্ব্বব্যাপী। তবে আকাশ—জড়, কিন্তু বোধ—চৈতন্য-স্বরূপ। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মব্যোম্নোর্ন ভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্"।

মায়ের ধনুর জ্যাধ্বনিতে অশেষ পাতাল বিক্ষোভিত। ধনুর জ্যাধ্বনি—প্রণবধ্বনি। শ্রুতি বলেন "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। প্রণবধ্বনিতে সপ্ত অজ্ঞান ভূমিকা বিক্ষোভিত হইয়াছে। পাতাল সাতটি, তাই মন্ত্রে অশেষ পাতাল বলা হইয়াছে। বদ্ধ, বদ্ধতর, বদ্ধতম, মূঢ়, মূঢ়তর, মূঢ়তম এবং জড় এই সপ্ত অজ্ঞানভূমিকাই, যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল ও মহাতল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চৈতন্যময়ী মায়ের আবির্ভাবে, চৈতন্যময় প্রণবাদি মন্ত্রের ধ্বনিতে যাবতীয় অজ্ঞানভূমিকা—অসুরনিবাস বা নাগলোকসমূহ প্রকম্পিত হইয়া উঠে। যেরূপ সপ্ত অজ্ঞানভূমিকা সপ্ত পাতাল নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ সপ্ত জ্ঞানভূমিকাই সপ্তস্বর্গ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে সপ্তস্বর্গের বিবরণ বলিয়া রাখিতেছি—মুমুক্ষু, মুমুক্ষুতর, মুমুক্ষুতম, ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, এই সপ্তবিধ জ্ঞানভূমিকাই সপ্তস্বর্গ।

মায়ের সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য ভুজে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণতঃ মনে হয়, দিক্‌সমূহ শূন্য বা আকাশ মাত্র; কিন্তু মাতৃ-অবির্ভাবে দিক্ বা দেশ বলিয়া কোন প্রতীতি থাকে না। সকলই মাতৃময় হইয়া পড়ে; সর্ব্বব্যাপী ঘন চৈতন্যসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন আর শূন্য বলিয়া কিছুই থাকে না, সবই পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। এক কথায় মাতৃ-আবির্ভাবে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সাধক যখন মাতৃলাভ করে, অর্থাৎ মাকে দেখে, তখন তাহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়— তাহার চৈতন্য বা আমিত্ব ত্রিলোক পরিব্যপ্ত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, জড়ত্ব তিরোহিত হয়, আকাশের ন্যায় বোধ সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া পড়ে, শব্দহীন প্রণবধ্বনিতে অজ্ঞান, সংশয় ও জড়তা পলায়ন করে, এবং একমাত্র চৈতন্যসত্তাই যে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতোভাবে অবস্থিত, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে।

যতদিন এরূপভাবে মাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ সাধনার আরম্ভই হয় না। এইখানে দাঁড়াইয়া তবে সাধনা, অর্থাৎ ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে আত্মশর নিক্ষেপ করিতে হয়। মা আমার এইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেই অসুর অত্যাচার নিবারণের উপায় হয়।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্।
শস্ত্রাস্ত্রৈ র্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের বহুধা বিমুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের তেজে দিগন্ত দীপ্তিময় হইল।

ব্যাখ্যা। এইবার সুরদ্বিষগণের সহিত মায়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যদি বল—মায়ের অবার যুদ্ধ কি। তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রেই ত

অসুরগণ নিহত হইতে পারে, তবে আবার যুদ্ধের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। মাতা-পুত্রের আনন্দক্রীড়াই এই যুদ্ধ। মাতাপুত্রের রণ অতি বিস্ময়কর—বড় মনোহর! পুত্র বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে চায়, আর মা বলপূর্ব্বক বিষয় ছাড়াইয়া কোলে তুলিয়া নিতে চান। সেই সময়ে মাতাপুত্রের যে লীলাভিনয় হইয়া থাকে, তাহাই বাহিরে যুদ্ধরূপে অভিব্যক্ত হয়। সাধকপুত্রদিগকে এ কথার উত্তর, ইহা অপেক্ষা আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না।

গীতায় দেখিতে পাই—অর্জ্জুন ভগবানকে বলিয়াছিলেন, "তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্," আমি যাহাতে শ্রেয়োলাভ করিতে পারি, সেইরূপ একটি নিশ্চয় করিয়া বল"। সেখানেও "আমি" শ্রেয়োলাভ করিব, এইরূপ ভাব ছিল। তাই মা আমার সারথিরূপে —গুরুরূপে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া, তাহা দ্বারাই ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিধন করাইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীতে দেখিতে পাই—পুত্র মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্নশিশু, কর্ত্তৃত্ববোধ সর্ব্বতোভাবে মাতৃচরণে সমর্পিত। আমি বলিয়া পৃথক একজন নাই, থাকিলেও সে মাতৃ-ক্রীড়নক মাত্র। এখানে সুখ দুঃখে মা, হর্ষ বিষাদে মা, কাম ক্রোধে মা, দয়ায় ক্ষমায় মা, হিংসা দ্বেষে মা, এখানে পুত্র মা ভিন্ন আর কিছুতেই থাকিতে চায় না; সুতরাং অগত্যা মাকেই সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। মা স্বয়ং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পুত্রের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে, অসুরের অত্যাচার নিবারণকল্পে দণ্ডায়মান হন। যদিও মায়ের ইচ্ছামাত্রেই এই অসুর-নিধন ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি মা সন্তানের ইচ্ছার অনুরূপ সংস্কারের সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন।

আরে অসুরকুলও ত মায়ের সন্তান! আমাদের যাহা জীবভাব, তাহাই ত যথার্থ অসুর; আমাদের মুখ হইতে যথার্থ মাতৃ-আহ্বান নির্গত হইবে বলিয়াই ত, মা অসুর-অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। আমরা মা বলিয়া ফেলিয়াছি—শোকে দুঃখে উৎপীড়নে আনন্দে, যে

ভাবেই হউক, সত্যই একবার মা বলিয়া ফেলিয়াছি ; আর কি মা স্থির থাকিতে পারেন! আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইবেন, আমাদের সংস্কারশ্রেণীকে বা অসুরবৃন্দকে একে একে বিনাশ করিবেন ; আর আমরা তাহা দেখিয়া, মহোল্লাসে "জয় মা" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিব। এস মায়ের সন্তানগণ, আমরা কোটি কণ্ঠে একবার সত্যই মা বলিয়া ডাকি।

ওগো! কিরূপে ভাষায় বুঝাইব যে, মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। সাঙ্খ্যের ভাষায় যাহারা ইহাকে প্রকৃতি বল, তাহারা চাহিয়া দেখ—ঐ প্রকৃতিই যতদিন অপবর্গমুখী না হয়, ততদিন মুক্তির আশা নাই। প্রকৃতি যখন বিশেষভাবে পুরুষাভিমুখী গতি লাভ করে, তখনই ভূত ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তত্ত্বগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া প্রলয়াভিমুখী হয় ; ইহাই ভক্তের ভাষায় মাতা-পুত্রের রণক্রীড়া। যাহারা যোগের সাহায্যে বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইতে অভিলাষী, তাহারাও দেখ—কিরূপে অন্তর্মুখী আকর্ষণী মহাশক্তি বহির্মুখ-বৃত্তিনিচয়কে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া প্রলয়াভিমুখী করে। পুত্রের ভাষায় ইহাই মায়ের সমর-লীলা। আবার যাহারা বেদান্তবাদী তাহারা এই জগৎকে অজ্ঞানকল্পিত অধ্যাসমাত্র বল ক্ষতি নাই ; ঐ অজ্ঞান বা মায়া যখন তোমার সমুজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানে বিলীন হইতে থাকে, তখন আকাশাদি ভূতবর্গ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং প্রাণ অপান প্রভৃতি প্রাণবর্গ, ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞায় লীন হইতে থাকে, তখন দেখিতে পাইবে—প্রজ্ঞার স্বপ্রকাশকত্ব, মায়াকল্পিত বৈষয়িক প্রকাশকে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া প্রলয়াভিমুখী করিয়া দেয়, ইহাই চণ্ডীর ভাষায় মাতৃ-সমর। আমরা এখন মায়াকে বা প্রকৃতিকে, মিথ্যা বা জড় বলিতে চাই না ; মায়াই ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মই মায়া। মায়াহীন ব্রহ্ম অথবা প্রকৃতি-সম্বন্ধহীন পুরুষ, সাধ্য-সাধনাদি সর্ব্বভাবের অতীত। যখন অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা লাভ হয়, তখন পর্য্যন্তও ব্রহ্ম মায়াযুক্ত। এই পর্যন্ত হইলেই যে মানুষের জন্ম ও জীবন সার্থক হয়! আর ঐ পর্যন্ত যাইতে পারিলে,

তৎপরবর্ত্তী স্বরূপ অর্থাৎ মায়াহীন ব্রহ্ম বা প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য পুরুষ, স্বতঃই অধিগত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এসকল কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা জানি—মা স্বয়ংই যুদ্ধ করেন। সাধক! তুমি "প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী" মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডে পড়িয়াছ? স্বপ্রকৃতিকে মা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? আত্মপ্রকৃতিকে আদর করিতে—ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতে অভ্যস্ত হইয়াছ? মা বলিলেই তাহাকে মনে পড়ে ত? তাহা হইলেই বুঝিবে, প্রত্যক্ষ করিবে—যথার্থই মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ-রহস্য পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

———

মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গ বলান্বিতঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর এবং চামর, অন্যান্য অসুরগণের সহিত চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুরের দুইজন প্রধান সেনাপতি—চিক্ষুর এবং চামর। দেবীভাগবতে ইহাদের রণবর্ণনা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। চিক্ষুর—বিক্ষেপ শক্তি। বিক্ষেপার্থক চিক্ষ্ ধাতু হইতে চিক্ষুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। চামর—আবরণ শক্তি। ভক্ষণার্থক চম্ ধাতু হইতে চামর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিক্ষেপ ও আবরণ ইহারা একদিকে যেমন ব্রহ্মময়ী মা হইতে সন্তানকে বিচ্যুত করিয়া দেয়, তেমনই অন্যদিকে মাকে আবৃত করিয়া রাখে। মাকে—আত্মাকে—আমাকে কে না দেখে? দিবারাত্রি জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ে জীব কাহাকে দেখে? আত্মাকে—আমাকে—মাকে। কিন্তু কই, দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বোঝে না কেন? ঐ চিক্ষুর ও চামরের অত্যাচার। একদিকে যেমন চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ-শক্তি, মাকে ক্ষণমাত্র দেখিবার সুযোগ দেয় না,

তেমনই অন্যদিকে আবরণ-শক্তি মায়ের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে হয়।

তুমি দেখিলে—একটী বৃক্ষ। বস্তুতঃ বৃক্ষাকারে আকারিত চিৎ বা আত্মা। কিন্তু তুমি আত্মদর্শন না করিয়া, বৃক্ষ এই নাম এবং উহার আকৃতি মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া থাক। যে তোমাকে ঐ যথার্থ আত্মবস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া নামে ও রূপে আকৃষ্ট করে, উহারই নাম চিক্ষুর। আবার ঐ নাম ও রূপ বা বিষয়জ্ঞান যথার্থ চিৎবস্তুকে বা আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে—দেখিতে দেয় না; উহারই নাম চামর। অথবা তুমি বরফ খণ্ড দেখিতেছ। যদিও তুমি উহাকে ঘনীভূত জল বলিয়া জান, তথাপি তোমার জ্ঞানে একখণ্ড সাদা প্রস্তরের ন্যায় একটা বস্তু মাত্র প্রকাশিত হয়। জলীয় পরমাণুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গেলেও, তোমার সে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া যে ঐ বিশিষ্ট রূপের দিকে লইয়া যায়, উহারই নাম মহাসুর চিক্ষুর। উনিই মহিষাসুরের প্রধান সেনাপতি। আর সঙ্গে আছেন—আবরণকর্ত্তা চামর; যিনি নাম ও রূপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া তোমাকে প্রকৃত স্বরূপটী হইতে বঞ্চিত করেন। আরও দেখ—চিনির খেলনা, হাতী ঘোড়া মঠ ইত্যাদি, কত নাম ও রূপ আছে। বস্তুতঃ উহা যে চিনি মাত্র, অন্য কিছুই নহে, ইহা জানিয়াও জানিতে চাও না; শুধু নামে রূপে মুগ্ধ হও, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হইতে বঞ্চিত হও। ইহাই পূর্ব্বোক্ত অসুরের অত্যাচার।

এইবার এই অত্যাচারের পরিমাণ একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তুমি সুরথ, তোমার গুরু লাভ হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি মেধসের বাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিবার ফলে, বেশ বুঝিতে পারিয়াছ—জগৎটা মা বা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু সহস্রবার বুঝিয়া, সহস্র উপদেশ শুনিয়া সহস্রবার মনন করিয়া, অনুভব করিয়াও জগৎ দেখা মাত্রই যে জগৎ জ্ঞান হয়, উহা কাহার অত্যাচার? ঐ চিক্ষুর ও চামরের। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি চিত্ত হইতে বিদূরিত হয় না বলিয়াই, এই জগৎকে আত্মা বলিয়া, মা

বলিয়া, পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছ না। মাত্র যে সময়টা তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া, জোর করিয়া ইহাকে মা বলিয়া ধর, কেবল তখনই উহারা অভিভূত থাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহাদের কার্য্য চলিতে থাকে। এইরূপ একদিন দুইদিন নয়, বহুদিন ব্যাপিয়া এই অসুরের অত্যাচার চলিতেছে। তাই প্রথমেই বলা হইয়াছে —পূর্ণ শত-বৎসর ব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, তথাপি অসুর-বল বিধ্বস্ত হয় নাই। কিন্তু আর ভয় নাই! এবার মা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ। যিনি বিক্ষেপ ও আবরণরূপিণী হইয়া এতদিন প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনিই আজ উহাদিগকে বিলয় করিতে উদ্যতা। সুতরাং আর আশঙ্কা কি।

সাধক! একদিন তুমি আনন্দের মোহে উহাই চাহিয়াছিলে, চক্ষু বাঁধিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিলে তোমার আনন্দ-ক্রীড়ার রস ভোগ হয় না; তাই মা আমার স্নেহের পীড়নে বাধ্য হইয়া আবরণ শক্তিরূপে তোমার চক্ষু বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং বিক্ষেপ শক্তিরূপে বহুত্বের সাধ মিটাইতেছেন। বহুজন্মব্যাপী এই বহুত্বের খেলা করিয়া আজ আবার শিশুর মত বলিয়া উঠিয়াছ—না মা আর বহুত্ব চাহিনা, বহুত্বে আনন্দ নাই। তাই মায়ের কৃপায় মধু ও কৈটভ নিহত হইয়াছে। কিন্তু যে বহুত্ব চাহিয়া আসিয়াছ, যাহার এখনও ভোগ হয় নাই, সেই সঞ্চিত কর্ম্মের মূলীভূত বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তিকে এইবার বিলয় করিবার জন্য মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছ। যাহা তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলে, আজ তাহাকেই আবার বিলয় করিতে বলিতেছ। তাও কি বলিতে পার? একবার বল ত আবার পরমুহূর্ত্তেই উহাদের বিলয় চাও না। তাইত মা এক একবার তোমার মুখের দিকে তাকান—সত্যই কি তুমি চাও—তোমার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি চিরদিনের জন্য বিদূরিত হউক। চক্ষু বাঁধিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি চিরদিনের জন্য থামিয়া যাউক। সত্যই কি তুমি ইহা চাও? না—মিথ্যা কথা; তুমি তাহা চাওনা। তুমি চাও—মা ও জগৎ, উভয়ই থাকুক। তুমি চাও

—"মাকে নিয়া খুব আনন্দে জগদ্ভোগ করিব", তাই ত তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না। কিন্তু যে পুত্র সত্য সত্যই বলে—"মা। আর চাই না জগৎ, আর চাই না রূপ-রসাদি-বিষয়, আর চাই না দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি, চাই—শুধু তোকে। নিত্যা স্থিরা নির্ব্বিকল্পা মা আমার, তোকেই চাই।" যে পুত্র সরল প্রাণে ইহা বলিতে পারে, মাত্র তাহারই জন্য মা স্বয়ং যুদ্ধ করেন। তাহারই জন্য চিক্ষুর ও চামরকে নিহত করেন। তুমিও বল সাধক। তুমি সুরথ হইয়াছ, সমাধি তোমার সঙ্গী। ব্রহ্মর্ষি গুরু তোমার সহায়—আশ্রয়! তুমিও একবার বল—সত্যই জগৎ চাই না, দেখিবে মা তোমার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে চিক্ষুর ও চামরের চতুরঙ্গ বলের উল্লেখ আছে, এইবার আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। হস্তী রথ অশ্ব ও পদাতিক, ইহাই সেনার চারিটী অঙ্গ। বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি হইতেই জীবের ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় সঞ্চিত হইয়া থাকে। হস্তী স্থানীয় ক্লেশ, অশ্ব স্থানীয় কর্ম্ম, পদাতিক স্থানীয় বিপাক ও রথ স্থানীয় আশয়। এই চতুরঙ্গ সেনায় সজ্জিত হইয়াই মহিষাসুরের সেনাপতিদ্বয় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। জীব প্রথম ঐ সেনাপতিদ্বয়ের, অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপের সন্ধানই পায় না। চতুরঙ্গ সেনার অত্যাচার মাত্র বুঝিতে পারে।

প্রথমতঃ ক্লেশ—চিত্তের বৃত্তিমাত্রই ক্লিষ্ট। জগতে যাহা সুখ বলিয়া খ্যাত, বিবেকীর চক্ষুতে তাহাও দুঃখ বা ক্লেশ মাত্র; কারণ পার্থিব সুখ, দুঃখের মুকুট পরিধান করিয়াই আগমন করে। একদিকে যেমন উহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী অন্যদিকে তেমনই ভবিষ্যতে উহার নাশের আশঙ্কা থাকায়, পার্থিব সুখের ভোগকালও দুঃখদায়ক হয়। দ্বিতীয়তঃ কর্ম্ম। ক্লেশের মূলই কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতেই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। কর্ম্মের ত্রিবিধ স্বরূপ পূর্ব্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তৃতীয়তঃ বিপাক। বিপাক শব্দের অর্থ পরিণাম; চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহরূপ কর্ম্ম নিয়তই পরিণামশীল। চতুর্থ—আশয়। ইহাকে

কর্ম্মাশয় বল। কর্ম্মের সঙ্কল্পসমূহ সূক্ষ্মভাবে ইহাতে সঞ্চিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারাই ইহারা পরিচালিত হয়। ইহাই জীবের স্বরূপ। আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা পরিচালিত ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক ও আশয়, ইহাই জীব পদবাচ্য।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—জীব! দেখ, তুমি কে? সর্ব্বপ্রথমেই তুমি নিজের চক্ষু. নিজে বাঁধিয়াছ। আমি কে? তাহা জানি না বলিয়া, একটি অজ্ঞান স্বীকার করিয়া লইয়াছ। ইহাই মূল আবরণ। ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণে অবস্থান করিয়া, প্রতিনিয়ত তুমি রূপ রসাদি বিষয়ে ছুটাছুটি করিতেছ; ইহাই বিক্ষেপ। উহার ফলে তোমার সুখ ও দুঃখ নামক জন্মজন্মান্তর ব্যাপী ক্লেশভোগ হইতেছে। ঐ ক্লেশ হইতে কর্ম্ম বা পুনঃ পুনঃ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ সাধিত হইতেছে। কর্ম্ম সমূহ ক্রমে বিপাক বা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ক্লেশের বীজ প্রস্তুত করিতেছে। বীজসমূহ আবার সূক্ষ্মভাবে কর্ম্মাশয় গঠন করিতেছে। ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখ—ইহাই তোমার জীবত্ব। একবার যদি এই চতুরঙ্গ সেনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক ও আশয় কর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষের বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পার, তবেই তুমি জীবত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। পরমেশ্বরী মা তোমাকে এই জীবত্বরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে চিরমুক্ত করিবেন বলিয়াই চতুরঙ্গবলসমন্বিত চিক্ষুর ও চামরকে নিহত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

রথানামযুতৈঃ ষড়্‌ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত এবং মহাহনু নামক অসুর সহস্র অযুত রথ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে অসুরবল বর্ণিত হইতেছে। চিক্ষুর ও চামর ব্যতীত উদগ্র, মহাহনু প্রভৃতি আরও অনেক মহাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে ইহাদের নাম ও বলের পরিচয় পাওয়া যাইবে। উৎ—ঊর্দ্ধদিকে, অগ্র অর্থাৎ মস্তক যাহার, সেই উদগ্র। অহং-কর্ত্তৃত্ব অভিমানই উদগ্র অসুর। সে কিছুতেই মাথা নীচু করিতে চায় না। একমাত্র মা ব্যতীত আর কেহ যে কর্ত্তা নাই, বা থাকিতে পারে না, ইহা শত সহস্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণে বুঝিতে পারিলেও "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানের উচ্চশির জীব কিছুতেই অবনত করিতে পারে না, বা চায় না। সাধক। এই ভাবটিকেই উদগ্র অসুর বুঝিয়া লইও। আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব আপন কর্ত্তৃত্ব মাতৃ-চরণে অর্পণ করার পর, মা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তবে এখন আবার অহং-কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ উদগ্র অসুর কোথা হইতে আসে? ইহার উত্তর প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি—অনুলোম ও বিলোম ভেদে প্রকৃতির গতি দ্বিবিধ। অনুলোম গতিজন্য জীবভাবীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান বিদ্যমানসত্ত্বেও, অন্তর্মুখী আত্মসমর্পণ ভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ হইলে ত মুক্তিই হইয়া যায়। আর যুদ্ধই থাকে না। যতক্ষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এতক্ষণ বুঝিতে হইবে—সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ বা আত্মজ্ঞান হয় নাই; জীব যখন মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হয়, অথচ তাহা পারিয়া উঠে না, অনাদি কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহাকে বাধা দেয়, তখন অগত্যা মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলে—"আমি ত আর আত্মসমর্পণ করিতে পারিলাম না মা। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণের যোগ্য করিয়া লও।" এই ভাবটি যখন ঠিক

ঠিক আসিতে থাকে, অর্থাৎ কোনরূপ কপটতা থাকে না, যথার্থই সরলপ্রাণে শিশুর মতন আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভের জন্য, মায়ের নিকট আব্দার করিতে থাকে, তখনই মা এই উদগ্র অসুর বধের আয়োজন করিতে থাকেন।

সে যাহা হউক, এই অসুরের শক্তি বড় কম নহে। ছয় অযুত রথ সহ ইহার যুদ্ধ বা প্রতিরোধ ক্রিয়া চলিতে থাকে। ছয় অযুত রথ কি? শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—দেহই রথ। দেহ ছয়টি। অন্নময় প্রাণময় মনোময় জ্ঞানময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়; এই ছয়টি কোষ দ্বারা পরমাত্মা যেন আচ্ছাদিত থাকেন। এই ছয়টী দেহই উদগ্র অসুরের রথ। বেদান্তে অনেক স্থলে পঞ্চকোষের উল্লেখ থাকিলেও জ্ঞানও বিজ্ঞানভেদে বিজ্ঞানময় কোষের দুই প্রকার ভেদ ধরিয়া, ষট্‌কৌষিক দেহের উল্লেখও শাস্ত্রসিদ্ধ। জ্ঞানময় কোষকে বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানময় কোষকে মহদাত্মা বলা যায়।

অন্নাদি খাদ্যদ্রব্যের বিকার হইতে যে কোষ গঠিত বা পরিপুষ্ট হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহ কহে। ইহাই উদগ্রের প্রথম রথ। জীব প্রথমতঃ এই স্থূল দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে। ইহাই জীব কর্ত্তৃত্বাভিমানীর প্রথম আশ্রয়। যত দিন দেহ থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে একটু না একটু অভিমান আছেই। যে মুহূর্ত্তে দেহাভিমান সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই দেহপাত হয়। সমাধির যত উচ্চস্তরেই যাওয়া যাউক না কেন একটু বীজ থাকিয়া যায়, তাই আবার দেহবোধে ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে সাধারণ জীবের দেহাভিমান আর আত্মজ্ঞপুরুষের দেহাভিমানে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা বলাই বাহুল্য। আত্মজ্ঞপুরুষ মৃত্যুভয় হইতে চিরবিমুক্ত, এই একটী লক্ষণ দ্বারাই বলা যাইতে পারে যে তাঁহার দেহাভিমান নাই; সাধারণ জীব কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত সুতরাং দেহাভিমানী। আত্মজ্ঞ পুরুষ যে একটু দেহাভিমান রাখেন, তাহাকে প্রারব্ধ ক্ষয়ই বল, অথবা দয়া পরবশ হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিবার ইচ্ছাই বল, কিংবা কতিপয় প্রিয়তম অন্তরঙ্গকে

বন্ধন বিমুক্ত করিবার ইচ্ছাই বল, কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু সে অন্য কথা।

উদগ্রের আর একখানা রথ প্রাণময় কোষ। যাহাদ্বারা এই স্থূল দেহ ক্রিয়াশীল থাকে, সেই জীবনীশক্তিই প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত। সাধারণভাবে ইহাকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বলা হয়। বস্তুতঃ উহা স্থূল বায়ুমাত্র নহে। জীবনী-শক্তিই যথার্থ প্রাণময় কোষ। এইখানেও জীবের অহংবোধ আবদ্ধ থাকে। তৃতীয়—মনোময় কোষ বা ইন্দ্রিয়সমন্বিত মন। এই স্থানেও আমি মনোময়, ইন্দ্রিয়ময় এইরূপ বোধ থাকে। চতুর্থ—বুদ্ধিময় বা জ্ঞানময়। এই কোষ, সর্ব্ববিধ স্থূল বৈষয়িক প্রাকাশের আশ্রয়। আমি জ্ঞানময়, স্থুল, বিষয় সমূহ আমি জানিতেছি, এ কোষে এইরূপ অভিমান থাকে; তারপর বিজ্ঞানময় কোষ! এই স্থানে সূক্ষ্ম ও স্থুল উভয়বিধ বিষয় সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা পঞ্চম অভিমান-স্থান। সর্ব্বশেষ আনন্দময় কোষ। আমি আনন্দ-স্বরূপ, এইটী ষষ্ঠ অভিমান স্থান। এই ছয়খানি বিশিষ্ট রথ, আবার স্থুল সূক্ষ্ম অসংখ্য নাম রূপাদি বিষয়ভেদে, অসংখ্য ভেদ-বিশিষ্ট হয়। তাই মন্ত্রে অসংখ্য-বোধক অযুত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা অযুত শব্দের অর্থ অমিলিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত ভেদবিশিষ্ট। একমাত্র মা-ই যে যথার্থ অহং পদের বাচ্য বা লক্ষ্য, এই কথা ভুলিয়া গিয়া জীব অন্নময়াদি ষট্‌কৌষিক দেহে অভিমানাবদ্ধ হয়। উদগ্র অস্থরের ছয় অযুত রথের ইহাই আধ্যাত্মিক রহস্য।

মহাহনু জীবভাবীয় শারিরিক বা মানসিক বল। সাধারণতঃ পুরুষকার শব্দে যাহা বুঝায় উহাকেই মহাহনু বলে। যতদিন পুনঃ পুনঃ দৈবপ্রতিকূলতা দ্বারা, এই জীবভাবীয় পুরুষকার খণ্ডিত না হয়, ততদিন ইহা অমিতবলসম্পন্ন। "আমি পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছি, ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি" ইত্যাদি। এইরূপ ভাবটিই মহাহনু। ইহার সহস্র অযুত রথ। এই সকল স্থলে সহস্র শব্দ অসংখ্যবোধক।

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগরূপ কর্ম্ম—সংখ্যাতীত। এই অসংখ্য অর্থেই এস্থলে সহস্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অযুত শব্দের অর্থ অমিলিত; ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরুষকারের পুরুষটিই যে মা, ইহা না বুঝিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিষ্পন্ন করা রূপ পুরুষকার প্রয়োগই, মহাহনু নামক অসুরের সহস্র অযুত রথ সহ যুদ্ধের আধ্যাত্মিক রহস্য।

পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে॥ ৪১॥

অনুবাদ। মহাসুর অসিলোমা এবং বাস্কল, রণক্ষেত্রে যথাক্রমে পঞ্চাশ নিযুত ও ছয়শত অযুত রথে পরিবৃত হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। অসিলোমা—অসির ন্যায় লোম যাহার। যাহার গাত্রস্পর্শে, অর্থাৎ সংসর্গে আসিলেই ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহাকে দ্বেষ বলা হয়! দ্বেষ যথার্থই অসিলোমা। ইহা যে কেবল অপরকেই ক্ষতবিক্ষত করে, তাহা নহে, আশ্রয়াশ হুতাশনের ন্যায় স্বাশ্রয়কেও বিধ্বস্ত করে। ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি এই দ্বেষেরই অন্তর্গত। পরগুণে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভাবগুলি মানুষকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও সন্তপ্ত করে। পরদুঃখে দুঃখী হয়—পরের চক্ষুতে জল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, এরূপ মহানুভব ব্যক্তি জগতে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু পরের সুখে যথার্থ আনন্দিত হয়—পরের হাসিতে সরলপ্রাণে আপন হাসি মিলাইয়া দেয়, এরূপ লোক এ জগতে খুবই দুর্ল্লভ। কেন এরূপ হয়? ঐ অসিলোমা অসুরের অত্যাচার।

আবার অন্যদিকে, যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক—জোর করিয়া বিষয়বিদ্বেষ

অভ্যাস করেন, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে—বৈরাগ্য সাধনের উপায় স্বরূপ, বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারাও ঐ অসিলোমা অসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন। কারণ অনুরাগ ও বিদ্বেষ উভয়ই তুল্য শৃঙ্খল। বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগ যেরূপ ভগবৎলাভের পথে অন্তরায়, ঠিক সেইরূপ বিষয়-বিদ্বেষও প্রবল অন্তরায়। বরং অনুরাগের পরিসমাপ্তি একদিন না একদিন ভগবানেই হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ভগবানে হওয়া একান্ত দুরূহ। হ্যাঁ, বিদ্বেষ করিয়াছিল—কংস শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতি। তাহাদের বিদ্বেষ ভগবানে পর্য্যবসিত হইয়া মহামোক্ষ আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে উহা একান্ত অসম্ভব; কারণ তাহাদের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বল।

সে যাহা হউক, এই অসিলোমা অসুরের রথসংখ্যা—পঞ্চাশ নিযুত বা পাঁচশত লক্ষ। রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয়কে আশ্রয় করিয়া বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়। উহাদের অবান্তর অসংখ্য ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই শতলক্ষ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা নিযুত শব্দের অর্থ অমিলিত। আধ্যাত্মিকভাবে অযুত ও নিযুত শব্দ পরামাত্মযোগশূন্য ভাবকেই বুঝাইয়া দেয়। আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত, প্রতিনিয়ত রূপাদি বিষয়পঞ্চকের যথাযোগ্য সংযোগ হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সংযোগ আমাদের অনুকূল, অপরগুলি প্রতিকূল। প্রতিকূল সংযোগে চিত্তের যে বিকার হয়, তাহারই নাম বিদ্বেষ। উহা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়বিধ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়। সুতরাং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়ের সহিত গুণিত হইয়া বিদ্বেষের পঞ্চাশ প্রকার স্থূল ভেদ হয়। তাই মন্ত্রে পঞ্চাশ নিযুত শব্দের উল্লেখ আছে। যতদিন অনাত্ম-বস্তুর বোধ থাকে, অর্থাৎ মা ছাড়া অন্য কিছু আছে বলিয়া বোধ থাকে, ততদিন এই বিদ্বেষ-ভাব সম্যক্ দূর হওয়া একান্ত অসম্ভব। বাস্কল শব্দের অর্থ ভোগাভিলাষ। এই অসুরের অত্যাচারই

আমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপে আসিয়া থাকে। কোন্ অনাদিকাল হইতে জগদ্‌ভোগে অভ্যস্ত হইয়াছি, কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া, একই জগৎকে নানাভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কিছুতেই অভিলাষের নিবৃত্তি হইতেছে না; এমনই দুর্দ্দান্ত ও দুর্জ্জয় এই অসুর ইহার রথসংখ্যা ছয়শত অযুত, অর্থাৎ ছয় নিযুত। ভোগায়তন-ক্ষেত্র দেহই ভোগাভিলাষরূপী বাস্কল অসুরের যুদ্ধোপকরণ বা আশ্রয়স্থান। উহাতে—"জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" এই ছয়টী বিকার সংঘটিত হয়। এই ষড়্ভাব-বিকারযুক্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোগাভিলাষের প্রবল প্রেরণায় কত লক্ষ যোনি ভ্রমন করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিলেও স্তব্ধ হইতে হয়। নিযুত শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

—০—

গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত॥ ৪২॥

অনুবাদ। পরিবারিত নামক অসুর সেই যুদ্ধস্থলে, বহু সহস্র হস্তী অশ্ব এবং কোটিসংখ্যক রথে পরিবেষ্টিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। পরিবারিত—পরিবার প্রতিপালন বিষয়ক কর্ত্তব্য-বুদ্ধি। ইহাও অসুর বিশেষ (১)। সাধারণভাবে এ কথাটা অনেকেরই অপ্রীতিকর হইতে পারে; কারণ সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অনুশাসন যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ একান্ত কর্ত্তব্য। না করিলে অধর্ম্ম হয়, সমাজ-শৃঙ্খলা নষ্ট

(১) বোম্বাই প্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তকের টীকায় "পরিবারিত" নামক একটি পৃথক অসুরের উল্লেখ আছে। এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তিকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকায়ও উহা স্বীকৃত হইয়াছে।

হয়। প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। ইহা মনুসংহিতা প্রভৃতি বেদানুগামী শাস্ত্রকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন, গীতারহস্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছে, এক কথায় যাহারা মোক্ষকামী, অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম উভয়েরই অতীত অবস্থায় যাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া আর কিছু থাকে না। যতদিন অহঙ্কার বা জীবভাবীয় কর্ত্তৃত্বজ্ঞান থাকে, বিশ্বময় একমাত্র মহতী শক্তির স্বতঃস্ফুরণ দেখিতে না পায়, ততদিনই কর্ত্তব্যজ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার, এ সব থাকে। আর যাঁহারা জীবভাবীয় আমিত্বকে মায়ের আমিত্বে মিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন তাঁহাদের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। তাঁহাদের দেহ মাতৃ-শক্তি বিকাশের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া, অসংখ্য কর্ম্মসম্পাদন করে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নহে। তখন তাঁহারা গীতার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে থাকেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন !

যাহা হউক যতদিন জীবের এই অবস্থা না আসে, অথচ ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগিতে থাকে, ততদিন ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞানই অসুরের অত্যাচাররূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। সাধকের বিশিষ্ট প্রাণ চায়—মহাপ্রাণে মিলাইয়া যাইতে, কিন্তু ঐ পরিবারিত নামক অসুর কর্ত্তব্যের সাজে দণ্ডায়মান হইয়া, সে মহামিলনে বাধা দেয়। প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, ধর্ম্মকর্ম্মগুলিও বন্ধনবিশেষ। এই পরিবার-প্রতিপালন-বিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞানও এক প্রকার বন্ধন মাত্র। আরে, কর্ত্তব্যশব্দটার সঙ্গেই যে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান রহিয়াছে। একমাত্র মা ব্যতীত আর যে কোনও কর্ত্তা নাই—থাকিতে পারে না; এই জ্ঞানে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "কর্ত্তব্য" বলিয়া একটা বোধ থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে—যাঁহারা বিশ্বময় একমাত্র মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কি তবে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করেন না? ইহার উত্তরে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ এক সুরে বলিয়াছেন—তাঁহারা

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই করেন; কিন্তু কর্ত্তব্য অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে না। যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত কর্ম্মগুলি করিয়া যান। মাতৃলাভের ইহাই ত ফল। অহঙ্কার—অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়াই আত্মদর্শনের বাহ্য লক্ষণ। অবশ্য তারপরও যৎকিঞ্চিৎ অভিমান বা অহংবোধ থাকে কিন্তু উহা বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় বন্ধনরূপ বিষ উদ্গীরণ করিতে পারে না।

একটা কথা এস্থলে বিশেষ প্রণিধান করিবার যোগ্য যে, পরিবার-প্রতিপালনরূপ গুরুভার বহন ও তজ্জন্য নানাবিধ অসুখ অশান্তি হইতে দূরে থাকিবার লোভে, ধর্ম্মের নামে অলসতার প্রশ্রয় দিয়া গৈরিক বসনে সজ্জিত হওয়া পাষণ্ডের লক্ষণ। যদি কেহ যথার্থ মুমুক্ষু হয়, যদি কাহারও আত্মপ্রেম-প্রবাহ কুলপ্লাবী হয়, তবে এই পরিবারিত অসুরের অত্যাচার হইতে তাহাকে মা-ই রক্ষা করেন। সাবধান—কেহ মায়ের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত বা সদ্‌গুরুর আদেশ ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মপঙ্কে নিমগ্ন হইও না। যতক্ষণ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার প্রাণে জাগিবে, ততদিন সংসারাশ্রম-পরিত্যাগ একান্ত নিষিদ্ধ। সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী হওয়া যায়, এবং ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক। তবে, যখন তুমি মাতৃস্নেহে মুগ্ধ, মাতৃ-অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্ মাতৃ-কর্ত্তৃত্বে পূর্ণ নির্ভরশীল, তখনও দেখিতে পাইবে—এই পরিবারিত অসুর তোমায় উৎপীড়িত করিতেছে! এই অবস্থায় কাতর প্রাণে মাকে জানাও—মা! আর যে পারি না! সহস্রবার বুঝি—একমাত্র তুমিই কর্ত্তা, তবু ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান অসুরের সাজে আসিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের সুখ দুঃখ জানাইবার আর ত দ্বিতীয় স্থান নাই। আমাকে এই পরিবার প্রতিপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমি শুধু ঐ একটী মাত্র "কর্ত্তব্যের" অনুরোধে শত সহস্র কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছি। তুই যে মা, আমার পূর্ণ স্বাধীনতার অদ্বিতীয় ক্ষেত্র! তুই আমার উন্মুক্ত হৃদয়ের বিলাসনিকেতন, আমার সর্ব্বস্ব তুই, আমার সর্ব্ববিধ সঙ্কোচের অবসান তুই, তোকে ধরিয়া আবার

সংসারের দাসত্ব কেন করিব মা? তুই রাজরাজেশ্বরী, আর তোরই পুত্র আমি কাঙ্গালের মত বিষয়ের দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতে কেন যাইব?

এইরূপে সরলপ্রাণে মাকে জানাও। দেখিবে—মা অচিন্ত্য উপায়ে তোমাকে এই পরিবারিত অসুরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। যতদিন মা স্বয়ং এই অসুর নিধনে উদ্যুক্তা না হন, ততদিন হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ কর্তৃত্বে অসুরবধে উদ্যোগ করিও না। মনে রাখিও—মায়ের প্রতি নির্ভরশীল সন্তানের কোন আব্দারই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। তাইত অনেক সময় বলি—যখন যাহা ইচ্ছা মায়ের কাছে চাইতে দোষ নাই, যদি ছেলে যেমন করিয়া মায়ের কাছে চায়, তেমন করিয়া চাইতে পার। ওগো! তোমরা যে ভিখারীর মত চাও! মা যে আছেন, তাহাতেই সংশয়! কাজেই নিতান্ত পাতান মায়ের কাছে, সন্দিগ্ধচিত্তে ভিক্ষুকের মত মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা কর। আশঙ্কা পাছে মা দিবেন কি না? সুতরাং ফলও সেইরূপ হয়। চাইবে ত ছেলের মত চাও, ভিখারীর মত চাইও না! কিন্তু সে অন্য কথা :—

যাহা হউক, এই পরিবারিত অসুরের রথ—কোটিসংখ্যক, গজ বাজিও সহস্র সহস্র। গজ শব্দের অর্থ বন্ধন, বাজি শব্দের অর্থ দ্রুতগতি। মাত্র পরিবার প্রতিপালনরূপ একটি মাত্র কর্ত্তব্যকে আশ্রয় করিলেই, অগণিত কর্ত্তব্য আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, এবং উহারাই জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখে ও অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত করায়। গজবাজি শব্দের অর্থ পূর্ব্বেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ। অনন্তর বিড়ালাক্ষনামক অসুর, পঞ্চাশ অযুত রথে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। বিড়ালাক্ষ—বিড়ালের ন্যায় অক্ষি যাহার। আধ্যাত্মিক-ভাবে ইহাকে দোষদৃষ্টি বলে। বিড়ালনেত্রের বিশেষত্ব এই যে, তারকাদ্বয় পীতবর্ণ এবং দিবারাত্রি উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। যেরূপ কামলারোগগ্রস্ত ব্যক্তি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পায়, সেইরূপ জীবগণও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে বহুভাবে বিরাজিত জগৎরূপে দর্শন করিয়া থাকে। সহস্রবার বুঝিয়াছ, সহস্রবার আলোচনা করিয়াছ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" ইত্যাদি কত শুনিয়াছ, কত উপদেশ পাইয়াছ; তথাপি এই জগৎকে ত ব্রহ্মরূপে দর্শন করিতে পার না! কিছুতেই জগৎকে আত্মা বলিয়া—মা বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিতেছ না। ইহাই বিড়ালাক্ষ অসুরের অত্যাচার। কি করিব মা! আমরা কেবল আজ নয়, বহু জন্ম হইতে এইরূপ প্রবঞ্চিত হইতেছি, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নহে, ইহাতে কিছুতেই নিরন্তর ভাণ হয় না! অনাত্ম-বস্তুর দর্শনরূপ পীতনেত্রের অত্যাচার হইতে কোন ক্রমেই ত পরিত্রাণ পাওয়া যায় না! দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ বিড়ালনেত্রের অত্যাচারে অদ্বিতীয় চিন্মাত্র বস্তুতে জড় পদার্থের আকারে পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হই; ঠিক সেইরূপই রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় অনাত্মবস্তুর পরিগ্রহে মুগ্ধ থাকি। এইরূপে দিবারাত্রি আমরা বিড়ালাক্ষের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছি।

কিন্তু মা, এবার আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে; কারণ জগৎদর্শন যে অসুরের অত্যাচার, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাই তুমি স্বয়ংই অসুরের নিধনকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছ। আর আমাদের ভয়

কি ? মা! প্রতিজীবহৃদয়ে এমনই করিয়া চণ্ডীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, দোষদৃষ্টি বা বিষয়দর্শনরূপ বিড়ালাক্ষ-অসুর নিধনের উদ্যোগ কর। জগতে আবার সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হউক।

আধিভৌতিকভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিড়ালাক্ষ অসুর বা দোষদৃষ্টিই মানুষকে নিয়ত অশান্ত রাখে ও দুঃখের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। অপরেব দোষ দেখিতে আমরা সহস্রলোচন হইয়া থাকি। হায়, আমরা বুঝিতে পারি না যে, অপরের দোষ দেখিবার সময়ে সেই দোষগুলি আমারই চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকে। অপরের দোষ দেখিবার চক্ষু সম্যক্ মুদ্রিত থাকিলে মানুষ যে কত সুখী হয়, তাহা সহজে ধারণাই করিতে পারি না। তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি—মা, তুমি আমাকে এই দোষদর্শনরূপ বিড়ালাক্ষ অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ কর। আমি যেন ভ্রমেও পরের দোষ দর্শন না করি। মানুষ-মাত্রেরই দোষ এবং গুণ উভয়ই থাকে। মা গো! আমার দৃষ্টি যেন প্রতিনিয়ত কেবল গুণ অংশের উপরই নিপতিত হয়। আমি যেন কাহারও দোষের আলোচনা করিতে গিয়া নিজের চিত্তকে কলুষিত না করি। তুমি আমায় শক্তি দাও। মা মা মা!

সে যাহা হউক, এই বিড়ালাক্ষের রথসংখ্যা পঞ্চাশ অযুত। একই পরমাত্মবস্তুকে আমরা পঞ্চ বিষয়রূপে, দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিগ্রহ করি। এইরূপে ইহার স্থূলতঃ পঞ্চাশ প্রকার ভেদ হয়। অযুত শব্দের অর্থ অসংখ্য বা অমিলিত। ইহা পূর্ব্বেও অনেক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে।

———

অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্ব্বৃতাঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ॥ ৪৪॥

অনুবাদ। অন্যান্য মহাসুরগণ অযুত অযুত হস্তী অশ্ব ও রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণস্থলে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তি-মন্ত্রসমূহে প্রধান প্রধান অসুরগণের নাম ও বলের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এইবার অন্যান্য অসুরকুলের বিবরণ সাধারণভাবে উল্লিখিত হইল। তন্মধ্যে উদ্ধত দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ করাল উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্য্য নামক কয়েকটি অসুরের বধবিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। এই নামগুলি অন্বর্থ। ধীমান্ সাধকগণ অনায়াসে নিজের ভিতরেই ঐ সকল নামধারী অসুর দেখিতে পাইবেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে—"দেহস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা দেহস্থাশ্চ মহাসুরাঃ। দেহস্থানি চ তীর্থানি পশ্যন্তি যোগচক্ষুষঃ॥" যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আপনাতেই দেবতা অসুর ও তীর্থসমূহ দেখিতে পান। ব্রহ্মর্ষি মেধস অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক রাজা সুরথকে দেখাইয়া দিলেন চিক্ষুর, চামর প্রভৃতি অসুরগণ কিরূপ শক্তিসহায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত। মানুষ যখন তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অতিপ্রিয় বৃত্তিগুলিকে এইরূপ অসুর বলিয়া বুঝিতে পারে (মুখে বলিলে বোঝা হয় না—বুকে বুঝিতে হয়), তখনই দেখিতে পায়—এই অসুরগণ তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া, মায়ের সহিতই যুদ্ধ করিতেছে; তাই মন্ত্রে "দেব্যা সহ যুযুধুঃ" বলা হইয়াছে। সাধক! যতদিন দেখিবে যে, তুমি স্বয়ং অসুরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছ, ততদিন বুঝিবে—এখনও অসুর-নিধনের যথার্থ উপায় পাও নাই। তুমি মায়ের ছেলে মায়ের বুকে থাকিয়া শুধু দেখ, অসুরগণ কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে—আর মা-ই বা কি প্রকারে উহাদিগকে আপনাতে বিলয় করিয়া লয়েন। কিন্তু সে অন্য কথা।

কোটীকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ। এইরূপে মহিষাসুর বহু কোটি রথ, হস্তী এবং অশ্বে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

ব্যাখ্যা। সাধক! এইবার একবার অসুরবলের দিকে দৃষ্টিপাত কর—তোমার দেহমধ্যে—অন্তর রাজ্যে অসুরগণ কিরূপ বলে বলীয়ান্ হইয়া তোমাকে বিধ্বস্ত করিতেছে, কিরূপ শক্তিসহায়ে তোমাকে আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদিগকে অন্তরের ভাব-মাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলে, এখন দেখ—তাহারা ভাবমাত্র নহে—অসুর। এইরূপই হয়—সাধকমাত্রেই রাজা সুরথের ন্যায় প্রথমতঃ আত্মীয় স্বজন কোষাগার ভূমি প্রভৃতিকেই সাধনার বা মাতৃলাভের অন্তরায় মনে করে, পরে একটু অগ্রসর হইলেই বেশ বুঝিতে পারে, বাহিরে যাহাদিগকে বিঘ্নস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহারা বাস্তবিক বিঘ্ন নহে। বিঘ্ন আমার মনের ভাবগুলি। এই ভাবগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই মাতৃলাভ হইতে পারে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারে। এ ভাবসমূহ সামান্য নহে, ইহারা মহাসুর। কোটি কোটি সৈন্যসহায়ে স্বয়ং মহিষাসুর সাধককে চিরতরে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য উদ্যম করিতেছে; কিন্তু সাধক—নির্ভয় নিশ্চিন্ত; কারণ, সে মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া অসুরকুলের নিধনপ্রতীক্ষায় উৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকে।

জীব! যতদিন তুমি মাত্র আপন কর্তৃত্ব লইয়া সাধনা করিবে—যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া অসুরকুলকে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন আশঙ্কা আছে—হয়ত সাধনা নিষ্ফলও হইতে পারে; কারণ, তোমার কর্তৃত্বজ্ঞান রহিয়াছে। আর যখন মা স্বয়ংই সাধনারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আর নিষ্ফলতার আশঙ্কা থাকে না। তাই বলি, যে যাহাই কর না কেন, মায়ের কর্তৃত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া, পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে অভ্যাস কর। দেখিবে কোন অজ্ঞেয় শক্তি তোমার সকল বাধা বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া দিতেছেন। মাতৃ-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান্ সাধকের কেবল যে সাধনমার্গ ই অন্তরায়শূন্য হয়, তাহা নহে—ব্যবহারিক জীবনযাত্রাও বিঘ্নশূন্য হইয়া থাকে।

তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। তোমর ভিন্দিপাল শক্তি মুষল খড়্গ পরশু এবং পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা অসুরগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। অসুরগণের মধ্যে যেরূপ চিক্ষুর চামর প্রভৃতি সাত জন প্রধান অসুরের নাম পাওয়া যায়, সেইরূপ তোমর ভিন্দিপাল প্রভৃতি সাতটী প্রধান অস্ত্রের বিষয়ও উল্লেখ আছে। যাঁহারা পরিবারিত নামক একজন পৃথক অসুর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতেই অসুর-সপ্তক হয়; আমরা কিন্তু উহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি; সুতরাং আমাদের গণনায় প্রধান অসুর আট জনই হয়। ইহার মীমাংসা পরে হইবে। প্রথমে অস্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

তোমর—"স্তোমং রাতি ইতি তোমর" (সকার লোপ)। যে স্তোম অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা একত্রীকৃত ভাবকে দান করে, তাহাকে তোমর কহে। যুগপৎ বহুভাবকে রাশীকৃত করিয়া একটী পদার্থের ন্যায় প্রতীতিযোগ্য করিয়া দেওয়াই, তোমর নামক অস্ত্রের কার্য্য। ইহা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুরের অস্ত্র। বিক্ষেপ-শক্তির স্বভাবই বহুভাবকে সঙ্কীর্ণরূপে জ্ঞানগোচর করাইয়া দেওয়া। তুমি বৃক্ষ দেখিতেছ; তোমার মনে হয়, বৃক্ষনামে একটিমাত্র পদার্থ জ্ঞানগোচর হইল। বাস্তবিক কিন্তু উহা একটি পদার্থ নহে, ক্ষণ-পরিণামী বহুজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। নদীর প্রবাহ দেখিতেছ। প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রবাহের যে অংশ দেখিয়াছিলে, দ্বিতীয় ক্ষণে সে অংশ নাই—অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে; এইরূপ তৃতীয় চতুর্থ ক্ষণে তোমার পূর্ব্বদৃষ্ট প্রবাহের অংশ নাই, প্রত্যেক ক্ষণেই নূতন নূতন আসিয়া তোমার নেত্রগোচর হইতেছে। তুমি কিন্তু একই জলপ্রবাহ দেখিতেছ বলিয়া মনে করিতেছ। দ্রুতসঞ্চালিত অলাতচক্রস্থিত বিন্দুমাত্র বহ্নি তোমার চক্ষুতে স্থির রেখার

আকারে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক উহা বহ্নিরেখা নহে, অতি দ্রুতবেগে ভ্রাম্যমাণ বহ্নিকণাই রেখার আকারে প্রত্যক্ষ হয়। দেখ—তোমার অণুপরিমাণ মনকে বিক্ষেপ-শক্তিরূপ চিক্ষুরাসুর তোমরাস্ত্র প্রভাবে কতবড় বৈচিত্র্যময় জগদ্‌ভোগ করাইতেছে। যে কোন একটিমাত্র বোধকেও কেন যে ক্ষণকাল ধরিয়া রাখিতে পার না, তাহা এইবারে বুঝিতে পারিলে? মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্তক্ষেত্রে কত শত সহস্র বৃত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, কোন একটিকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমষ্টিভূত হইয়া একটি পদার্থের ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উহাই চিক্ষুর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরাস্ত্রের প্রভাব। একটু ধীরভাবে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিলেই মানুষ এই অস্ত্রাঘাত লক্ষ্য করিতে পারে! সূক্ষ্ম বিক্ষেপগুলি আরও ভয়ানক, যোগচক্ষু ব্যতীত উহার উপলব্ধিই হয় না। বড় ভয়ানক এই তোমরাস্ত্র! বুঝিবার উপায় নাই—উহার আঘাত কোথায় কি ভাবে হইতেছে। অথচ মর্ম্মে মর্ম্মে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। পুত্রের হাস্যময় মুখখানি দেখিলে—কত আনন্দ হইল। ঐ দর্শন যে কতকগুলি ক্ষণপরিণামী দেশ-পরিণামী পরমাণু-বিষয়ক দর্শন বা প্রতীতির সমষ্টিমাত্র, ইহা বুঝিতে দেয় না। মনে হয়—পুত্রমুখ বলিয়া একটি বস্তুই দেখিলাম। এইরূপ সমষ্টিভাবে সঙ্কীর্ণভাবে পদার্থোপলব্ধিকারক অস্ত্রই তোমর।

ভিন্দিপাল—ভেদজ্ঞানকে পালন বা পোষণ করে বলিয়া, ইহার নাম ভিন্দিপাল। ইহা মহাসুর চামরের অস্ত্র। আবরণ-শক্তির স্বভাবই হইতেছে—বিষয়কে অর্থাৎ অনাত্মবস্তুকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করান। মনে কর, তুমি গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস-বশতঃ সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেও মুহূর্ত্তমধ্যে চামর অসুর ভিন্দিপাল-অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জগদাকারে আকারিত করিয়া দিল। তুমি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলে। এই অস্ত্রের কি মারাত্মক প্রভাব!

শক্তি—এইটী উদগ্র-অসুরের অস্ত্র। অভিমান অর্থাৎ জীবভাবীয়

কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই স্বকীয় শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়। এমন কি, সংসার-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে জীব যখন বিপন্ন হইয়া পড়ে, সর্ব্ববিধ পুরুষকার-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়, তখন একবার উপরের দিকে চাহিয়া কোন অজ্ঞেয় শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে বটে ; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির পরেই, উহাকে আপন শক্তিরূপেই বুঝিয়া লয়। এমনই এই অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল! শক্তি একমাত্র চৈতন্যেই অবস্থিত। তদ্ভিন্ন আর কোথাও শক্তি নাই—থাকিতে পারে না, ইহা না বুঝিয়া জড় পদার্থে শক্তিদর্শনই উদগ্র-অসুরের শক্তি প্রয়োগের ফল।

মুষল—মুষ্ ধাতু স্তেয়ার্থক। মুষং লাতি ইতি মুষলঃ। স্তেয় অর্থাৎ অপহরণভাবকে অর্পণ করে বলিয়া ইহার নাম মুষল। ইহা মহাহনুনামক অসুরের অস্ত্র। বল বা সামর্থ্য যে একমাত্র ঈশ্বরেই আছে, পুষ্টি যে একমাত্র মহামায়া মা, ইহা না বুঝিয়া শারীরিক বা মানসিক বলকেই কার্য্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করাই, এই মুষলাস্ত্র-প্রয়োগের প্রভাব। ঐশ্বরিক প্রভাবকে অপহরণপূর্ব্বক জীবের পুরুষকার-ভাবের প্রকটন করাই ইহার কার্য্য।

খড়্গ—দ্বিধাকারক অস্ত্র। ইহা অসিলোমার অস্ত্র। অসি অসিলোমারই অস্ত্র হওয়া উচিত। তুমি আমি বস্তুতঃ এক—অভিন্ন হইয়াও, যে বুদ্ধির প্রভাবে তোমাকে পরজ্ঞান করিয়া থাকি ; উহাই ঐ খড়্গাঘাতের ফল।

পরশু—পরান্ শবতি ইতি পরশুঃ। শু ধাতু ভ্বাদিগণীয় গমনার্থক। "গমের্জ্ঞানার্থকত্বং।" পরকে বা অন্যকে প্রতীতি করায় বলিয়া ইহার নাম পরশু। ইহা বাস্কল-অসুরের অস্ত্র। আত্মভিন্ন অনাত্মনামক বস্তুর প্রতীতি দ্বারাই ভোগাভিলাষ সিদ্ধ হয়। "যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিঘ্রেৎ" যখন সকলই আত্মময় হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শ্রবণ কিছুই থাকে না ; সুতরাং ভোগ বা ভোগ্য থাকে না। তাই বাস্কল-অসুর প্রতিক্ষণে পরশুর আঘাতে পরপ্রতীতি জন্মাইয়া থাকে।

পট্টিশ—ইহা বিড়ালাক্ষের অস্ত্র। পট্টিশ এক প্রকার জৃম্ভকঅস্ত্র,

ইহার প্রয়োগে লোক বিকৃত হইয়া পড়ে—অন্ধকার দেখে। দোষদৃষ্টি হইতে অজ্ঞান-অন্ধকার ঘন হয়। এতদ্ব্যতীত পরিবারিত-অসুর আছেন, তাহার বিশেষ কোন অস্ত্রের নাম এ মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। পরবর্ত্তি মন্ত্রে পাশনিক্ষেপের কথা আছে। ঐ পাশটীই পরিবারিতের অস্ত্র। পরিবার-প্রতিপালন-বিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতেই, পাশ বা বন্ধন দৃঢ় হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রেও পুনরায় ঋষি বলিলেন—"দেব্যা সহ যুযুধুঃ" অসুরগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। আমার সহিত নহে—মায়ের সহিত। সাধক যখন সত্য সত্যই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে মাতৃ-অঙ্কস্থিত সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন দেখিতে পায়—অসুরগণ মায়ের সহিতই যুদ্ধ করিতেছে, আমি নিমিত্তমাত্র—সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থিত।

তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অস্ত্রগুলির এরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ দেখিয়া, একদিকে যেমন উহার যথাশ্রুত অর্থের প্রতি কেহ সন্দিহান হইবেন না, আবার, অন্যদিকেও কষ্টকল্পিত বলিয়া উক্ত প্রকার অর্থের আনর্থক্য মনে করিবেন না। শাস্ত্র-বাক্যমাত্রেরই আত্মাভিমুখী লক্ষ্য, ইহা সকল দর্শন ও মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত। যে স্থলে সহজেই শাস্ত্রার্থ আত্মলক্ষ্যে উপস্থিত হয়, সেস্থলে যেরূপ কোন সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত হয় না, সেইরূপ যেস্থলে একটু কষ্ট করিয়া আত্মাভিমুখী গতির অনুকূল অর্থ করিতে হয়, তাদৃশ অর্থের প্রতিও সংশয় বা বিতর্ক উপস্থিত না করিয়া, সম্যক্ শ্রদ্ধাবান্ হওয়াই পিপাসিত সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয় একমাত্র "আমি" বা মা, "আমি"কে চিনিবার জন্যই জগৎ। ইহা যেন চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে।

———

কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর শক্তিঅস্ত্র-প্রয়োগে কতকগুলি পাশঅস্ত্র-প্রয়োগে এবং অপর অসুরগুলি খড়্গপ্রহারে দেবীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল!

ব্যাখ্যা। বন্ধন-অর্থবোধক পশ্ ধাতু হইতে পাশ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা রজ্জুর ন্যায় বন্ধনসাধন অস্ত্রবিশেষ। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহা পরিবারিত নামক অসুরের আয়ুধ। যখন চারিদিক হইতে কর্ত্তব্য-জ্ঞানরূপ বন্ধন আসিয়া জড়াইয়া ধরে, তখন সাধক দেখিতে পায়—এবার বুঝি মাতৃ-শক্তি নির্জ্জিত হইয়া পড়িবে। কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান নহে, অন্যান্য অসুরকুলের নিক্ষিপ্ত শক্তি খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ, বুঝি বা এবার মাকে হত্যাই করিয়া ফেলে।

সাধক! ভাবিও না মাতৃ-চরণে শরণ লইতে পারিলেই, তোমার আসুরিক বৃত্তিনিচয় একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। মাকে কত কষ্ট করিয়া যে এই দুরন্ত অসুরকুলের নিধন সাধন করিতে হয়, তাহা যে যথার্থ একবারও মা বলিয়া ডাকিয়াছে, মাত্র সেই জানে।

বলিও না—যিনি সর্ব্বশক্তিময়ী পরমেশ্বরী, তাঁহার আবার অসুরনিধনের জন্য কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? স্মরণমাত্রেই ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ওরে, তাঁর যে নিজের কোন ইচ্ছাই নাই, শুধু তোমার ইচ্ছার জন্যই তাঁহাকে ইচ্ছাময়ী সাজিতে হয়। তোমার সংস্কারের ভিতর দিয়া—তোমার ইচ্ছায় অনুপ্রেরিত হইয়াই যে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। তিনি যে মা! তিনি যে তোমারই প্রকৃতি, তিনি যে তোমারই স্নেহে আকুলা আত্মহারা; তাই তাঁহার মহতী আত্মপ্রকৃতি-বিকাশের সুযোগ হইতেছে না। তুমিই যে তাঁকে—যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও প্রসূতি, তাঁকে ছোট করিয়া রাখিয়াছ; তোমার মত চির-মলিন সন্তানের শক্তিহীনা মা করিয়া রাখিয়াছ; তাই অসুরসমরে মাকে অসহনীয় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে

হয়। যদি সত্যই মাকে মহতী শক্তিময়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতে, তবে একবার স্মরণমাত্রেই অসুরকুল অস্তিত্ববিহীন হইয়া যাইত। যখনই মায়ের মহতী শক্তির দিকে তাকাও, তখনই যদি নিজের বুকের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, সেখানে—তোমার বুকের মধ্যে সংশয়ের তরঙ্গ উঠিতেছে। "সত্যই কি মা আমার এই বিপদ দূর করিবেন বা করিতে পারেন" এরূপ সংশয় থাকে বলিয়াই এক মুহূর্ত্তেই ফল পাও না। ওরে, আমরা রাজ-রাজেশ্বরীর পুত্রের মতন জোর করিয়া, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। কেন পারি না? ডাকিতে ইচ্ছা নাই। সহস্রবার বলিব—লক্ষবার বলিব, ইচ্ছা নাই বলিয়াই পারি না। ইচ্ছা নাই বলিয়াই বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়াই সংশয় আছে। আমরা যেমন একটু একটু করিয়া মা বলি, মাও তেমনি একটু একটু করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন! আমার সংশয়ের জন্যই ত মা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না; এবং পারেন না বলিয়াই তাঁহাকে অসুর-যুদ্ধে অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তাই, অসুরগণ আমার মায়ের অঙ্গে অস্ত্রপ্রহার করিতেছে, আমার মায়ের অঙ্গে রুধিরস্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আমার মায়ের কমনীয় চিন্ময় বপু মলিন করিতেছে। ওঃ আমরা কি অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান! মা মা মা! আমরা যে তোমার নিকট ক্ষমা চাইবারও অযোগ্য!

সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। চণ্ডিকাদেবীও তখন স্বকীয় অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া অসুরনিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্রগুলিকে অবলীলাক্রমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। তোমর ভিন্দিপাল প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র অসুরগণের আছে, সেই সকল অস্ত্র মায়েরও আছে। ইতিপূর্ব্বেই দেবগণ স্ব স্ব

অস্ত্রাদি-দ্বারা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। মায়ের আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই, সবই যে সন্তানদিগকে দিয়া ফেলিয়াছেন। কেবল সব নয়, আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়াছেন। এমনই পুত্রস্নেহ-বিমূঢ়া মা আমার! ওগো, সে আমার নিজের বলিতে কিছু রাখে নাই, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া উলঙ্গিনী হইয়াছে। শূন্যই যাঁহার রূপ, পূর্ণতাই যাঁহার ধর্ম্ম, প্রকাশ যাঁহার জ্যোতি, সেই মা আমার—তোমারই জন্য, আর কাহারও নয়—কেবল তোমার জন্য, তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া তোমাকে জগদ্‌ভোগ করাইতেছেন। আবার দৈবী প্রকৃতিরূপে অসুরকুলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। একবার দেখিতে ক্ষতি কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি—প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম হয়। এক—বহির্মুখ বা অনুলোম! অন্য—আত্মাভিমুখ বা বিলোম। একদিকে যেমন অসুরশক্তি অন্যদিকে তেমনই দেবশক্তি; সুতরাং উভয় পক্ষেরই অস্ত্রাদি তুল্য। যতদিন ঐ শক্তি-অংশের অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্র গুলির প্রতি "আমার" বলিয়া অভিমান ছিল, ততদিন দেবগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এবার তাহারা সমস্ত শক্তি মাতৃ-চরণে অর্পণ করিয়াছে; সুতরাং মায়ের নিজের কিছু না থাকিলেও এবার তিনি সর্ব্বায়ুধবিমণ্ডিতা-রণরঙ্গিনী-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে সাধকের সংস্কারানুযায়ী মাতৃ-মূর্ত্তি গঠিত হয়। মায়ের নিজের কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই। সন্তান তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে সাজায়, যে মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করে, স্নেহ বিহ্বলা মা আমার সেই মূর্ত্তিতেই প্রকটিতা হন। ইহাকেই বলে—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। মনে রাখিও—এই কল্পনা সাধকের নহে, ব্রহ্মের। "ব্রহ্মণঃ এই পদটিতে কর্ত্তরি ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে! দেখ সন্তান! দেখ পুত্র! দেখ, তোমারই জন্য মা আজ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী, সর্ব্বায়ুধমণ্ডিতা-মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিতে প্রকটিতা। যদি পুত্র হও, যদি যথার্থই মা বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তোমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে, চক্ষু ফাটিয়া জল উচ্ছ্বসিত হইবে, নিজের অকৃতজ্ঞতায়

মাটিতে মিলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে। আর বলিবে মা মা! আমি চিরদিন এইরূপ অসুরের অত্যাচারে বিমথিত হই, অনন্তকাল নরকে থাকি—সেও ভাল, তবু তুমি অরূপা অমেয়া নিত্য-শান্তিময়ী মা হইয়া, আমার জন্য এই অশান্ত অসুরসমরে অবতীর্ণ হইও না। আমারই জন্য তোমাকে এই ক্ষুদ্রতা—এই পরিচ্ছিন্নতার সাজ নিতে হইয়াছে। ওগো তোমাতে যে কোন বিশিষ্টতা নাই। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই। তুমি শুদ্ধ নির্লেপ নিষ্কল; তথাপি তুমি শুধু আমারই জন্য ভাবময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইতে বাধ্য হইয়াছ। এত স্নেহ তোর বুকে মা! ওঃ মা—

অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। অক্লিষ্টমুখী দেবী দেবতা এবং ঋষিবৃন্দকর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া ঈশ্বরী অর্থাৎ মহতী ঐশ্বর্য্যশালিনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক, অসুরদেহে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মা আমার অক্লিষ্টমুখী। সতত অসুরবৃন্দের শাণিত শরে আহতা হইয়া, দুর্ব্বার সংগ্রামে অসহনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও মা আমার অনায়স্তাননা—অক্লিষ্টমুখী। মুখে কোনরূপ ক্লেশের চিহ্ন নাই—সুপ্রসন্না। রক্তিম ওষ্ঠে সদাই হাসি। সাধক! যেদিন তুমি আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ—বুঝিয়াছ, সেইদিন হইতেই মা মহাদেবী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া, মহা-অসুর-মূর্ত্তির বিরুদ্ধে সমরের উদ্যম করিতেছেন। (এইস্থানে একবার প্রথম খণ্ডের মহাদেবী মহাসুরী ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়া লও) এতদিনে আপনার মাকে চিনিয়াছ; তাই দেখ মা সর্ব্বদাই স্মিতমুখী; কারণ "স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।" দেবতা ও ঋষিবৃন্দ মায়ের স্তুতিমঙ্গল গান করিতেছেন—মাতৃ-মহত্ত্ব-সূচক গাথা পাঠ করিতেছেন, তাই মা আমার সমরক্লেশেও সমুৎফুল্লা। দেখিতে

পাও না? দেখ, যখন তোমার অন্তরে বাহিরে দুর্দ্দমনীয় আসুরিক বৃত্তির অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখনই তোমার দৈবী প্রকৃতিকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। আর সেই সময় তোমারই অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ তোমার বাগাদি-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিয়া উঠে, স্তুতিপাঠ মাতৃ-মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে থাকে! এইরূপে মহাদেবী মূর্ত্তির অনুস্মরণে মহাসুরীকর্ত্তৃক উৎপীড়িতা মাতৃ-মূর্ত্তিতে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। তখন হতাশ, অবসন্নতা দূর হয়, আশায় উৎসাহে বুক ভরিয়া উঠে। আসুরী প্রকৃতির অত্যাচার প্রশমিত হয়। এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ভ সাধকহৃদয়ে সংঘটিত হয়!

উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিপাঠের বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। পুনরুক্তি হইলেও আবার কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। বেদ উপনিষদ্ তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাইবে—স্তব স্তুতিই প্রধান উপাসনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে যে সকল স্থলে পূজা হোম শ্রাদ্ধ তর্পণাদির উল্লেখ আছে, তাহাও স্তব স্তুতিরই প্রকার-ভেদ—স্তুতির সহিত দ্রব্যাদি অর্পণমাত্র। এই স্তুতি জিনিষটা কি? "দেবানাং স্বরূপকীর্ত্তনং স্তুতিঃ।" দেবতাদিগের স্বরূপ কীর্ত্তন করার নামই স্তুতিঃ। এই স্বরূপকীর্ত্তন যে কত তূর্ণফলপ্রদ উপাসনা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একসঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের তীব্র অনুশীলন, একমাত্র স্তুতিপাঠেই হইয়া থাকে। অপর সর্ব্ববিধ সাধনার ফললাভ কালসাপেক্ষ; কিন্তু এই বহিরঙ্গ সাধন—স্তুতির ফল পাঠকালেই লাভ হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গদেব এই স্তুতি জিনিষটাই মৃদঙ্গ করতালি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সুর তান যোগে আরও মধুর এবং প্রসারিত করিয়া, অশিক্ষিত স্থূলবুদ্ধি মানবগণেরও ভগবৎমুখীগতি সহজসাধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ উপনিষদাদি উচ্চতম শাস্ত্রেও স্তুতিকেই সাধনার সর্ব্বপ্রধান আলম্বনরূপে গ্রহন করিয়াছেন। আর্যযুগে ঋক্ মন্ত্রে সামগানে যজুর্মন্ত্রে পরমেশ্বরের উপাসনা হইত। ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন

বিশ্বরূপদর্শনে স্তুতি করিয়াছিলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ ক্ষীরোদকুলে বিষ্ণুর স্তুতি করিয়াছিলেন। চণ্ডীতেও অসুর-উৎপীড়িত সুরগণ মাতৃস্তোত্রে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে এমন অধ্যায় খুব কমই আছে—যাহাতে দুটী একটী স্তোত্রের উল্লেখ নাই। এইরূপ ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তের সাধনার দিকে লক্ষ্য করিলে, বেশ প্রতীতি হয় যে—কাল দেশ পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রণালী বহুধা পরিবর্ত্তিত হইলেও স্তুতি জিনিষটা প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় আছে।

স্তুতির দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। এক আর্ত্তের স্তুতি, অপর কৃতজ্ঞতার স্তুতি। এক—বিপদে পড়িয়া, অপর অভীষ্ট সিদ্ধির পর। এই উভয়বিধ স্তুতিদ্বারা প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অর্দ্ধাঙ্গ পরিপূর্ণ। স্তুতির যে কি অপূর্ব্ব শক্তি, তাহা মন্ত্রচৈতন্যকারী সাধকগণ একবার-মাত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। (মন্ত্রচৈতন্য প্রথম খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যতদিন মন্ত্রসমূহ চৈতন্যযুক্ত না হয় —রস ও ভাব-সমন্বিত না হয়, ততদিন স্তোত্রাদিপাঠের ফল অতি সামান্যমাত্র—ততদিন উহার প্রত্যক্ষফল অনুভূতিযোগ্য হয় না। বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকগণের পক্ষে অনর্থক ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ উৎকৃষ্টতর সাধনা; কারণ ধ্যান করিতে হয় না—উহা আপনি আসে। অপ্রত্যক্ষ পদার্থের ধ্যানই হয় না। যখন মা আসেন, যখন তিনি প্রত্যক্ষযোগ্যা হন, তখনই সাধক আত্মহারা হইয়া মুগ্ধনেত্রে পরম প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে, ইহারই নাম ধ্যান। অনেকে মনে করেন—স্তোত্রপাঠ বহিরঙ্গ সাধনা; সুতরাং পরিত্যাজ্য। অবশ্য যাঁহাদের সর্ব্বদা ধ্যানাবস্থা আসিয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র ও নিরোধভূমিক হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই একথা বলিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ আচার্য্য শঙ্কর এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর লোকহিতৈষণা-প্রযুক্তই হউক, বিক্ষিপ্তচিত্তের আদর্শই নিয়াছিলেন, অন্যথা বহুশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন

দিগ্‌বিজয় ধর্ম্মপ্রচার মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ধ্যানের ভাণ অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ যে শীঘ্র ফলপ্রদ, ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে। স্তোত্রপাঠ সাধককে যত শীঘ্র ধ্যানাবস্থায় আনয়ন করে, ধ্যানের ভাণ তত শীঘ্র করে না। বেদান্ত-শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলে, যোগশাস্ত্রে যাহাকে ধারণা বলে, স্তোত্রপাঠ তাহারই অন্তর্গত। ধ্যানের বিষয় পরে বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

স্তোত্রপাঠের দ্বিবিধ প্রণালী আছে। একাকী এবং সমভাবাপন্ন বহু—একসঙ্গে। গৌরাঙ্গদেব এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুশীলন বেশী করিয়াছিলেন। একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া চিত্তবৃত্তিকে বহুক্ষণ ভগবৎমুখী ধরিয়া রাখিতে পারেন, এরূপ সাধক খুব দুর্ল্লভ। যাঁহারা মনে করেন—নির্জ্জনে গেলেই সাধনা খুব ভাল হয়, তাঁহারা যদি নিজেকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন—খুব নিভৃতস্থানে একাকী বসিয়া চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎমুখী করিতে গেলেই, অন্তররাজ্যে বহু জনকোলাহল উপস্থিত হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেই বুকের দরজা বন্ধ হয় না সেখানে অনবরত নানাবিধ বিষয়-চিন্তা আসিয়া ভগবৎ-চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে—বাহিরের নির্জ্জনতা তাহাকে নির্জ্জন বা একাকী করিতে পারে নাই। বরং তদপেক্ষা সমভাবাপন্ন কতিপয় সংঘবদ্ধ হইয়া মন্ত্রচৈতন্যপূর্ব্বক স্তোত্রাদি পাঠ করিলে, চিত্তক্ষেত্রে নির্জ্জনতার আস্বাদ পাওয়া যায়। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকের সহিত উপাসনায় নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়; তজ্জন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থানই যে শ্রেয়ঃ, তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু প্রথমতঃ একেবারে একাকী না হইয়া সমভাবাপন্ন কতিপয় একত্র হইলেই যথার্থ নির্জ্জনতার উপকার বুঝা যায়। সংঘবদ্ধ উপাসনায় যে সকল দোষ বা বিঘ্ন আছে, তাহাতে যাঁহাদের মন্ত্রচৈতন্য হইয়াছে—তাঁহাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এইরূপ সংঘবদ্ধ উপাসনার ফলে, গুরুকৃপায়

অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিসত্ত্ব সমধিক নির্ম্মল হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক্ চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন সাধক সাধনার লক্ষ্য বা কেন্দ্র লাভ করিয়া একাকী উপাসনা করিতে পারেন। অথবা তখন সাধনা এত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায় যে, তাহার ব্যবহারিক দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মগুলিও সাধনাময় হয়; সুতরাং সে অবস্থায় একাকী বা সংঘবদ্ধ উভয়ই প্রায় তুল্য হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেবতা ঋষি মহাপুরুষ এবং আচার্য্যগণ নির্ব্বিচারে যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনরূপ তর্ক বা সংশয় উত্থাপন করাই অন্যায়। আর যদিও বাহিরে দেখা যায়—ভগবানের স্তুতিপাঠ করা হইতেছে, তথাপি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পায়, অন্তররাজ্যে সাধকই ভগবৎময় হইয়া পড়িতেছে। মনে কর, তুমি বলিতেছ—হে দয়াময়, হে শান্তিময়, হে মঙ্গলময়, যদি ঐ শব্দগুলি যথার্থ ভাবের সহিত অর্থবোধ করিয়া সত্যজ্ঞানে বলিতে পার, তবে তৎকালে তুমি স্বয়ংই দয়া শান্তি ও মঙ্গল লাভ করিবে। তোমার চিত্তে ঐ সকল দেবভাব তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিবে।

একজন গঙ্গাজল দেখিয়া বলিল—"ছিঃ! যে ঘোলা ময়লা জল, এতে আবার নাইতে আছে?" আর একজন কিন্তু "পতিতপাবনি পাপহারিণি সুখদায়িনি গঙ্গে মা আমার!" এই বলিয়া সানন্দে অবগাহন স্নান কবিয়া উঠিল। ভাবিয়া দেখ দেখি—সেই মুহূর্ত্তেই এই উভয়ের মধ্যে কে লাভবান্ হইল? একজন বলিল—"অমুক লোকটা বড় অহঙ্কারী, ধরাকে সরা জ্ঞান করে।" আর একজন বলিল—"তা হো'ক আহা! লোকটা বড় পরোপকারী, বিপন্ন দেখিলেই কেমন সরলপ্রাণে উপকার করে।" একবার ভাব দেখি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার সমধিক লাভ হইল? পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার মনই জগৎ আকারে আকারিত। তুমি যেরূপ ভাবনা করিবে, সেইরূপ ফল লাভ করিবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বড় সুন্দর ও সত্য প্রবচন। তুমি পরমেশ্বরের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে বস্তুতঃ

তুমিই মহত্ত্বময় হইয়া পড়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলাভ মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে?

আর একদল আছেন, তাঁহারা বলেন ভগবান্ বাক্য ও মনের আগোচর, তাঁকে আবার স্তব কি করিবে? "স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল-গুরোদূরীকৃতং যন্ময়া"। প্রমাণস্বরূপ এই বচনটী আবৃত্তি করিয়া বলেন—অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আবার স্তুতি কি? কথাটা সত্য। বাবা! তুমি কি সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তু উপলব্ধি করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তবে এ কথা বলিতে পার না, কারণ অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, তুমিও তাহাকে বচনীয় করিয়া লও। আর যদি উপলব্ধি না করিয়া থাক, তবে তোমার এই বচনীয়স্বরূপ ধরিয়াই অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপে যইাতে হইবে; সুতরাং উভয়পক্ষেই তুমি স্তোত্রপাঠ স্বীকার করিতেছ। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ"। ভগবৎকথা পরস্পর আলোচনা করিয়া সাধকগণ তুষ্টি ও প্রীতিলাভ করেন। আগে ঐটাই হউক না। আগে বাক্য এবং মন দিয়াই তাঁকে পাও, তারপর বাক্য মনের অতীতরূপে পাইবে। আগে নামেই রুচি হউক, তারপর স্বরূপে প্রীতি হইবে। না না, তা কি কখনও হয় গা? যতদিন স্বরূপে রুচি না হয়, ততদিন নামেই রুচি হয় না; হইতে পারে না। তাই শুনিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু রূপগোস্বমীকে সিদ্ধিলাভের চরম অবস্থায় "নামে রুচি হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। দিবা নিশি নাম জপ, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি নামে রুচির যথার্থ লক্ষণ নহে। উহা একটি অভ্যাসের ফল মাত্র। রুচি যখন নামে হয়, তখন বিষয়ে অরুচি প্রকাশ পাইবে। মুখে নাম জপ করিতে করিতে যদি এমন দিন আসে যে, বিষয়ে অরুচি প্রকাশ পাইয়াছে, মুখে নয় বুকে; তবেই বুঝিবে, নামে রুচি আসিতেছে। পরমহংসদেব বলিতেন—"ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হইলে, তবে ভগবৎ কথায় রুচি হয়, কাম কাঞ্চনে অরুচি হয়। কিন্তু সে অন্য কথা:—

যাহা হউক, মা যে আমার "অনায়স্তাননা" অক্লিষ্টমুখী, সদা

উৎফুল্লা, সদা হাস্যময়ী, তাহা স্তবস্তুতি দ্বারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ"। এইরূপ মা আমার হাসিমুখে অসুর দেহে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। "মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী"। মা আমার ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া অসুরশক্তি সংহরণ করিতে উদ্যত হইলেন। স্তূয়মানা হইলেই মায়ের ঈশ্বরীমূর্ত্তি—সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। খুলিয়া বলি—সাধক! তোমারই আত্মপ্রকৃতিকে—অন্তরস্থ মাতৃ-মূর্ত্তিকে স্তবস্তুতি দ্বারা সতত ঈশ্বরত্বের মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখ, কখনও দীনা মলিনা অবসন্না করিয়া রাখিবে না। উদ্ধরেদাত্মানাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" ভগবদ্গীতার এই মহাবাক্যের কার্য্যকরী অবস্থা যদি উপলব্ধি করিতে চাও, তবে নিয়ত মাকে ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে দেখ। উহা একদিনে হয় না, পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরত্বের মহিমাযুক্ত বাক্যাদির উচ্চারণ, অর্থাৎ স্তবস্তুতির দ্বারাই সহজসাধ্য হইয়া থাকে। যত মাকে ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে, ততই সহজে অসুরশক্তি বিলয় হইতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ইচ্ছার অভিঘাতরূপে অনৈশ্বর্য্য বা জীবত্ব দূর হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরত্ব কি। ইচ্ছার অনভিঘাত। ইচ্ছার অভিঘাত না হওয়াই অর্থাৎ পূর্ণ হওয়াই ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্ব। আর ইচ্ছার অপূর্ণতাই অনৈশ্বর্য্য বা জীবত্ব। ঈশ্বরীমূর্ত্তির দর্শন ব্যতীত জীবত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই জীবমাত্রেরই নিয়ত আত্মপ্রকৃতিকে ঈশ্বরী মূর্ত্তিতে উপলব্ধি চেষ্টা করা উচিত। স্তবস্তুতিই উহার সহজ ও সুনির্দিষ্ট উপায়। আরে, আমি ভাল হইব, সুখে থাকিব, অসৎ-প্রবৃত্তি দূর করিব, সংসারে আসক্ত হইব না, ভগবানকে বিশ্বাস করিব—ভক্তি করিব" ইত্যাদি ইচ্ছা আমাদের মনে কতবার জাগে; কিন্তু ঐ সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না কেন? ইচ্ছার অভিঘাত হয় কেন? মাকে ঈশ্বরী বলিয়া ডাকি না, ডাকিলেও বিশ্বাস করি না, মা যে আমার ঈশ্বরী! তাঁহাতে যে কোন ইচ্ছারই অভিঘাত নাই! ইহা প্রাণ মানিতে চায় না। তাই অনৈশ্বর্য্য দূর হয় না।

সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতশটো দেব্যা বাহনকেশরী।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাসনঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। দেবীর বাহন সেই কেশরীও ক্রুদ্ধ হইয়া কেশর কম্পিত করিয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশনের ন্যায়, অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মা ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে সমরোদ্যতা ; সুতরাং তাঁহার বাহনও অসুরভাব হননেচ্ছু। পূর্ব্বে বলিয়াছি—জীব যখন সিংহভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ স্বকীয় জীবভাবের উপর হিংসাভাব পোষণ করে, তখনই মা অসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে তদুপরি অধিষ্ঠিতা হন। অথবা মা যখন অসুর-সংহারিণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন জীব আর সিংহধর্ম্মী না হইয়া থাকিতে পারে না। আজ মাতা স্বয়ং সমরোদ্যতা, তাই সন্তানও সিংহ-ধর্ম্মী—অসুরদলনে সমুদ্যত।

সাধক। যখন দেখিবে—কে যেন জোর করিয়া জগতের যাবতীয় কার্য্য হইতে টানিয়া আনিয়া, মধ্যে মধ্যে তোমাকে সাধনায় নিযুক্ত করিতেছে যেন কোনও অজ্ঞেয় শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া হঠাৎ দুই চারিটা সাধনোপযোগি-কর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছ, তখনই বুঝিও—মায়ের আকর্ষণ আসিয়াছে, মা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময় তুমিও মায়ের ইচ্ছার অনুকূলে যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিও, স্বকীয় জীবভাবকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিও ; তবেই তোমাতে সিংহধর্ম্ম আবির্ভূত হইবে। মা তোমার অঙ্গে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়া দিবেন।

যাঁহারা বলেন—"মা যেদিন আসিবেন, সেইদিনে আমি সিংহধর্ম্মী হইব—মা যেদিন সাধনা করাইবেন, সেদিন আমি সাধনা করিব ;" বুঝিতে হইবে—তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পান্ নাই। ঐরূপ ভাব একান্ত নিন্দনীয়। জগতের সকল কার্য্য করিবার সময়—"আমি কর্ত্তা," "আমার অধ্যবসায়," এরূপভাবটী বেশ আছে ; আর কেবল মাকে স্মরণ

করিবার বেলাই, মায়ের উপর নির্ভরতা। উহা আত্মবঞ্চনা মাত্র। নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানুষই ঐরূপ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে মনকে প্রবোধ দিয়া, অন্ধ গড্ডলিকা প্রবহে পরিচালিত হয়। মনে রাখিও—দুর্ব্বলের পক্ষে আত্মলাভ একান্ত অসম্ভব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" জগতের যাবতীয় কার্য্যের প্রারম্ভেই ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়; কিন্তু সাধনারূপ কার্য্যের অবসানে, ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়। জগতের সকল কার্য্যেরই কিছু না কিছু নিষ্ফলতা আছে; কিন্তু সাধনা কার্য্যের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পর্য্যন্ত পূর্ণ সফলতাময়। "আমি সাধনা করিব," এইরূপ সাধু সঙ্কল্পটি পর্য্যন্ত নিষ্ফল হয় না। তাই বলিতেছিলাম—জীব। তুমি সিংহধর্ম্মী হও, মা তোমাতে অধিষ্ঠিতা হইবেনই। তুমি "বনেষু হুতাশন ইব" অসুর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে থাক।

এই মন্ত্রস্থ দৃষ্টান্তটী বড় সুন্দর। অরণ্যস্থ শুষ্ককাষ্ঠ সমূহের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে সমুদয় বনকেই ভস্মীভূত করে। বনই বনকে দগ্ধ করে। তুমিও নিজেই নিজেকে হিংসা করিতে থাক। তোমার এই জীবভাব, এই অসুরভাব, এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার, ইহার প্রতি নিজেই হিংসাপরায়ণ হও। ইহাই তোমার কার্য্য। ইহাই তোমার স্বধর্ম্ম। গীতায় যাহাকে স্বধর্ম্ম বলা হইয়াছে, দেবী-মাহাত্ম্য তাহাই দেবীর বাহন সিংহরূপে উক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব সাধকগণের একান্ত উপাদেয়।

—০—

নিঃশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫১॥

অনুবাদ। অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নিশ্বাসগুলিই তৎক্ষণাৎ শত সহস্র গণ (অসুর নিধনকারী গণনামক সৈনদল) রূপে সম্ভূত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মা স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা, ইহা আত্মসমর্পণকারী সাধকেরই উপলব্ধিযোগ্য। পূর্ব্বে অনেকবার এ কথা বলা হইয়াছে। মাতৃ-নিশ্বাস সেই আত্মসমর্পণের চরম লক্ষণ। সাধক যখন প্রতিকর্ম্মে মাতৃপ্রেরণা মাত্র দেখিতে পায়, তখন ধীরে ধীরে এই অম্বিকার নিশ্বাসরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত আমার নহে, উহা মায়ের। মা আমার অন্তরে প্রাণময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিতা রহিয়াছেন; তাহারই বহির্লক্ষণ—শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন ক্রিয়া। নিশ্বাস বলিয়া—সামান্য বায়ুপ্রবাহ বলিয়া, আমরা যাকে উপেক্ষা করি; উহাই যে মাতৃ-নিশ্বাস! ওগো তোমরা মাকে অন্বেষণ করিতে কোথায় ধাবিত হও? দেখ চাহিয়া—তোমার নাসাপুট হইতে যে প্রাণন ক্রিয়া হইতেছে, ঐ উহাই ত মায়ের সত্তা বলিয়া দিতেছে। ঐ যে মা, ধর উহাকে। উহারই গতি লক্ষ্য করিয়া মা মা বলিয়া ডাক; মায়ের সন্ধান পাইবে, মা ধরা দিবেন। বিনা রোধে বায়ু কুম্ভকে স্থির হইয়া যাইবে, চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে—যথার্থ স্থৈর্য্য ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়া জীবন ধন্য হইয়া যাইবে! কিন্তু সে অন্য কথা—

সাধারণতঃ নিশ্বাসই চিত্তবিক্ষেপের বহির্লক্ষণ। চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত, তাহা শ্বাসের গতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তাই অধিকাংশ যোগী বহিঃপ্রাণায়ামের সাহায্যে বিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা করেন। পূরক রেচক কুম্ভক অভ্যাস করিয়া, শ্বাসের গতিকে সংযত করেন! চিত্তকে স্থির করিবার জন্য এই সকল অতি স্থূল উপায়। উহা দ্বারা চিত্ত স্থির হইতে পারে, কিন্তু আত্মলাভ হয় না। কারণ বহুদিন ঐরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রশান্ত ভাবটিই যোগীর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। যদিও প্রশান্তচিত্ততা আত্মলাভের বহির্লক্ষণ, তথাপি মনে রাখিও—চিত্ত প্রশান্ত হইলেই আত্মলাভ হয় না। যে আত্মাকে চায়—বরণ করে, মাত্র সেই তাহাকে পায়। তাই শ্রুতি বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ।" যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। "যেযথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। তুমি

চিত্তস্থৈর্য্য চাও—তাহাই পাইবে। মা যে আমার কল্পতরু! মাকে পাইলে চিত্ত যে স্বতঃই প্রশান্ত হয়, ইহা না বুঝিয়া, কৌশলের সাহায্যে শ্বাস রুদ্ধ করিলে, কদাপি অজ্ঞান দূর হয় না, অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং যাহারা বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত নহে, এরূপ গৃহস্থ লোকের পক্ষে, ওরূপ হঠ প্রাণায়াম অনেক স্থলেই যে যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের হেতুস্বরূপ হইয়া পড়ে ইহাও অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

সে যাহা হউক, নিশ্বাসগুলিকে অম্বিকার—মায়ের নিশ্বাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, উহারা গণসৈন্যরূপে অসুরনিধন উদ্দেশ্যে মাতৃসহায়তাকল্পে দণ্ডায়মান হয়। নিশ্বাসগুলি যে মায়ের, ইহা বুঝিবার উপায় কি? যে নিশ্বাস মায়ের, তাতে কিছু না কিছু মাতৃ-চিহ্ন থাকিবেই। ঐ চিহ্ন—মাতৃ-নাম, প্রণবাদি মন্ত্র। শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ যাহাদের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের ঐ জপই আসুরিক বৃত্তি দমনের পক্ষে বিশেষ সহায়। যখন দেখিতে পাইবে—তোমার নিশ্বাসগুলি মাতৃ-নামসহ আসিতেছে, তখনই বুঝিতে পারিবে—অম্বিকার নিশ্বাসগুলি কিরূপে গণসৈন্য হইয়া অসুরনিধন করে। পরবর্ত্তি-মন্ত্রে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

আর একটি কথা—নিশ্বাসকে মাতৃ-নিশ্বাসরূপে উপলব্ধি করাই যথার্থ আত্মসমর্পণ। আমার বলিতে কিছুই যে নাই, নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত মা তোমার, আমার আমিই যে তুমি গো, আমার আমি-রূপে তুমিই ত নিত্য বিরাজিত। আমি-রূপী তোমারই নিশ্বাস এই নাসাপুটে প্রবাহিত হইতেছে। হে আমার আমি! হে আমার আমি! ওঃ কি আনন্দ! কি সত্য! কি অমৃত! ওগো অমৃতের পুত্রগণ! একবার এই সত্য উপলব্ধি কর। তোমার পায়ের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, কি সুখময় অমৃতময় মধুময় স্পর্শে সঞ্জীবিত পুলকিত হইয়া উঠিবে! সে আনন্দ ধরিয়া রাখিবার স্থান নাই। এত মহান্ এত ঘন, এত নিবিড়। একবার দেখ দেখি—তোমার আমিটাই মা, একবার অনুভব কর দেখি—তোমার এই নিশ্বাসগুলি তোমার

নহে, তোমারই অন্তরস্থ তাঁর ; দেখিবে—আমিত্ব কোথায় পলায়ন করিয়াছে। যে আমিত্বকে লয় করিবার জন্য কত জন্মব্যাপী প্রাণপাত কঠোর তপস্যা ; সেই অমিত্বের লয় কত সহজে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। যে গূঢ় রহস্য মা আজ অকপটে চক্ষুর জলের সহিত বড় আদরের সন্তানগণের সম্মুখে ধরিলেন—তাহা যেন অনাদৃত, উপেক্ষিত ও বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া, হাটে মাঠে বিক্রীত না হয়। দেখিও যেন কেহ মায়ের প্রাণে ব্যাথা দিও না।

———

যুধুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ॥ ৫২॥

অনুবাদ। তাহারা (সেই গণ নামক সৈন্যদল) দেবীর শক্তিতে বর্দ্ধিত-পরাক্রম হইয়া, পরশু ভিন্দিপাল অসি এবং পট্টিশ দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করতঃ যুদ্ধকরিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যতদিন নিশ্বাসগুলিতে আমার বলিয়া অভিমান থাকে, ততদিনই উহারা নির্ব্বীর্য্য ; পরন্তু পলে পলে মৃত্যুর করাল কবলে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করে। আর যখন মাতৃনিশ্বাসরূপে প্রতীতি-যোগ্য হইতে থাকে, তখন উহারা "দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ" মাতৃ-শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, অমিতবীর্য্যে অসুরসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অমরত্বের সন্ধানে ধাবিত হয়। ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে—সত্যই নিশ্বাসগুলিকে মাতৃ-নিশ্বাস বলিয়া ধরিতে—বুঝিতে পারিলে, আসুরিক বৃত্তির দমন এবং মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়। ইহা বহুধা পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য। সে যাহা হউক, নিশ্বাসগুলি যে মায়ের, তাহা বুঝিবার উপায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জপ। মৃত জপ নহে—চৈতন্যময় জপ—চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র-জপ। এ জপ, করিতে হয় না ; আপনি হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ চেষ্টা করিয়া করিতে হয় না, ইহাও সেইরূপ বিনা চেষ্টায় নিষ্পন্ন হয়। একদিনে না হইতে পারে

প্রথম কয়েকদিন একটু যত্নের সহিত অভ্যাস করিলেই জপ স্বাভাবিক হইয়া যায়। আত্মসমর্পণ এবং মন্ত্রচৈতন্য উভয়ের সার্থকতা, এই মাতৃ-নিশ্বাসের উপলব্ধিতেই সর্ব্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—সর্ব্ববিধ সাধনার উহাই মেরুদণ্ড। ঐ দুইটী মুলধন লইয়া অবতীর্ণ হইলে, সকল সাধনাই অচিরে সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

সন্নাসিগণও আত্মসমর্পণ সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য অজপা অর্পণরূপ একটি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহার সারমর্ম্ম এইরূপ—আমরা অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয়শত অজপা অর্থাৎ—"হংসঃ"—মন্ত্র জপরূপ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকি। উহাই আমার আমিত্ব। বাস্তবিকই জীবভাবীয় আমিত্বকে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, কতকগুলি শ্বাস প্রশ্বাসের সমষ্টিমাত্র পাওয়া যায়। ঐ সমষ্টি-সংখ্যাকে কতিপয় অংশে বিভক্ত করিয়া গুরু গণেশ শিব বিষ্ণু প্রভৃতির উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত অর্পণ করিয়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা, সুতরাং আমি বলিয়াও আর কিছুই রহিল না। শেষে একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মসত্তাই রহিয়া গেল। এই অনুষ্ঠানটী অনেক স্থলেই মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মাত্র এরূপ কয়েকটি মন্ত্র পাঠের দ্বারা কতদিনে যে আমিত্ব লয় হয়, তাহা বলিতে পারি না। তবে এইরূপ মাতৃ-নিশ্বাসের উপলব্ধিতে যে অচিরেই আমিত্ব লয় হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

আমিত্ব লয় শব্দে কেহ এমন মনে করিওনা যে, "আমি থাকিব না"। স্মরণ কর—প্রথম খণ্ডে লণ্ঠনের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—বহু আমি বাস্তবিক নাই। এক আমিই, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে গিয়া, বহু আমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে ঐ অজ্ঞান-কল্পিত আমিত্বকে বিলয় করিতে পারিলেই, আমির প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে। যাহা যথার্থ আমি, যিনি এক আমি, তিনি—সেই আত্মা, মা আমার নিত্যই যে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহা উপলব্ধিযোগ্য হইয়া থাকে।

ভগবদ্‌গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞাদিও এই আত্মসমর্পণেরই ক্রম মাত্র। জীবের যখন একটু একটু করিয়া ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাস আসিতে থাকে, তখন হইতে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ—ভগবৎ উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ আরম্ভ হয়, আমিকে অর্পণ করিবার ইহাই পূর্ব্ব লক্ষণ। এইরূপ কিছুদিন করিবার পর, জীব আর মাত্র দ্রব্য অর্পণ করিয়া তৃপ্তি পায় না, একটু একটু করিয়া সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করে, উহার নাম তপোযজ্ঞ। ইহার উদ্দেশ্য—আমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। যখন দেখিতে পায়—আমি বড় মলিন—অতিশয় বিষয়াসক্ত, এ অপবিত্র আমিকে লইয়া, সে পরম পবিত্রের চরণে অর্পণ করা যায় না, তখনই তপস্যা দ্বারা আমিকে পবিত্র করিতে প্রয়াস পায়। একটু পবিত্র হইলে—তবে যোগযজ্ঞের অধিকার হয়। তখন ভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এ অবস্থায়ও আমিটি পৃথক্ থাকিয়া যায়। কিছুদিন ভগবানের সহিত যোগ বা মিলন সংঘটিত হইলে, ভালবাসা আসক্তি বা ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রেমে পরিণত হয়—তখনই স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বরূপের অধ্যায় বা উপলব্ধি হয়। এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ মহাজ্ঞান অধিগত হইয়া থাকে। প্রেমে আত্মহারা হওয়ার নামই যথার্থ আত্মদান। এইরূপ আত্মদানের নামই অমিত্ব-বিলয়। ইহাই সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" মন্ত্রের চরম সার্থকতা।

ভাবিও না, এইরূপ আত্মদান করিতে পারিলেই আর কখনও জীব-ভাবীয় আমিত্বের স্ফুরণ হইবে না। ভগবান্ তোমার আমিকে আবার তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তিনি একবার একবার তোমাকে আত্ম-হারা করিয়া আপন বুকে মিলাইয়া লইবেন, আবার তোমার আমি তোমারই কাছে ফিরিয়া যাইবে। তখন সে আমি, বড় সুন্দর! বড় পবিত্র। বিন্দুমাত্র অভিমান নাই। বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই! তখন সে আমি, সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তখন সে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই করুক, অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যই

অবলম্বন করুক, সকল অবস্থাতেই ভগবৎশক্তি-বিকাশের যন্ত্ররূপে পরিচালিত হইতে থাকে। ইহাই আত্ম সমর্পণের চরম লক্ষণ।

সে যাহা হউক, মাতৃ-শক্তিতে শক্তিমান্ গণসৈন্যসমূহ, অর্থাৎ প্রণবাদি মন্ত্রময় নিশ্বাসগুলি ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র-প্রয়োগে অসুর-বল ক্ষয় করিতে লাগিল। ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। যদিও ঐ অর্থ অসুর পক্ষেই প্রযুজ্য তথাপি তৎপরবর্ত্তী "নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী" ইত্যাদি মন্ত্রে, মাতৃপক্ষেও ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগের রহস্য বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ নিশ্বাস যে চিত্ত-বিক্ষেপের চিহ্ন, অর্থাৎ অসুরভাবেরই পরিপোষক, ইহা পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু যখন এই নিশ্বাস মাতৃনামময় হয়, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র জপময় হইয়া, মাতৃ-নিশ্বাসরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই উহা আসুরিকভাবের বিঘাতক হয়। ইহাই গণসৈন্যবৃন্দের অসুর-নাশ।

সাধক! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিও—তোমার চিত্ত যখন নানারূপ বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত হয়, আসুরিক ভাবগুলি যখন একটার পর একটা অসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে, তখন তোমার নিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিও। নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন জপ চলিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে বোধ করিবে—তোমারই অন্তরস্থ মায়ের নিশ্বাস তোমার নাসাপুট দিয়া যাতায়াত করিতেছে। দেখিবে—অনতিবিলম্বে আসুরিক ভাব প্রশমিত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত হইবে। এসকল ক্রিয়ার ফল তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে।

অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে॥ ৫৩॥

অনুবাদ। সেই যুদ্ধমহোৎসবে গণসৈন্য সমূহের কেহ কেহ পটহ, কেহ বা শঙ্খ, অপর সকলে মৃদঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রেও একপ্রকার সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। শ্বাসের গতি ধরিয়া কর্ণবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক, অনাহত চক্রে গমন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই পটহ শঙ্খ ও মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ঝিল্লী ভেক মেঘ বজ্র ও ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনিও শোনা যায়। মন্ত্রে কেবল পটহ শঙ্খ ও মৃদঙ্গ মাত্রের উল্লেখ আছে, উহারাই প্রধান। ঝিল্লি মেঘ প্রভৃতির ধ্বনি উহার অন্তর্ভুক্ত। সকল সাধকেরই একপ্রকার ধ্বনি শ্রবণগোচর হয় না। প্রকৃতিগত বৈচিত্রবশতঃ এই ধ্বনিশ্রবণেরও বৈচিত্র হয়। তবে উল্লিখিত প্রকারের ধ্বনিগুলি অধিকাংশ সাধকই শুনিতে পান।

এইরূপ অনাহতস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট নাদের সহিত যখন ইষ্টমন্ত্র মিলিয়া যায়, তখনই সাধক জপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ইহাই তান্ত্রিক মন্ত্র-চৈতন্য। এই অবস্থায় আর চেষ্টা করিয়া জপ করিতে হয় না, স্বাভাবিক শক্তিবশেই জপ হইতে থাকে। এই নাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। সাধককে উন্মাদবৎ ছুটাইয়া লইয়া চলে। কোথাও কিছু নাই, অনবরত মৃদঙ্গধ্বনি বংশীধ্বনি! সে ধ্বনি কি আকর্ষণময়! যেন প্রাণটিকে টানিয়া লইয়া চলে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মূরলীধ্বনি। যাঁহার আকর্ষণে গোপিকাগণ কুল ছাড়িয়া অকুলে ভাসিয়াছিল, সত্যই গো সে ধ্বনি কুলনাশক। মানুষকে উন্মাদবৎ করিয়া তোলে। বংশী পটহ শঙ্খ মৃদঙ্গ, ইহার যে কোনও ধ্বনি প্রকৃতিগত হইলে, সাধক একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। ঐ নাদের সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলে চিত্ত আপনা হইতে প্রশান্ত হয়; বৈষয়িক চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়; সুতরাং আসুরিক অত্যাচার বিদূরিত হইয়া যায়।

তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি—কেহ মাত্র উক্তপ্রকার ধ্বনি শুনিবার জন্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করিও না। উহা সত্যলাভের অন্তরায়। নাদ শুনিলেই সত্য লাভ হয় না। সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইলে, ঐ সকল আপনা হইতেই আসিতে থাকে। তুমি

মাতৃ-আহ্বান শুনিবার জন্য কাতর প্রাণে উৎকর্ণ হইয়া অনাহত কেন্দ্রে অবধান প্রয়োগ কর—দেখিবে যথার্থই মায়ের আমার আকর্ষণময় কর্ণামৃত-রসায়ন আহ্বান আসিতেছে। আর তুমিও সেই সঙ্গে "যাই মা" "যাই মা" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে থাক। সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে—মাতৃ-লাভ আমার লক্ষ্য, পথিমধ্যে কত কি আসিবে, যাইবে, সকলই দেখিব, সকলই শুনিব, কিন্তু কোনটাতেই আসক্ত হইব না। ধ্বনি ত সামান্য কথা, নানারূপ যোগ বিভূতিতেও যেন মুগ্ধতা না আসে।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে যুদ্ধকে মহোৎসব বলা হইয়াছে। যথার্থই যে যুদ্ধে মা স্বয়ং অবতীর্ণা, যে যুদ্ধ মাতৃ-নিশ্বাসসম্ভূত গণসৈন্যবৃন্দের মৃদঙ্গাদি ধ্বনি দ্বারা মুখরিত, তাহাকে উৎসব ব্যতীত ব্যসন কিরূপ বলা যায়? সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেই আমার মুক্তি-মন্দিরের হিরণ্ময় বিজয়-কেতন নয়নগোচর হয়, যে যুদ্ধে আমার আসুরিক শক্তিনিচয় প্রলয়াভিমুখী হয়, সে যুদ্ধকে উৎসব ব্যতীত ব্যসন কিরূপে বলা যায়? সাধক! একবার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ক্ষতি কি!

ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া-শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্॥ ৫৪॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবী ত্রিশূল গদা শক্তি এবং খড়্গ প্রভৃতির প্রহারে শত শত মহাসুর নিহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। সিংহ এবং গণসৈন্যবৃন্দের যুদ্ধ-প্রণলী বর্ণিত হইয়াছে। এইবার মাতৃ-যুদ্ধের বর্ণনা হইতেছে। প্রথমেই ত্রিশূলাঘাতে অসুর নিধনের উল্লেখ আছে। ত্রিশূল কি? ত্রিপুটী জ্ঞান। জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই ত্রিপুটীই ত্রিশূল পদবাচ্য। ইহা বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের অস্ত্র। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং মহেশ্বর স্বকীয় শূল হইতে শূল নিষ্কাসনপূর্ব্বক দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুটীর সাহায্যে

কিরূপে অসুরনিধন হয়? রূপ রসাদি বিষয়, কিংবা কামাদি বৃত্তি, যখন চিত্তক্ষেত্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তখনই উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিপুটী প্রয়োগ করিতে হয়। বিষয় কিংবা বৃত্তিনিচয় যে ত্রিপুটী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচারের সাহায্যে দৃঢ় ধারণা করিতে হয়।

খুলিয়া বলিতেছি—মনে কর, তুমি কোনও কমনীয় কান্তিতে মুগ্ধ। ঐ কান্তিতে দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে থাক। এই যে কান্তি, ইহা আমারই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। আর "আমি জানিতেছি" এই আমি অংশটীর নাম জ্ঞাতা, এবং "জানিতেছি" এই অংশটির নাম জ্ঞান। ইহা একই জ্ঞানসমুদ্রের তিনটী তরঙ্গ মাত্র। প্রথম খণ্ডে "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" ইত্যাদি শ্লোকে যে সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, একবার উহার সমীপবর্ত্তী হও, অর্থাৎ বুঝিতে ধারণা কর। এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রেরই তিনটী তরঙ্গ আমার নিকট জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কি রূপ রসাদি বিষয়, কি কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, সকলই ঐ ত্রিপুটী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিচারকেই ত্রিশূলাঘাত, অর্থাৎ ত্রিপুটীপ্রয়োগ কহে। যে শক্তিপ্রভাবে জ্ঞানসমুদ্র জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিরূপে তরঙ্গায়িত হয়, ঐ শক্তিই দেবী—মা আমার। এই মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখ—দেখিতে থাক, মা একদিকে বিষয়াকারে অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; আবার অন্যদিক দিয়া স্বয়ংই ত্রিশূলাঘাতে অর্থাৎ ত্রিপুটী-প্রয়োগ রূপ বিচারের সাহায্যে, উহাদিগকে নিহত করিতেছেন। সাধক! তুমি এইরূপ ত্রিপুটী বিচার করিতেছ বলিয়া, উহাতে নিজ কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিও না। কারণ ঐ বিচারশক্তিরূপেও মা-ই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ত্রিশূলরহস্য খুব ধীরভাবে বুঝিয়া, কিছুদিন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বারংবার অনুশীলন দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লইতে পারিলে, সাধন-সমরে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

ত্রিশূলের পর গদা। গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্ত-বাক্য। ত্রিশূলাঘাতে—

ত্রিপুটী প্রয়োগে যেরূপ অসুর নিধন হয়, গদাঘাতে—ব্যক্তবাক্য-প্রয়োগে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠেও সেইরূপ অসুরবল ক্ষীণ হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত শক্তিবৃষ্টি এবং খড়্গাঘাতেও অসুরনিধনের উল্লেখ আছে। আসুরিক বৃত্তিনিচয়ও যে মহতী শক্তির বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ মাত্র, ইহা পুনঃ পুনঃ ধারণা করার নামই শক্তিবৃষ্টি। যতক্ষণ বিষয় কিংবা বৃত্তিপ্রবাহমাত্র প্রতীতিগোচর হয়, ততক্ষণ উহারা অমিতবীর্য্য অসুর। আর যখন উহাদিগকে মাতৃ-শক্তিরূপে বুঝিতে পারা যায়, তখনই ঐ শক্তিবৃষ্টির প্রভাবে অসুরবল প্রক্ষীণ হইতে থাকে। বিষয় সমূহকে সর্ব্বদা শক্তিমাত্র রূপে উপলব্ধি করার নামই শক্তিবৃষ্টি। অবশেষে খড়্গ। ইহা দ্বিধাকারক অস্ত্র। জ্ঞানই মাতৃ-হস্তস্থিত খড়্গ। একমাত্র আত্মা—মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, সেই সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, যাবতীয় অনাত্মভাব বিনষ্ট হয়। এইরূপ বিজ্ঞান-খড়্গের আঘাতে সমস্ত বৈষয়িক প্রকাশ—অসুরভাব দূরীভূত হয়। সাধক। যদি তুমি সত্য-প্রতিষ্ঠ হইয়া থাক, যদি সত্য-প্রতিষ্ঠা তোমার প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে বিষয়ের সম্মুখীন হইবামাত্রই, তোমার জ্ঞান উহাকে সত্যরূপে—মা রূপে গ্রহণ করিবে, ইহাই অসুরগণের উপর জ্ঞান-খড়্গের আঘাত। এইরূপে শত শত অসুর নিহত হইয়া থাকে।

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধ্বা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুরকে মা ঘণ্টাধ্বনিতে বিমুগ্ধ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। অপর কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। ঘণ্টাধ্বনি—অনাহত নাদ। গণসৈন্যবৃন্দের যুদ্ধে পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি ধ্বনি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঘণ্টাধ্বনি তাহার অন্যতম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের ঘণ্টা হইতে এই ঘণ্টা আনয়ন

পূর্ব্বক দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। বিক্ষেপ-নিবারণ ও একাগ্রতা-সাধন পক্ষে এই ঘণ্টাধ্বনি অতি সহজ উপায়। দূর হইতে কোনও বৃহৎ ঘণ্টা ধ্বনিত হইলে, টম্‌ম্‌ম্‌ এইরূপ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ঐরূপ দীর্ঘ প্লুতস্বরে ম্ কারের ধ্বনির ন্যায় একটি ধ্বনি অনাহত হইতে উত্থিত হয়। উহা এত মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, আর বাহ্যবিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে চায় না। ঐ ম্‌ম্‌ম্‌ ধ্বনির সহিত প্রণবাদি মন্ত্র যোগ করিয়া লইলেই স্বাভাবিক জপ হইতে থাকে। ঐরূপ জপে চিত্ত একান্ত মুগ্ধ থাকে; সুতরাং আসুরিক ভাবসমূহের আত্মবল প্রকাশের সুযোগ থাকে না।

এতদ্‌ভিন্ন মা আর একটী অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, উহার নাম পাশ। মা আমার অপর কতকগুলি অসুরকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন—নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। সমুদয় অসুরকে নিহত করিলে, মায়ের আনন্দলীলা চলে না; তাই কতক-গুলিকে লীলার সহায় স্বরূপ মনে করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন শোন—রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিলে, আর সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তিই হইতে পারে না; তাই যে পরিমাণ রজঃশক্তি বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, সেই পরিমাণ শক্তিকে আসুরিক ভাব হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইতে হয়। আরও দেখ, চিত্তের যাবতীয় বৃত্তিকে একেবারে নিরুদ্ধ করিলে জগদ্‌ব্যাপারই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাই উহাদিগের সকলকেই বিনষ্ট না করিয়া কতকগুলিকে বশীভূত করিয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ জীব ইন্দ্রিয়বৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, ইহাই অসুরের অত্যাচার। ইন্দ্রিয় জয় করাই যথার্থ অসুরবিজয়। নানা উপায়ে উহা সিদ্ধ করিতে হয়। কেবল অস্ত্রাঘাত—কেবল সংযম দ্বারা উহা সুসিদ্ধ হয় না। কখনও বা উহাদিগকে সাত্ত্বিক ভোগের মধুর আস্বাদ বুঝাইয়া দিয়া, সাধনার সহায়রূপে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাই পাশবন্ধন-পূর্ব্বক অসুর আকর্ষণের রহস্য।

এই মন্ত্রে আর একটি শব্দ প্রণিধানের যোগ্য। ঐ শব্দটি

"ভুবি"। ভূ বা ক্ষিতিতত্ত্বের কেন্দ্র মূলাধার চক্র। রজঃশক্তির যে অংশ সত্ত্বগুণের উদ্বোধক, উহার স্থান মূলাধার। এই স্থানে সংযম প্রয়োগ করিলে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলভাব প্রত্যক্ষ হয় উহাই মাতৃস্নেহ-পাশে আবদ্ধ অসুর।

———

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, কতকগুলি নিপাতের দ্বারা বিপোথিত, অপর কতকগুলি গদাঘাতে ভূমিতলে শায়িত হইল।

ব্যাখ্যা। এক্ষণে অসুর-সমূহের দুরবস্থার কথা বর্ণিত হইতেছে। কতকগুলি আসুরিক সংস্কার জ্ঞান-খড়্গের আঘাতে দিখণ্ডিত হইল। অপর কতকগুলি আসুরিক সংস্কারকে, নিপাতের দ্বারা অর্থাৎ আছাড় মারিয়া বিপোথিত করা হইল; ইহাদের আর কোন চিহ্নই রহিল না, অর্থাৎ অব্যক্তে মিলাইয়া গেল। আর কতকগুলি গদাঘাতে অর্থাৎ চৈতন্যময় মন্ত্র জপ বা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠের সাহায্যে ভূমিশায়ী হইল—ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ মূলাধারে সূক্ষ্ম বীজাকারে সত্ত্বগুণ উদ্বোধের সহায়রূপে অবস্থান করিতে লাগিল।

———

বেমুশ্চ কেচিদ্ রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর মুষল প্রহারে অত্যন্ত আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কতকগুলি বক্ষে শূলবিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। রুধির-বমন অর্থে শক্তিহীন হওয়া। যে শক্তিপ্রভাবে চিত্তক্ষেত্রে রাজসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সেই শক্তির নাম রুধির। রজোগুণ রক্তবর্ণ। রজঃশক্তিই রুধির। সুতরাং রুধিরবমন শব্দের অর্থ—রজোগুণের শক্তিহীনতা। শূল—ত্রিশূল। ইহার অর্থ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ভূমিতলে নিপতিত হইল, বাক্যটির তাৎপর্য্য—আসুরিক সংস্কারসমূহ মাতৃ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে, দগ্ধবীজবৎ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তিহীন হইয়া, মূলাধারে অবস্থান করিল। যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন উহারা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তবে থাকিয়াও আর সাধারণ জীবের ন্যায় মায়ের সন্তানকে শোক মোহাদি দ্বারা অবসন্ন করিতে পারে না।

———

নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর সেই রণাজিরে—সমরাঙ্গনে (দেবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত) শরসমূহের দ্বারা এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাদের দেহ নিরন্তর হইয়াছিল। অর্থাৎ তাহাতে তিল ধারণের যোগ্য স্থানও ছিল না। অমরবৃন্দের উৎপীড়ক অসুর-সেনাপতিগণ এইরূপভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যখন অসুরবল সাধকের প্রশান্তচিত্ততার ব্যাঘাত ঘটাইতে থাকে, যখন সাধকের চিত্তক্ষেত্র সমরাঙ্গনে পরিণত হয়, তখন আসুরিক বৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুনঃ শর প্রয়োগ করিতে হয়। প্রণবাদি মন্ত্র অর্থাৎ মাতৃ-আহ্বানই উপনিষদাদি শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য শর। মা মা মা, এই তুমি, এই তুমি, এত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি লইয়া আমার বুকের ভিতর অসিয়া দাঁড়াইয়াছ! মা মা, তুমি যে মা। কেন এরূপভাবে আসিয়া আমায় উৎপীড়িত করিতেছ? মা মা তুমি স্থিরা প্রশান্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। মা মা মা! এমনই করিয়া

পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপ করিতে হয়, যেন তিলমাত্র সংস্কারের অবকাশ না থাকে। এত ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে হয়, এত ঘন ঘন ব্রহ্মলক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতে হয়, যেন একটুও ফাঁক না থাকে, 'নিরন্তরাঃ শরৌঘেন' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ করিতে পারিলেই ত্রিদশার্দ্দনগণ অর্থাৎ সাধকের দেবভাবনাশক আসুরিক শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সাধক প্রতিদিনই এইরূপ উপায়ে অসুর বিজয় হয় কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ বিফলতা আসিতে পারে, কিন্তু পরিণামে জয় লাভ সুনিশ্চিত।

———

কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুরের বাহু ছিন্ন হইল, কতকগুলির গ্রীবা এবং কতকগুলির মস্তক ছিন্ন হইল। অপর কতকগুলির মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইল।

ব্যাখ্যা। বাহুচ্ছেদ শব্দে—গ্রহণ-শক্তির অপলাপ। আসক্তি সম্ভূত রূপ রসাদি বিষয় গ্রহণের অভিলাষ দূর হওয়াই অসুরের বাহুচ্ছেদ। গ্রীবাচ্ছেদ শব্দে শব্দোচ্চারণ শক্তি-হীনতা। শব্দকে আশ্রয় করিয়াই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। শব্দ না থাকিলে ভাব ফুটিতে পারে না। এ সকল বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাব বা সংস্কারসমূহের মূলীভূত উপাদান শব্দ। এই শব্দের উৎপাদনশক্তি রহিত হওয়াই কণ্ঠচ্ছেদ পদের তাৎপর্য্য। মধ্যদেশ বিদীর্ণ হওয়া অর্থে কার্য্যোৎপাদন শক্তিহীনতা। কার্য্যশব্দে এস্থলে আসুরিক ভাবমূলক কার্য্যই বুঝিতে হইবে। কার্য্যমাত্রেরই তিনটী অবস্থা। প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, মধ্যক্ষণে স্থিতি এবং অন্তক্ষণে লয়। আসুরিক সংস্কারসমূহের মধ্যদেশ বিদীর্ণ হওয়া অর্থে কার্য্যের স্থিতিভাব

বিনষ্ট হওয়া বুঝিতে হইবে। স্থিতিভাব বিনষ্ট হইলে কার্যের উৎপত্তি ও লয় সুতরাং বিলয় প্রাপ্ত হয়।

বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ॥ ৬০॥

অনুবাদ। অপর অসুরগণের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা ভূমিতলে নিপতিত হইল। কতকগুলি অসুর দেবীকর্ত্তৃক এরূপভাবে দ্বিখণ্ডিত হইল যে, এক এক খণ্ডে একটি বাহু একটি অক্ষি ও একখানি মাত্র চরণ থাকিল, অর্থাৎ মস্তকের মধ্যেভাগ হইতে পায়ু স্থান পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইল।

ব্যাখ্যা। জঙ্ঘাচ্ছেদ শব্দে গতিশক্তি-হীনতা। সংস্কারসমূহের যে মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলতা, তাহাই গতিশক্তি নামে অভিহিত। সংস্কার মাত্রেরই একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে, ঐ মূর্ত্তি ভাবময়ী। অভিলাষ বা গ্রহণ উহার বাহু, প্রকাশ উহার অক্ষি এবং গতি উহার চরণ। উহাদিগকে শিরোদেশ হইতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, সংস্কারের বিশিষ্টমূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপ করার ফলে উহাদের পুনরায় ফলোৎপাদনশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যেরূপ ঋণতড়িৎ এবং ধনতড়িৎ নামক পরস্পর বিরোধী শক্তিদ্বয় সম্মিলিত হইলে বৈদ্যুতিক কার্য্য উৎপন্ন হয়, যেরূপ পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির বিকাশস্বরূপ দক্ষিণ ও বামার্দ্ধ দেহ ভাগদ্বয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমাদের এই ভোগায়তন ক্ষেত্র দেহটি প্রস্তুত হয়, ঠিক সেইরূপই আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপ পরস্পরবিরোধী শক্তিদ্বয়ের সম্মেলনেই ভাব বা সংস্কারসমূহ ফুটিয়া উঠে। ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ নিধনের প্রণালী অনুসারে যদি উক্ত শক্তিদ্বয়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, তবে আর উহাদের কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্য থাকে না। অসুর-সমরে অবতীর্ণা মা-ও কতকগুলি অসুরকে ঠিক

সেইরূপভাবেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, উহাদের কার্য্যোৎপাদনশক্তি সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ।
কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ॥ ৬১॥
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ।
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ॥ ৬২॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ॥ ৬৩॥

অনুবাদ। অপর কতকগুলি অসুর ছিন্নশির হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল, এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক কবন্ধরূপে পুনরুত্থান করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি কবন্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে তূর্য্যধ্বনির তান লয় অনুসারে নৃত্য করিতে লাগিল। অন্যান্য মহাসুরগণ খড়্গ শক্তি ও ঋষ্টি অস্ত্র (উভয়তোধার খড়্গবিশেষ) হস্তে ধারণপূর্ব্বক দেবীকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" (থাক থাক) বলিতে বলিতে দেবী কর্তৃক ছিন্নশির হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। কতকগুলি আসুরিক সংস্কার এমনই দুরপনেয় যে, উহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিলেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় না। মায়ের কৃপায় যে সকল সাধকের আসক্তির মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, "যথার্থই এ জগতে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য কিছুই নাই," এরূপ দৃঢ় জ্ঞানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ সাধকগণও মধ্যে মধ্যে কবন্ধ অসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া থাকেন। উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পদস্খলন, পরাশরের চিত্তচাঞ্চল্য, দুর্ব্বাসার প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়, উহার সকলই মস্তকবিহীন অসুরের যুদ্ধ বা অত্যাচার মাত্র। নবম অবতার বুদ্ধদেবের উপরও মায়ের অত্যাচার হইয়াছিল। বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাসের ফলেই এরূপ হইয়া থাকে। উহাতে মাতৃলাভের কোনও

ব্যাঘাত হয় না। কত শত সমুন্নত সাধক মহাপুরুষদিগের নামেও সত্য মিথ্যা কত রকম দুর্ব্বলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, উহাতে বিস্মিত বা শ্রদ্ধাহীন হওয়ার কোনও হেতু নাই। কারণ ওসকলই ছিন্নশির কবন্ধ অসুরের সাময়িক অত্যাচার মাত্র। মায়ের লীলাবৈচিত্র্যের অনুধাবন যে মানব-বুদ্ধির অতীত, এ সকলও তাহারই প্রমাণ মাত্র। যাঁহারা যথার্থ কল্যাণকামী পুরুষ, তাঁহাদের সাময়িক দুর্ব্বলতায় কিছুই ক্ষতি হয় না। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি!" কল্যাণকারী কোনও ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং সাধারণ চক্ষু লইয়া কেহ সাধু মহাপুরুষগণের দুর্ব্বলতার বিচার করিতে যাইও না। যাহা সাধারণ জীবের চক্ষুতে দোষ বা দুর্ব্বলতা, হয়ত মহাপুরুষদিগের পক্ষে তাহার মধ্যেও কোনও গভীর রহস্য নিহিত আছে। মা কখন কোথায় কিরূপ ভাবে খেলা করেন, তাহা নির্ণয় করা সাধারণ বিবেক-শক্তির কার্য্য নহে।

কতকগুলি অসুর রণবাদ্যের তান লয় অনুসারে নৃত্য করিতেছিল। যখন সাধকের বাহ্য-বিষয় গ্রহণ জন্য চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়, তখনও অন্তরে বৈষয়িক সংস্কার ফুটিয়া উঠিতে থাকে। যদিও উহারা স্থূলে আসিয়া কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, (কারণ আসক্তিহীন হওয়ায় মস্তকহীন হইয়াছে) তথাপি মানসিক ভাবরূপে আসুরিক সংস্কারসমূহ নৃত্য করিতে থাকে; সাধক মাত্রেই উহা অনবরত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। গীতায় যাহাকে, "মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে" বলা হইয়াছে, দেবী মাহাত্ম্যে তাহাই কবন্ধ অসুরের নৃত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সকল সাধককেই প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিতে হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযম স্থির হইলে তখন দেখিতে পায় যে, অন্তরেন্দ্রিয় এখনও সংযত হয় নাই। যাহা কর্ম্মের দ্বারা অনুষ্ঠান করি না, অবলীলাক্রমে তাহা মনের দ্বারা চিন্তা করি ইহাকেই মিথ্যাচার কহে। এই মিথ্যাচার অবলম্বন ব্যতীত কেহই সত্য আচারে উপনীত হইতে পারে না। যাহারা যথার্থ সত্য

আচারে অধিষ্ঠিত, তাহাদের সকলকেই এরূপ মিথ্যাচারের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে। ইহাই ছিন্নশির অসুরগণের নৃত্য। আসক্তি নাই, অনুষ্ঠান নাই, তথাপি চিত্তক্ষেত্রে আসুরিক সংস্কার ফুটিয়া উঠে। উহারা তূর্য্যধ্বনির তানে তানে নৃত্য করে। প্রণবাদি মন্ত্রজপই রণবাদ্য। সাধক! তুমি হয়ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছ, আর অন্তরে নানারূপ বৈষয়িক ব্যর্থ সংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার জপও চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অসুরের নৃত্যও চলিতেছে। এ অবস্থায় আসিয়া কেহ হতাশ হইও না, রণবাদ্য বন্ধ করিও না যতই নৃত্য করুক না কেন, মনে রাখিও উহারা কবন্ধ অসুর। অচিরেই উহাদের তাণ্ডব নৃত্য প্রশমিত হইবে। শুধু মায়ের দিকে তাকাইয়া থাক। আপনাকে মিথ্যাচারী বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ঐরূপ মিথ্যাচার করিয়াই সত্যাচারে উপনীত হইতে হয়। ঐ মিথ্যাচার—ঐ মস্তক-বিহীন অসুরের নৃত্য, ও সকলই মায়ের ছদ্মবেশ—মায়ের লীলামাত্র। সুতরাং নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া কখনও আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিও না।

আর কতকগুলি মহাসুর খড়্গাদি অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দেবীকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে বলিতে দেবী কর্তৃক ছিন্নশির হইল। কোন বলবান্ শত্রুকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া আত্মগোপন করিবার সময় দুর্ব্বল ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষকে বলিয়া থাকে "আচ্ছা থাক্ থাক্—আবার দেখা যাইবে।" উহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এক্ষণে আমি তোমার কিছু অনিষ্টসাধন করিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে উপযুক্ত দেশ কাল ও পাত্রের সমবায় ঘটিলে, পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিব। সত্যসত্যই কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির সংযম দ্বারা সংস্কারসমূহের প্রবুদ্ধ ভাব মাত্র তিরস্কৃত থাকে, আবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহারা কর্ম্মরূপে ফুটিয়া উঠে। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ" ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা বিষয়গ্রহণ নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু "রসবর্জ্জং" অনুরাগটি থাকিয়া যায়। সুযোগ পাইলেই অর্থাৎ দৈবাৎ সংযমের একটু শিথিলতা আসিলেই আসুরিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই ভাবকে

লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে দেবীকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে সাধক কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ নহে, সে যে মাতৃ-চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এখানে মা স্বয়ং তাহাদিগকে ছিন্নশির করিয়া দিলেন। পুনরায় কার্য্যোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" পরমাত্মাকে দেখিলেই বিষয়ানুরাগ সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। এখানে সাধক সর্ব্বত্র সত্য-প্রতিষ্ঠায়—মাতৃ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ। অনুরাগ মাতৃ-চরণে—পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিষয়ের প্রতি অনুরাগের অবকাশ নাই ; তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে বলিতেই মহাসুরগণ দেবীকর্ত্তৃক ছিন্নশির হইল।

———

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। যে ভূভাগে সেই মহারণ সংঘটিত হইয়াছিল, নিপতিত রথ, হস্তী, অশ্ব এবং অসুরসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সেই বসুন্ধরা অগম্য হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা॥ যথার্থই সাধকের চিত্তক্ষেত্র এইরূপ অগম্য হইয়া উঠে। যদিও ইহা বসুন্ধরা, যদিও অনন্ত রত্নরাশির আকর, যদিও উহা সিদ্ধি, শক্তি, শান্তি প্রভৃতি বসুকে ধারণ করে, তথাপি এখন অসুরগণের শব-দেহে সে স্থান অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন আসুরিক সংস্কারের শেষ—(শবদেহগুলি) সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত না হয়—ততদিন চিত্তক্ষেত্র—বসুন্ধরায় লুক্কায়িত রত্নরাশি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। শরীরস্থ যে সকল স্থূল যন্ত্রাদির সাহায্যে আসুরিক সংস্কারসমূহ উদ্বুদ্ধ হইয়া সুভাবকে বিধ্বস্ত করে, তাহাই রথ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি আসুরিক শক্তির পরিচালক যান-বাহনাদি। আসুরিক শক্তি বিলীন হইয়াছে, অথচ তাহার স্থূল অংশ এখনও অবশিষ্ট ; তাই চিত্তক্ষেত্র এখনও প্রশান্ত হয় নাই, তাই সাধক

এখনও চিত্তের গভীর তলদেশে অবগাহন করিয়া সিদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি রত্নসমূহ অন্বেষণ করিয়া পায় না। আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—যেরূপ বহুদিনের ক্ষতরোগ আরোগ্য হইলেও দাগ অর্থাৎ ক্ষতচিহ্ন সহসা মিলাইয়া যায় না, সেইরূপ মাতৃ-কৃপায় চিত্তের রাজসিক-চাঞ্চল্য উপশান্ত হইলেও, অসুরের শবদেহরূপ সংস্কারের অবশেষ একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হয় না। সাধকগণ ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। চিত্তের বহির্মুখী আসক্তি বিলয় প্রাপ্ত হইলেও বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ উহার ভাবময় স্বরূপ একেবারে বিনষ্ট হয় না বলিয়াই, যথার্থ প্রশান্ত স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। তাই মন্ত্রে বসুন্ধরাকে অগম্যা বলা হইয়াছে।

———

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ। সেখানে—সেই অসুর-সৈন্যমধ্যে হস্তী, অসুর এবং অশ্বসমূহের শোণিতরাশি মহানদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অসুরসমূহের মধ্যে রক্তনদী বহিয়া গেল। রক্তনদী কি? বিশুদ্ধ রজোগুণমূলক শক্তিপ্রবাহ। রক্তবর্ণই রজোগুণের বহির্বিকাশ। সমগ্র অসুরবৃন্দ এই যুদ্ধে এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটা চঞ্চলতাময় ঘোর রক্তবর্ণ শক্তিপ্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। এই সময় সাধক দেখিতে পায়—তাহার শুভ্র চিদাকাশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া শোণিতবাহী মহানদীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ অসুর-সংস্কারসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে আর বিশিষ্টভাবে অসুরগণকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ থাকে না। শুধু একটা গাঢ় রক্তবর্ণ শোণিত-প্রবাহবৎ রজঃশক্তির পূর্ণ উদ্বেলন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। মূলাধারাদি চক্রত্রয় এই সময় রক্তবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় শক্তিকেন্দ্ররূপে অভিন্নভাবে উপলব্ধিযোগ্য হয়। ইহাই, "শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ।"

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণাদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ। বহ্নি যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে তৃণকাষ্ঠসমূহের মহাস্তূপকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ মা অম্বিকাও অসুরকুলের বিপুল বাহিনীকে ক্ষণকালমধ্যে ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। ভগবদ্‌গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটী শ্লোক আছে—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। এখানেও দেখিতে পাই, মা আমার স্নেহময়ী অম্বিকামূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, যাবতীয় অসুরসংস্কারেরই ক্ষয় করিয়া দিলেন। যাহারা "জগৎ মিথ্যা" এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, জগৎ অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচারের সাহায্যে "ব্রহ্মাহমস্মি" এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানই যে সর্ব্বকর্ম্মের বিলয়সাধক, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না; তথাপি কেবল বিচারের সাহায্যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, উহা হইতে নেত্র অপসারিত করিলে, কখনও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিচারের সাহায্যে যাহার লাভ হয়, উহা জ্ঞান নয়—জ্ঞানের আভাস মাত্র। জ্ঞান মানে জানা, অনুভব করা। যে পর্য্যন্ত সে বিষয় জানা না যায়, সে পর্য্যন্ত তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই হয় না। শ্রবণ বা অধ্যয়নজ জ্ঞানে কর্ম্মক্ষয় হয় না। জ্ঞানের উপলব্ধি আবশ্যক। ঈশোপনিষদ্ বলেন—বিদ্যা এবং অবিদ্যা এতদ্‌উভয়ই মুক্তির সাধক। অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে অতিক্রম এবং বিদ্যার সাহায্যে অমৃত লাভ করিতে হয়। কর্ম্মসংস্কার অবিদ্যা—উহাকে মিথ্যা বলিয়া চক্ষু বুজিলে মৃত্যুভয় বিদূরিত হইতে পারে না। যতদিন জ্ঞানে নানাত্ব থাকিবে, ততদিন উহা জীবকে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর ভিতরে প্রেরণ করিবেই। তুমি কর্ম্মসমূহ

দেখিতেছ—বহুত্ব উপলব্ধি করিতেছ, অথচ মুখে সহস্রবার মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া আর একটা নূতন সংস্কারের গঠন করিয়া তুলিতেছ, এরূপ করিলে কখনও মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না। ঐ কর্ম্মরাশিকে ব্রহ্মময় করিতে হইবে। কর্ম্ম বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই, সবই ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। কর্ম্ম ব্রহ্মময় হইলেই কর্ম্মসংস্কার বিদূরিত হয়। এইটিই প্রথম কার্য্য। ইহাই ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপের উপলব্ধি বা অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুভয় অতিক্রম। এইটি হইলে তারপর নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি বা বিদ্যার সাহায্যে অমৃতলাভ। এইরূপে জীব যথাক্রমে অবিদ্যার ও বিদ্যার আশ্রয়ে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, অমৃতভোগের অধিকারী হয়।

এইবার দেখ মা কিরূপে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য অসুরের ক্ষয় করেন। তোমার চিত্তে অসংখ্য কর্ম্মসংস্কার ফুটিয়া উঠিতেছে, উহারাই ত অসুর। উহাদের প্রত্যেকটিকে ধরিয়া ধরিয়া মাতৃসংস্কারে পরিণত করিতে হয়। প্রত্যেক সংস্কারটিকে ছদ্মবেশী মাতৃ-মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন মাতৃ-সংস্কার ঘনীভূত হইয়া যায়, সংস্কারের আকার মাত্র থাকে, অথচ উহার সর্ব্বাবয়বই মাতৃময় হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—মা অসুরকুলকে গ্রাস করিয়া লইয়াছেন। ইহা একদিনে হয় না, দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়, ইহা যোগমার্গের কথা। কিন্তু তুমি মায়ের ছেলে, তুমি মা মা বলিয়া ডাকিতেছ, মাতৃলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ—চিন্ময়ীর বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানই তখন তোমার একান্ত অভীষ্ট, তখন চিত্তক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত অসুর বৃন্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মায়ের দিকে অচল নেত্রে তাকাইয়া থাক, আপনাকে উৎপীড়িত আর্ত্ত সন্তান বলিয়া কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাকিতে থাক, মাতৃ-মহিমায় আবিষ্ট হইতে অভ্যস্ত হও; দেখিবে—মা "ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যং ক্ষয়ং নিন্যে" ক্ষণকাল মধ্যেই তোমার আসুরিক সংস্কারসমূহের ক্ষয় করিয়া দিয়াছেন।

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। সেই সিংহও মহাগর্জ্জনপূর্ব্বক কেশর-সমূহ প্রকম্পিত করিয়া, অসুরগণের শরীর হইতে প্রাণগুলিকে যেন বিশেষরূপে চয়ন করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলিবার জন্য এই মধ্যম চরিত্র বর্ণনের উদ্যম, তাহা এইখানেই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। সাধক! এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই তোমার প্রাণময় গ্রন্থি অর্থাৎ বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে। এ রহস্য গুরুপরম্পরাগতরূপে বিনীত শ্রদ্ধাবান্ ও সত্য-প্রতিষ্ঠ সাধকেরই অধিগম্যযোগ্য। পক্ষান্তরে যাহারা ভগবৎ-সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসবান্ নহে, যাহাদের গুরুবাক্যে, বেদান্তবাক্যে অবিচল শ্রদ্ধা নাই, যাহাদের সুষুম্নাপ্রবাহ উন্মেষিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ রহস্যের আলোচনায় বিশেষ কিছুই ফল হইবে না। যাহা হউক, এস অধিকারী সাধক! আমরা আমাদের একান্ত আশ্রয় মাতৃ-চরণ অনুস্মরণপূর্ব্বক মন্ত্ররহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সচেষ্ট হই। মা, তুমি ধীরূপে উদ্‌ভাসিত হও, তোমার সাধনরহস্য তুমি বোধগম্য করাইয়া দাও। অজ্ঞানান্ধ জীবজগৎ আবার জ্ঞান ভক্তির পবিত্র আলোকে উজ্জ্বল হউক।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সিংহ অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণ চয়ন করিতে লাগিল। সিংহ—মাতৃ-শক্তিবিকাশের যন্ত্র-স্বরূপ জীব। পূর্ব্বে বলিয়াছি—সাধক যখন স্বকীয় জীবভাবের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়—যখন দেহাত্মবোধকে বিলয় করিবার জন্য যত্নবান্ হয়, তখনই জীব সিংহপদবাচ্য হইয়া থাকে। তখনই মা আমার কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণস্পর্শে তাদৃশ জীবকে ধন্য করিয়া দেন। সেই জীব তখন দেহ হইতে প্রাণের চয়ন করিতে থাকে। ইহাই সাধনা, ইহাই

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। যতদিন জীব কেবল শরীর নিয়াই মুগ্ধ থাকে, সে ততদিন সাধারণ জীবমাত্র। আর যখন শরীর হইতে প্রাণের চয়ন করে, তখন সে জীবশ্রেষ্ঠ সিংহ। শরীর—জড়, প্রাণ—চৈতন্য। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অন্বেষণ। প্রত্যেক জড় পদার্থই যে প্রাণের—চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র, ইহা ধরিয়া ধরিয়া বুঝিবার নামই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

তোমার বালক পুত্রটী আনন্দে খেলা করিতেছে, আর তুমি মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছ। একবার ভাবিয়া দেখ—কাহাকে তুমি পুত্র বলিয়া বুঝিতেছ ? কে তোমাকে মুগ্ধ করিতেছে ? পুত্রের দেহ, না প্রাণ ? দেহ নহে। যদি রক্তমাংসের পিণ্ডটাই তোমায় মুগ্ধ করিত, যদি রক্তমাংসের দেহই তোমার আত্মজ হইত, তবে গতপ্রাণ পুত্রের দেহটাকে, কেহই শ্মশানে পাঠাইয়া দিত না। তবে কে তোমার পুত্র ? ঐ প্রাণ, যে আছে বলিয়া, দেহ—প্রাণী। যাহার অভাবে শরীর শবমাত্র। সাধারণ জীব দিবারাত্রি প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের দিকে লক্ষ্যহীন হইয়া, মাত্র জড় নিয়া থাকে—শব নিয়া খেলা করে। যাহারা এইরূপ প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া—শিবকে অবমাননা করিয়া, দিবারাত্রি শব নিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গললাভ কিরূপে হইবে ? শ্মশানেই যাহাদের বাস, শ্মশানে যাহাদের রতি, অথচ যাহারা শ্মশানবাসিনী শ্যামা মায়ের দিকে লক্ষহীন, তাহারা রোগ শোক মৃত্যু হাহাকার কাতর ক্রন্দন হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ? ওগো, তোমরা কেবল নামরূপে মুগ্ধ থাকিবে—শ্মশানে বাস করিবে, আর মুখে অমৃতের কথা বলিবে, এরূপ করিলে কি অমৃত লাভ হয় বাবা ! দেখ—প্রত্যেক দেহই শ্মশান। যতদিন দেহীর দিকে লক্ষ্য না পড়ে, ততক্ষণ তুমি যে শ্মশানেই রহিয়াছ। তোমার গৃহ যতই বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হউক, যতই আলোক মালায় সুশোভিত হউক, যতই পুত্র কলত্র ভৃত্যাদির কলকোলাহলে মুখরিত হউক, যদি গৃহাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকে, তবে উহা শ্মশান মাত্র।

তোমার দেহ যতই মূল্যবান্ বসন ভূষণে সজ্জিত হউক, যতই বিদ্যা বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউক, যতই উচ্চ গৌরবের পাত্র হউক, যদি প্রাণের দিকে—মায়ের দিকে লক্ষ্য না থাকে, যদি দেহকে মাতৃ-মন্দির বলিয়া বুঝিতে না পার, তবে উহাও শ্মশান বা শবদেহ মাত্র। আরে, যে জনা তোমার বুকের ভিতরে থাকিয়া "আমি আমি" করে, যে জনা তোমার বুক থেকে নামিয়া দাঁড়াইলে ঐ কমনীয় দেহও অমঙ্গল বলিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া যাইবে, সেই মঙ্গলময়ী, সেই শ্মশানবাসিনী মাকে দেখ, প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক দেহে দেখ—চিরমঙ্গল লাভ করিবে; অমঙ্গল বলিয়া জগতে কিছুই দেখিতে পাইবে না।

যাহারা শ্মশানবাসিনীর অন্বেষণ করিতেছ, কত কঠোর যোগ তপস্যা সাধনা করিতেছ, তাহারা দেখ—তোমারই বুকের ভিতর প্রাণরূপে তিনি নিত্য বিরাজিতা রহিয়াছেন। জানা কথা বলিয়া উপেক্ষা করিও না! শ্রদ্ধার সহিত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উহারই শরণাগত হও, শ্মশানবাসিনীর সন্ধান মিলিবে। কিছু দেখিতে পাও না! কিছু বুঝিতে পার না! কাহার চরণে শরণ লইবে? ঐ যে প্রাণ বলিয়া বোধ আছে, প্রাণ বলিয়া একটা বেদন আছে—অনুভূতি আছে; যাহা সুখের সময় যেন ফুলিয়া উঠে, দুঃখের সময় যেন বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ঐ উহাকে লক্ষ্য করিয়া, উহার দিকে চিত্তের বৃত্তি প্রবাহিত করিয়া মা মা বলিয়া কাঁদ। উহারই উদ্দেশ্যে তোমার যাবতীয় ভোগ অর্পণ কর, উহারই নিকট তোমার সুখদুঃখের সকল কথা নিবেদন কর। তোমার যাবতীয় ভোগ উহারই উদ্দেশ্যে অর্পণ কর, তোমার শ্মশানবাসিনী লাভ হইবে। তুমি শ্যামা মায়ের আদর পাইয়া জীবন ধন্য করিবে।

শুন, "প্রাণ" বলিলেই একটা অব্যক্ত অথচ সত্য চৈতন্যবোধ নিশ্চয়ই তোমার বুকে ফুটিয়া উঠে। ঐ বোধকে প্রত্যেক পদার্থে লইয়া যাও। রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাণদর্শন করিতে থাক। শরীরে শরীরে প্রাণের চয়ন কর।

ইহারই নাম প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। সত্য-প্রতিষ্ঠা যেরূপ প্রথম শিক্ষার সময় নকল বলিয়া মনে হয়, ইহাও প্রথম প্রথম সেইরূপ নকল করা মাত্র মনে হইতে পারে। তথাপি ছাড়িও না। কয়েকদিন নকল করিলেই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। অথবা যাহারা সত্য-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইয়াছ, যাহাদের চিদাকাশ স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে আর নকল বলিয়া মনেই হইতে পারে না। মনে কর, একটা বৃক্ষ দেখিতেছ, সত্য-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে উহাকে সত্য বলিয়া, মা বলিয়া ধারণা করিলে। প্রাণই সেই সত্যের স্বরূপ। চৈতন্যহীন সত্য নাই, থাকিতে পারে না; প্রাণের অনুভূতি, প্রাণের উপলব্ধি কিরূপ, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। স্ব স্ব প্রাণের একটা অস্ফুট উপলব্ধি মানুষমাত্রেরই আছে। সেই প্রাণই সম্মুখস্থ বৃক্ষের আকারে দেখা যাইতেছে, এইরূপ ধারণা করিবে। বৃক্ষ দর্শনমাত্র যেন একটা প্রাণময় সম্বেদন ফুটিয়া উঠে। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থে করিতে পারিলেই বিশ্বব্যাপী একটা অখণ্ড প্রাণময় সত্তা বোধে ফুটিতে থাকিবে। ওঃ সে কি লোভনীয়! কি মধুময়! এ বিশ্ব একটা ঘন চৈতন্যময় সত্তারূপে উপলব্ধি হইতে থাকে। রূপ রসাদি বিষয় সকলের যে বিভিন্ন সত্তা, তাহা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে জগৎটাকে যেরূপ একটা ঘন সত্য পদার্থ বলিয়া মনে হয়, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে আর তাহা থাকে না। তখন জগতের পৃথক্ সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল ঘন চৈতন্য। তোমরা যে চিদ্‌ঘন শব্দটা শুনিয়া থাক, উহা যে বাস্তবিক কি বস্তু, তাহা এইখানে আসিলে উপলব্ধি করিতে পারিবে। যথার্থই উহা প্রস্তর অপেক্ষাও ঘন। এইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় যিনি সিদ্ধ, মাত্র সেই সাধকই বাহ্য পূজা অর্থাৎ প্রতিমা পূজা করিতে সমর্থ। মৃণ্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে, উহা যে যথার্থই চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, যথার্থই যে বাক্য মনের অতীতা মা আমার সন্তান-স্নেহে আকুলা হইয়া স্থূল ঘনীভূত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পূজা গ্রহণ করিয়া সন্তানকে ধন্য করিয়া

থাকেন, ইহা প্রাণ-প্রতিষ্ঠ-সাধকগণেরই উপলব্ধিযোগ্য। কিন্তু সে অন্য কথা।

যাহা হউক, সাধককে শরীর হইতে প্রাণের চয়ন করিতেই হইবে। ঐরূপ করিতে করিতেই মহাপ্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং প্রাণই যে জড়ের আকারে আকারিত, তাহারও সম্যক্ উপলব্ধি হয়। জীব! তোমার বুকের ভিতর যে একটুখানি ক্ষুদ্র চৈতন্যের অনুভব করিয়া থাক, উনিই যে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী মহাপ্রাণময়ী মা, ইহা না বুঝিয়াই ত তোমাকে দুঃখ কষ্ট শোক তাপ জন্ম মৃত্যুর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। রাজরাজেশ্বরী মাকে কাঙ্গালিনী সাজাইয়া মলিন গৃহে বসাইয়া রাখিয়াছ বলিয়াই ত তোমার এই দীনতা এই অবসাদ দূর হয় না। ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, পদার্থে পদার্থে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; মনে রাখিও—প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না। জগৎকে সত্য বলিয়া মা বলিয়া বুঝিয়াছ, উহারই চরণে প্রাণ ঢালিয়া দাও, দেখিবে—তোমার প্রাণই জগৎ আকারে সাজিয়া রহিয়াছে।

প্রাণময়ী মা আমার! জানি তোমাকে প্রাণ দিলেই জীবত্বের অবসান হয়। জানি, তোমার চরণে সকল প্রাণ নির্ব্বিচারে ঢালিয়া দিতে পারিলেই এই অসুরের অত্যাচার চিরতরে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পারি না যে মা, কিছুতেই তোমার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া আত্মহারা হইতে পারি না। অনাথ দুর্ব্বল ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞান সন্তান আমরা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লও। কেমন করিয়া তোমাকে প্রাণ অর্পণ করিতে হয়, তাহা কিছুই ত জানি না। আমাদের প্রাণ যে সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসাবে একান্ত বিমূঢ়। কেমন করিয়া তোমাকে দিব মা? তুমি কৃষ্ণ, মহা আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের এই প্রাণবিন্দু তোমার মহাপ্রাণসিন্ধুতে মিলাইয়া লও। আমরা ধন্য হই, তোমার পতিতপাবনী মা নাম সার্থক হউক। শুনিতে পাই—শ্রীবৃন্দাবনে

কৃষ্ণরূপে তুমি গোপগৃহে ননী চুরি করিতে গিয়া গোপীগণের প্রাণও নাকি হরণ করিয়াছিলে, আমাদের প্রাণও তেমনি করিয়া হরণ কর। আমি ত স্বেচ্ছায় তোমাকে কিছুতেই প্রাণ দিব না। আমাকে জানাইয়া আসিলে, আমার সম্মুখ দিয়া আসিলে যে তোমাকে তাড়াইয়া দিব ; পাছে তোমার সেই ত্রিলোক-মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া অকস্মাৎ যদি প্রাণ দিয়া ফেলি, এই ভয়ে আমার সকল দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি। তাই বলি, তুমি লুকাইয়া চোরের মত অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার প্রাণ চুরি কর। ওগো দয়া ক'রে চুরি কর। তাহা হইলেই আমরা সেই শাশ্বত শান্তির আস্বাদ লইয়া এ বিতপ্তবক্ষ শীতল করিতে পারি। সাধক। যতদিন প্রাণ অর্পণ পরিসমাপ্তি না হয়, এস ততদিন এমনই করিয়া কাঁদি। দয়া করিয়া— না না দয়া নয়, পুত্রস্নেহে আকুলা হইয়া একদিন না একদিন মা নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

সে যাহা হউক, সাধক। তুমি জগৎময় মাতৃদর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছ ; ঐ মা-ই যে প্রাণ, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। অন্তরে যখন অসুরভাবসমূহ একটির পর একটি আসিয়া শান্তির উপকূল ভাঙ্গিয়া দিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটীকে ধরিয়া প্রাণরূপে দর্শন করিতে হয়। প্রাণই যে ঐ সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আসিতেছে, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হয়। স্মরণ কর প্রথম খণ্ডের লিখিত সন্দেশের দৃষ্টান্ত বাহিরের আকার যেরূপই হউক, উহা যে প্রাণ ব্যতীত অন্য কেহ নয়, এরূপ বোধ জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাই অসুর-শরীরে প্রাণের চয়ন। কয়েকদিন এইরূপ অনুশীলন করিলেই প্রাণময় গ্রন্থি খুলিয়া যাইবে। প্রাণ বলিলেই যে বুকের মধ্যে একটুখানি ছোট প্রাণ মনে হয়, এই অজ্ঞান দূরীভূত হইবে। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে। তখন দেখিতে পাইবে—এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ তোমার প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তখন আত্ম-প্রাণের মহাপ্রসার দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, নিজেকে জন্ম

মৃত্যুর অতীত নিত্য শান্তিময় বলিয়া বুঝিতে পারিবে। অথবা তখন সাধকের যে কি আনন্দ কি মধুময় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

এই মন্ত্রে সিংহের দুইটী বিশেষণ আছে—"মহানাদমুৎসৃজন্" এবং "ধূতকেশরঃ।" সিংহ যখন অসুরদেহে প্রাণ চয়ন করিতেছিল, তখন ভীষণ শব্দ করিতেছিল এবং তাহার কেশরসমূহ কম্পিত হইয়াছিল। প্রথম বিশেষণে উল্লাস এবং দ্বিতীয় বিশেষণে ক্রোধ সংসূচিত হইয়াছে। আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে সমূলে বিলয় করিবার জন্য উল্লাস ও ক্রোধ আবশ্যক। পূর্ণ উদ্যমে আসুরিক বৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয়। মাতৃচরণস্পর্শে ধন্য ও মহান্ উৎসাহসম্পন্ন জীব—সিংহ, মাতৃ-প্রেরিত ক্রোধ ও উল্লাসের অভিনয় করে। ইহা বন্ধনের হেতু নহে; বন্ধনবিমুক্তির উপায় বা বাহ্যলক্ষণ মাত্র। সাধক! তুমিও উচ্চৈস্বরে মা মা বলিয়া অগ্রসর হইবে। যখন অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে স্বকীয় প্রাণের মহাপ্রসার দেখিতে পাইবে, তখন আর চুপ করিয়া থাকেতে পারিবে না, আর নিজেকে দুর্ব্বল অবসাদগ্রস্ত জীব বলিয়া মনে করিতে পারিবে না, বিরাট প্রাণের উল্লাস দেখিয়া তুমিও মহোল্লাসে মা মা রবে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। তোমার সে মাতৃ-আহ্বানে বায়ুমণ্ডল পবিত্র হইবে। যাহারা সে আহ্বান শুনিবে, তাহারাও প্রজ্জলিত অনলাভিমুখে পতঙ্গের ন্যায় মা মা বলিয়া আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইবে। ওঃ সে অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াও প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি॥ ৬৮॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধঃ।

অনুবাদ। সেই যুদ্ধস্থলে দেবীর সেই সৈন্যসমূহ, অসুরদিগের সহিত এরূপভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, স্বর্গে দেবতাগণ (সন্তুষ্ট হইয়া) তাহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় উপাখ্যানে
দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে মহিষাসুরসৈন্যবধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। গণসৈন্য ও তাহাদের যুদ্ধ বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেবতাগণের পুষ্পবর্ষণের তাৎপর্য্য—আশীর্ব্বাদ ও শক্তিদান। জীব যখন মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মাতৃ-শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ অব্যর্থ অস্ত্র লইয়া অসুরকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকে, তখন দেবতাবৃন্দ শক্তি ও বিজয়াশীর্ব্বাদ দিয়া জীবকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতে থাকেন। জীব যতদিন অসুরশক্তির পোষণ করে, ততদিন দেবশক্তি নির্জ্জিত থাকে, কিন্তু একবার সাহস করিয়া অসুরশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইলেই দেবশক্তি উৎসাহসম্পন্ন ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গীতায়ও ঠিক এই কথাই আছে—জীবগণ দেবশক্তির পোষক, আবার দেবতাবৃন্দও জীবগণের শ্রেয়োবিধায়ক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের অভ্যুদয়-সাধক। জীব যতদিন এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, ততদিনই দেবতাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ও শক্তি লাভ করিয়া উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ মায়ের কৃপায় জীবের নিশ্বাস পর্য্যন্ত অসুরশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। আজ জীব সর্ব্বতোভাবে অসুরশক্তি বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত, তাই দেবশক্তি প্রসন্ন হইহা আশীর্ব্বাদ ও শক্তি দান করিতেছেন।

সাধক! তুমি যদি অতি অল্পমাত্রও সাধনার পথে অগ্রসর হও, অমনি দেখিবে অন্তরস্থ দেবতাবৃন্দ তোমার সাধনার গতিকে আরও খরতর করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিতেছেন। যতদিন নিজেকে দুর্ব্বল ও অক্ষম বলিয়া সাধনা হইতে দূরে থাকিবে, ততদিন যথার্থই উহা বন্ধুর ও কণ্টকময় প্রতীতি হইবে। কিন্তু তুমি একপাদমাত্র অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে,—ভগবান্ তোমার

দিকে তিন পাদ অগ্রসর হইয়াছেন। "আমি সংসারী, আমি বিষয়াসক্ত, আমি কামিনী-কাঞ্চনপ্রিয়, সুতরাং আমার পক্ষে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব" এই বলিয়া ভীত বা পশ্চাদৎপদ হইও না। যে যেরূপ অবস্থায় আছ, ঐ অবস্থার ভিতর দিয়াই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। কিছুই ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হয় না, শুধু পাইবার ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তখন সমস্ত দেবশক্তি তোমার অনুকূলে দাঁড়াইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ ও শক্তিপ্রদানে অগ্রগতির সামর্থ্য প্রদান করিবে।

এস ভীত সন্ত্রস্ত সন্তান! এস ত্রিতাপদগ্ধ সন্তান! এস সকলে মিলিয়া সমস্বরে মা বলিয়া ডাকি, দেবতাগণ আমাদের মস্তকেও পুষ্পবৃষ্টি করুন! আমরা ধন্য হই।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋষিরুবাচ।

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্‌যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্‌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর অসুরসৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য সক্রোধে অম্বিকার প্রতি ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এ পর্য্যন্ত অসুর-সৈন্যদলের নিধনবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; এইবার সেনাপতিগণের যুদ্ধ ও নিধনকাহিনী ব্যাখ্যাত হইবে। মাতৃ-কৃপায়—আত্মাভিমুখী প্রকৃতির আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে আসুরিক ভাবসমূহ নির্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা রজোগুণের প্রধান কার্য্য-শক্তি—যাহাদের বিলয়সাধন না করিলে পুনরায় আসুরিক বৃত্তির উৎপীড়ন-আশঙ্কা বিদূরিত হয় না, এতদিনে তাহাদের প্রতি সাধকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বিক্ষেপশক্তিই চিক্ষুর। যে শক্তি-প্রভাবে আমরা মাকে দেখিতে পাই না, যাহার প্রভাবে আমার প্রকৃত স্বরূপটী উপলব্ধি করিতে না করিতেই রূপরসাদি বিষয়াকারে প্রতিভাত হইয়া পড়ি, উহাই অজেয় অসুর চিক্ষুর। এই চিক্ষুর অসুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যতটা বেগ পাইতে হয়, বোধ হয় এতটা বেগ আর কিছুতেই দরকার হয় না। কত সাধক এই বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য কত রকম যোগ কৌশল হঠক্রিয়া প্রাণায়াম, কত রকম কঠোর ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা—কোন উপায়ে চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত হইলে, পরমাত্মস্বরূপ স্বতঃই উদ্‌ভাসিত হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জলচন্দ্রের উল্লেখ করেন। তাঁহাদের

সিদ্ধান্ত এই যে—জলের তরঙ্গায়িত অবস্থার নিবৃত্তি হইলেই চন্দ্রবিম্ব পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ হয়; তজ্জন্য অন্য কোন প্রয়াস প্রয়োজন হয় না। এ সিদ্ধান্তও যে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে এরূপ সাধক কেহ আছেন কিনা বলিতে পারি না, যিনি বিক্ষেপের হাত হইতে পূর্ণরূপ নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন। যতদিন দেহ আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে যে বিক্ষেপ আছে। বিক্ষিপ্ত ভাবের নামই জীব। তবে কঠোর সংযম তীব্র বৈরাগ্য ও দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে বিক্ষেপের মাত্রা কথঞ্চিৎ হ্রাস পায় মাত্র।

আমরা কিন্তু অন্য পথের সন্ধান পাইয়াছি—যাহা বর্ত্তমান দেশ কাল ও অধিকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মা অমাদিগকে সেই সরল সহজ পন্থায় যাইবার জন্য ভূয়োভূয় ইঙ্গিত করিতেছেন। উহা ঋষিজন-সেবিত বৈদিকমার্গ। আমরা বিক্ষেপ বিক্ষেপ করিয়া ব্যস্ত হইব না। আমরা সরলপ্রাণ শিশুর মত মাতৃ-চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া পুর্ণ নিশ্চিন্ত ও সম্পুর্ণ স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিব। বিক্ষেপই হউক আর আবরণই হউক, কিংবা যত রকম অত্যাচারই হউক, সর্ব্বাবস্থায়ই মাতৃ-চরণে পুর্ণ নির্ভরতামাত্র লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইব। ও সকলের ব্যবস্থা যাহা করা আবশ্যক, তাহা স্বয়ং মা-ই করিয়া দিবেন। আমরা মাতৃ-অঙ্কস্থিত আনন্দময় নগ্ন শিশু। ও সকলের বিচার বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। সে অধিকার কিংবা সামর্থও আমাদের নাই। এস সাধক! আমরা মা বলিয়া পুর্ণ বিশ্বাসে মহাশক্তির স্নেহময় অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ি! আমাদের যত কিছু সাধনা তপস্যা সবই মা করাইয়া লইবেন। আমাদের কিসে ভাল হইবে কিসে মন্দ হইবে, সে বিবেচনা আমাদিগের অপেক্ষা মা-ই বেশী বুঝিতে পারেন; সুতরাং কেন আমরা দিবারাত্র বিষয় নিয়া কিংবা সাধনা নিয়া মাথা ঘমাইতে যাইব। যুদ্ধ করিতে হয়, মা করিবেন, বিক্ষেপ দূর করিতে হয়, মা-ই করিবেন, আমরা দ্রষ্টা মাত্র—মায়ের বিচিত্র লীলা দেখিয়া যাইব। সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে

বিক্ষেপে স্থৈর্য্যে, সর্ব্বাবস্থায়ই আমি দ্রষ্টা, আমি মাতৃ-অঙ্কস্থিত আনন্দময় নির্ব্বিকার নগ্ন শিশু।

আরে, যদি বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারি যে, সত্যসত্যই আমার প্রাণই আমার মা, তিনি পুত্রস্নেহে আকুলা, যাহাতে আমাদের ভাল হয়, প্রতিনিয়তই তাহা করিতেছেন, তবে আর আমার ভাবিবার বিষয় কি থাকিতে পারে? তাই মন্ত্রেও দেখিতে পাই—"যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্।" অসুর অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। আমার সহিত ত যুদ্ধ করিতে আসে নাই। বিক্ষেপই হউক, আবরণই হউক, কিম্বা দম্ভ, দর্প, অভিমান, মোহ প্রভৃতিই হউক, তাহাতে আমার কি? আমার সহিত কোন যুদ্ধ নাই। আমি ধীর, স্থির, লীলাদর্শী মাত্র। তাই অসুরগণ আমাকে ছাড়িয়া অম্বিকার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেখ, আত্মসমর্পন-যোগীর কত সুবিধা। মহাসুর চিক্ষুর যুদ্ধ করিতে গেল মায়ের সঙ্গে। যোগী অসুরনিধনমাত্র দেখে না, দেখে মায়ের খেলা! আত্মসমর্পণ-যোগীর—"মামেকং শরণং ব্রজ" মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ সাধকের যে সকল অবস্থা—বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই চণ্ডীতত্ত্বে বর্ণিত। এ কথা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে, এখানে আবার তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আত্মসমর্পণই সাধনা। অনেক অবস্থার ভিতর দিয়া সাধক ইহার সন্ধান পায়। এই সাধনায় সিদ্ধ হইলে, সাধকের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মাতৃশক্তি-বিকাশের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। ইহা দেখাইতে গিয়াই দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি, সুরথ সমাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া অভূতপুর্ব্ব রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন। অসুরনিধন অবলম্বনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উন্মেষ করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেবীর বাহন সিংহের যুদ্ধবিবরণে জীবের যে পুরুষকার প্রয়োগ বলা হইয়াছে, উহার সহিত আত্মসর্পণ বা পূর্ণ নির্ভরতার কোন বিরোধ নাই। কারণ মাতৃ-শক্তিই জীবদেহরূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া পুরুষকাররূপে প্রযুক্ত হয়। জীব যতদিন

আত্মসমর্পণের আস্বাদ না পায়, ততদিন পুরুষকার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। ওরে, পুরুষকারের পুরুষই যে মা! পুরুষকে না জানিলে, তাহার কৃতি বা কার্য্য কিরূপে দেখিতে পাইবে? স্বপ্নেও কেহ ভাবিও না—মাতৃ-চরণে পূর্ণ নির্ভরতা আসিলে মানুষ জড়বৎ অবস্থান করে। যথার্থ কর্ম্মশক্তি আত্মসমর্পণ-যোগীর ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়। তাই বলি সাধক, আত্মসমর্পণের সাধনা কর। আত্মসমর্পণে অগ্রসর হও। মনে রাখিও, আত্মসমর্পণ ব্যতীত আত্মলাভ হয় না। মহাপ্রাণ চাও ত, তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ মায়ের প্রাণে মিলাইয়া দাও। তোমার ছোট আমিটাকে ভুলিয়া যাও, মায়ের আমিকে—শ্রীগুরুর আমিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধর। দেখিবে কত শত অসুর নিহত হইবে, কত লীলার অভিনয় হইবে; অথচ তোমাতে কর্তৃত্বের লেশ ও স্পর্শ করিবে না। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। তুমি যে চিরদিনিই দ্রষ্টা সাক্ষিমাত্র, ইহা যথার্থ উপলব্ধি করিয়া, বন্ধনমুক্তির কল্পিত ধাঁধা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবে।

—০—

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥ ২॥

অনুবাদ। সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় সেই অসুর সমরক্ষেত্রে দেবীর প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রোক্ত দৃষ্টান্তটি বড় সুন্দর। মেঘ যে জল বর্ষণ করে, তাহা সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে নিপতিত হয় না, কারণ সুমেরুশৃঙ্গ এত উচ্চ যে, তথায় মেঘসমূহ যাইতেই পারে না। কুমারসম্ভব মহাকাব্যে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—"আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাম্", মেঘসমূহ হিমালয় পর্ব্বতের মেখলা অর্থাৎ কটিদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে; তদূর্দ্ধে উঠিতে পারে না। সুমেরুশিখর হিমালয় অপেক্ষাও অনেক অধিক উন্নত; সুতরাং

সেস্থানে মেঘসমূহের জলবর্ষণ কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। ঠিক এইরূপ মহাসুর চিক্ষুর অজস্র বাণবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু তাহা দেবীর অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারিল না।

মা যে আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপা অবাঙ্মনোগোচরা,—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দৃশ্যবর্গের পরপারে অবস্থিতা; সুতরাং চিত্তবিক্ষেপ-জনিত অত্যাচার তাঁহাতে স্পর্শ করিবে কিরূপে? তাই চিক্ষুরের শরজাল মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারে নাই। আরে, মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যাঁহার সত্তায় ও প্রকাশে মনের সত্তা ও প্রকাশ; মনশ্চাঞ্চল্য তাঁহাকে উৎপীড়িত করিবে কিরূপে? যতদিন মায়ের স্বরূপ জানা না যায় ততদিনই অসুরের ভয়, ততদিনই বিক্ষেপনিবারণকল্পে কত কি আয়োজন উদ্যম। মা যে আত্মা, তিনি নিত্য অসঙ্গ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। বিক্ষেপ যেরূপ চিত্তধর্ম্ম, নিরোধও সেইরূপ চিত্তেরই ধর্ম্ম। সমাধি ও চাঞ্চল্য উভয়ই চিত্তের উপরে যাইতে পারে না, সুতরাং চিত্তের ধর্ম্ম চিন্ময়ীর অঙ্গ কিরূপে স্পর্শ করিবে?

তস্য ছিত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ৩॥
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ॥ ৪॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবী অবলীলাক্রমে তাহার (চিক্ষুরের) শরনিকর ছেদন করিয়া, বাণসমূহের দ্বারা অশ্বগণ ও অশ্বচালক সারথিকে নিহত করিলেন। এবং শরপ্রয়োগে তৎক্ষণাৎ ধনু ও অতিসমুচ্ছ্রিত ধ্বজচ্ছেদনপূর্ব্বক, সেই ছিন্নধনু অসুরের গাত্র বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে চিক্ষুরনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারে নাই। এইবার মাতৃবিক্রম বর্ণিত

হইয়াছে। মা ছয়টী কার্য্যদ্বারা আত্মশক্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। (১) চিক্ষুরনিক্ষিপ্ত বাণচ্ছেদন (২) অশ্বনিধন (৩) সারথিনিধন (৪) ধনুঃকর্ত্তন (৫) উন্নত ধ্বজচ্ছেদন (৬) চিক্ষুরের সর্ব্বাবয়ব বাণবিদ্ধকরণ। এস সাধক! ক্রমে আমরা এই ছয়টী ক্রিয়ার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি।

প্রথম—চিক্ষুরের বাণচ্ছেদন। চিত্তক্ষেত্রে বৈষয়িক চঞ্চলতা-উৎপাদক বেগই চিক্ষুরের বান। উহা ছেদনের উপায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ শরনিক্ষেপ। যখনই চিত্তে বৈষয়িক স্পন্দন উঠিবে, অমনি উহাকে বিরাট প্রাণের স্পন্দন বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। মহাপ্রাণময়ী মা আমার অন্তরে থাকিয়া বিষয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। রূপরসাদি কিংবা কাম কাঞ্চনাদি সকলই আমার প্রাণ—আমার মা। এইরূপ বোধের প্রবাহ কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে পারিলেই বিষয়ের স্পন্দন নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

দ্বিতীয়—অশ্ব-নিধন। অশ্ব শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। শ্রুতি বলেন—ইন্দ্রিয়সমূহই অশ্বস্থানীয়। চিত্তক্ষেত্রস্থ বৈষয়িক স্পন্দনগুলি ইন্দ্রিয়-অশ্বের সাহায্যেই বিষয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। রূপরসাদি বিষয় পঞ্চকই ইন্দ্রিয়-অশ্বের গম্য বা ভোগ্যস্থান। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগ-কৌশলে বৈষয়িক স্পন্দনকে প্রাণরূপে দর্শন করিলেই ইন্দ্রিয়বেগসমূহও প্রাণময়ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহাদের বিষয়াভিমুখী গতি নিবৃত্ত হয়। ইহাই অশ্বনিধনের তাৎপর্য্য।

তৃতীয়—অশ্বচালকনিধন। ইন্দ্রিয়-অশ্বের চালক—মন; ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রাণময় হইলে, তাহার পরিচালক মন সুতরাং প্রাণময় হইয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়বাহিত বিষয়সমূহ মনেই আহিত হয়। যতক্ষণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কেবল রূপরসাদি বহন করিয়া মনকে উপহার দেয়, ততক্ষণ মন বৈষয়িক পরিচ্ছিন্নতা ও জড়তায় মুগ্ধ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণময় হইলে উহারা রূপরসাদি আকারে একমাত্র প্রাণকেই বহন করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের নিকট যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সকলই প্রাণরূপে আসে, সুতরাং মনের বৈষয়িক

ভাব, বহুত্ববিষয়ক সংকল্প-বিকল্প সমক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই অশ্বচালকনিধন রহস্য।

চতুর্থ—ধনুচ্ছেদ। ধনুচ্ছেদ অর্থে কর্ম্মধনুর ছেদন। সর্ব্বত্র প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে, অন্তরে বাহিরে মহাপ্রাণের প্রসার দেখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়নিচয় এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, বিষয়-আহরণরূপ অহঙ্কারমূলক কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। ইহাই চিক্ষুরের ধনুচ্ছেদন।

পঞ্চম—উচ্ছ্রিত ধ্বজচ্ছেদন। অহংকর্ত্তৃত্বজ্ঞানই উন্নত ধ্বজ। বিশ্বময় প্রাণ দর্শন করিতে থাকিলে, বিশ্বের যাবতীয় কর্ম্ম যে প্রাণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। "কই আমি ত কিছুই করি না, সবই ত প্রাণময়ী মায়ের মহতী ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে! 'প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্'। ত্রিলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই ত আমার প্রাণস্বরূপিণী মায়ের বশে রহিয়াছে।" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর কর্ত্তৃত্বজ্ঞানের উচ্চ ধ্বজ কিরূপে থাকিবে?

ষষ্ঠ—চিক্ষুরের সর্ব্বাঙ্গ বাণবিদ্ধকরণ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাহসুর চিক্ষুর যখন ছিন্নধন্বা ও বি-সারথি হয়, তখন মা উপযুক্ত অবসর পাইয়া উঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োগই মায়ের বাণ-নিক্ষেপ। চিত্তগত প্রত্যেক স্পন্দনটিকে প্রাণরূপে বুঝিবার চেষ্টাই মায়ের বাণনিক্ষেপ। যখন বিক্ষেপশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিলেই চিক্ষুর বা বিক্ষেপশক্তি (প্রাণময় হইয়া) বৈষয়িক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

অভূতপূর্ব্ব রণকৌশল! যাঁহারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত সাধক, তাঁহারাই এই সংগ্রাম-রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিবারাত্রিমধ্যে অন্ততঃ একবারও যদি এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে সাধনমার্গ নিশ্চয়ই অতিশয় সুগম হইয়া পড়ে। আরে, পূর্ব্বে সত্য-প্রতিষ্ঠার অভ্যাসকালে মা বলিলে একটা অজ্ঞেয় বস্তুর

সত্তামাত্র বুঝিতে পারিতে, মাকে দূরে দেখিতে, কোথায় কোন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরপারে মা আছেন বলিয়া বুঝিতে; কিন্তু মায়ের স্বরূপ জানিতে না। এখন গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিতেছ, তোমার হৃদয়ানুভূত প্রাণই মা। এত নিকটে তিনি, এত প্রিয় তিনি, যাঁর সত্তায় তোমার সত্তা, যাঁর অস্তিত্বে তোমার সকল অস্তিত্ব, যিনি আছেন বলিয়া, তোমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, স্ত্রী পুত্র, ধন, যশ যত কিছু; সেই প্রাণই তোমার মা। যিনি এই মুহূর্ত্তে তোমার বুক হইতে নামিয়া দাঁড়াইলে, আর তোমার বলিতে কিছুই থাকে না; সেই প্রাণই তোমার মা। প্রত্যেক পদার্থে পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে ভাবে প্রাণের চয়ন করিলেই বুঝিতে পারিবে---তোমার ঐ একটুখানি প্রাণই বিশ্বপ্রাণ। আবার চিত্তের বিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেও বুঝিতে পারিবে—চিত্ত বলিতে বা বিক্ষেপ বলিতে যাহা কিছু, সকলই প্রিয়তম প্রাণ। একান্ত আশ্রয় প্রাণরূপিণী মা ব্যতীত কোথাও কিছু নাই।

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবী খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। এইরূপে চিক্ষুরের ধনুঃ ছিন্ন, রথ ভগ্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, সেই অসুর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দেবীর প্রতি ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। খড়্গ ও চর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই এই মন্ত্রের অর্থ সুগম হইবে। খড়্গ দ্বিধাকারক অস্ত্র। ভেদজ্ঞানের নাম খড়্গ। প্রাণ বতীত—মা ব্যতীত আমার এবং এই জগতের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, এইরূপ উপলব্ধির অভাববশতঃই জ্ঞান উপচিত হয়। মনে হয়, মা একজন, আর এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সহস্রবার বুঝাইয়া দিলে, দীর্ঘকাল বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও অন্তর হইতে ঐ

ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইতে চায় না। ইহাই বিক্ষেপের অস্ত্র—ইহাই চিক্ষুরের খড়্গ। মা হইতে আমাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান সাধন।

চর্ম্ম—চলিত কথায় ইহাকে ঢাল বলে। মিলনের অন্তরায় মলিনতাই চর্ম্মস্থানীয়। ভেদজ্ঞান যেরূপ আত্মা হইতে জীবকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন করায়, মলিনতাও সেইরূপ ভেদবুদ্ধি দূর করিবার উদ্যমকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমরা যখনই মা বলিয়া ঝাঁপ দেই—যখনই মাতৃ-বক্ষে একেবারে মিলাইয়া যাইবার আশায় অগ্রসর হই, তখনই জীবত্বের মলিনতা মাতৃ-মিলনের অন্তরায় স্বরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। মা যে আমার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা, আর আমরা অশুদ্ধ অনিত্য অজ্ঞান ও অনাত্মবোধযুক্ত; তাই আমরা মিলাইতে পারি না। তাই চিরসন্তপ্ত বুকখানা মায়ের স্নেহশীতল বক্ষে স্থাপন করিয়া আত্মহারা হইতে পারি না। তাই অনেক সময় বলিতে বাধ্য হই—মুক্তির কোনও প্রয়োজনই ছিল না, যদি অমুক্ত অবস্থায় থাকিয়া পূর্ণভাবে মাতৃস্নেহ ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! তাহা যে কোনমতেই হইতে পারে না। মাকে ভালবাসিতে গেলে, যথার্থ মাতৃস্নেহ ভোগ করিতে হইলে, আমাদিকেও মায়ের মত নিত্য শুদ্ধ মুক্ত হইতেই হইবে। যতদিন আমাদের আমিত্বের রেখামাত্রও আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে, আমরা মাকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, মহাপ্রাণময়ী মায়ের অঙ্গে আমার ব্যষ্টি প্রাণবিন্দুটুকু ঢালিয়া দিতে পারি নাই। বদ্ধ প্রাণ কিরূপে মুক্ত আত্মাকে ভালবাসিবে! তাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, "জীব কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। জীব চিরদিনই জীব থাকিবে। জীবের পক্ষে ঈশ্বর হওয়ার চিন্তা করাও পাপ।" কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বিন্দুমাত্র জীবভাব থাকিতেও ঈশ্বরত্ব লাভ হইতে পারে না।

জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব আলোক অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ। জীবত্ব থাকিতে ব্রহ্মত্ব অধিগত হয় না, আবার ব্রহ্মত্বে

উপনীত হইলে জীবত্বের গন্ধও থাকে না। তবে জীব যখন পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সন্ধান পায়, তখন একটু একটু করিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে পরিপক্কাবস্থায় ঐ প্রেম ঘনীভূত হইয়া, জীবকে আত্মহারা করিয়া দেয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন সত্তাই খুঁজিয়া পায় না। এই অবস্থায় জীব ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া যায়। তাই গীতায় রাগুহ্যযোগে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" যাঁহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন, এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় জীবের সহিত ভগবানের একটা ভেদের রেখামাত্র থাকে, বস্তুতঃ ক্ষণে ক্ষণে অভেদ অদ্বয় স্বরূপটীই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। বিদেহ বা কৈবল্য অবস্থায় ঐ ভেদের রেখাও থাকে না। ইহাই পূর্ণ প্রেম বা পরম সাযুজ্য।

যাহা হউক, আমরা প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মহাসুর চিক্ষুরের খড়্গ ও চর্ম্ম অর্থাৎ ভেদজ্ঞান ও মলিনতাই আমাদের এই পূর্ণ প্রেমময় অবস্থায় উপনীত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। সাধক! যখন তুমি "প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে" বলিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াও, মাকে প্রাণরূপে—আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, তখন কে তোমাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়? ঐ "খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ"। ঐ খড়্গচর্ম্মধারী মহাসুর চিক্ষুর। একবার অন্তরে অন্তরে এই অত্যাচার উপলব্ধি কর।

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্॥ ৬॥

অনুবাদ। অতি বেগবান্ মহাসুর চিক্ষুর তখন তীক্ষ্ণধার খড়্গ-দ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত করিয়া, দেবীর বামহস্তে আঘাত করিল।

ব্যাখ্যা। খড়্গ—অতি তীক্ষ্ণধার। মা একজন, আর আমি একজন, এই ভেদবুদ্ধি অনাদিজন্মসঞ্চিত। তাই দুরপনেয়, তাই অতি তীক্ষ্ণ। মুখে সহস্রবার "ব্রহ্মাহমস্মি, সোঽহমস্মি" বলিলে কি হইবে? ঐ তীক্ষ্ণধার অসির তীব্র আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। শত সাধনায়ও ভেদজ্ঞান অপনীত হইতে চায় না। এই ভেদজ্ঞানের প্রথম কার্য্যে—সিংহের মস্তকে আঘাতে—জীবের উত্তমাঙ্গ বা অভেদজ্ঞানবিষয়ক সংস্কারকে খণ্ডিত করা। চিক্ষুরের খড়্গাঘাত প্রথমে সিংহের মস্তকেই হইয়া থাকে। আরে, জীবই ত মনে করে—আমি অশুদ্ধ, আমি ক্ষুদ্র জীবমাত্র, আমি কি করিয়া ব্রহ্ম হইব; বড় সুন্দর রণকৌশল! সাধক, একবার নিজ নিজ অধ্যাত্মজীবন আলোচনা করিয়া দেখ, এই কথাটি—সিংহের মস্তকে চিক্ষুরের খড়্গাঘাতটি কত সত্য! শুধু উহারই জন্য তুমি মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছ। শুধু উহারই জন্য তুমি অনন্ত জন্মমৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতেছ।

তারপর আর এক আঘাত মায়ের বামহস্তে। মা আমার দক্ষিণ হস্তে শত্রু-নিপীড়ন এবং বাম হস্তে পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মুহূর্ত্তের তরেও অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করেন না, তাই অসুর মায়ের বামহস্তে আঘাত করিয়া আমাদিগকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। আমাকে মাতৃ-অঙ্ক-চ্যুত করিতে পারিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা ত মাকে ধরিয়া রাখি নাই। মা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাই পরাক্রান্ত অসুরগণ আজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়—আকর্ষণী শক্তি মায়ের বামহস্ত। প্রকৃতির আত্মাভিমুখী গতির নাম মায়ের আকর্ষণী শক্তি, বস্তুতঃ আত্মার দিক্ হইতে একটা আকর্ষণ আরম্ভ হয় বলিয়াই বহির্মুখী প্রকৃতি আত্মাভিমুখী হইতে থাকে। ইহাই বৃন্দাবনধামে কদম্বতরুমূলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আকর্ষণে গোপীগণের কুলত্যাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন অন্তরে অন্তরে এই

ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকে, তখন বাহিরে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহারই নাম নিবৃত্তি। তখন ধীরে ধীরে বিষয়াসক্তি হ্রাস পায়। এই নিবৃত্তিই মায়ের বাম হস্ত। অন্তরে যাহা মাতৃ-আকর্ষণ, বাহিরে তাহাই নিবৃত্তি-ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই নিবৃত্তি-মার্গেরই উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের দক্ষিণ হস্ত প্রবৃত্তি নামে অভিহিত। সে সকল কথায় এখন বিশেষ প্রয়োজন নাই, অথবা বামহস্ত ভালরূপে বুঝিতে পারিলে, দক্ষিণ হস্ত অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

এখন দেখ, অসুর যদি মায়ের বামহস্তকে দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য করিতে পারে, তবেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না কি ? যদি আমাকে নিবৃত্তি ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে, তবে আবার আমি অসুরের কিঙ্কর হইয়া চিরজীবনের তরে দাসখত লিখিয়া দিব ; এই আশায়ই চিক্ষুর মায়ের বামহস্তে আঘাত করিয়াছে। বলিয়াছি, মা আমাদিগকে বামহস্তে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কথাটাও এইবার বুঝিয়া লও। নিবৃত্তি-ধর্ম্মের সাহায্যেই সাধক আত্মসমর্পণের পথে অগ্রসর হয়। সমস্ত ভার মায়ের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে। দেখ—তোমার চিত্তক্ষেত্রে এই যে অসুরের অত্যাচার চলিতেছে, এই যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বিক্ষোভ চলিতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র তোমাকে বিব্রত হইতে হয় না, ইহার কারণ কি ? মা তোমায় আকর্ষণশক্তি বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, তুমি যথাসাধ্য আত্মসমর্পণযোগের সাহায্যে মাতৃ-অঙ্কস্থ হইয়াছ, তাই তোমার নিশ্চিন্ততা, তাই তোমার অভয় ভাব। শত ঝঞ্ঝাবাত, সংসারের সহস্র উৎপীড়ন আসিয়াও যে তোমাকে ব্যথিত করিতে পারে না, তাহার একমাত্র হেতু, মা তোমাকে অঙ্কে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তোমাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিবার আশায়ই চিক্ষুর মায়ের সব্যহস্তে আঘাত করিল।

তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে নৃপনন্দন সুরথ! সেই অসুরের খড়্গখানা দেবীর হস্তস্পর্শে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন সে ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল।

ব্যাখ্যা। বিশারণ বা ভঙ্গ অর্থবোধক ফল্‌ধাতু হইতে পফাল পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। পফাল শব্দের অর্থ ভগ্ন হইয়াছিল। মায়ের বামহস্তখানি অকর্ম্মণ্য করিয়া আমাকে অঙ্ক-চ্যুত করিবার আশায় চিক্ষুর যে খড়্গাঘাত করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল, খড়্গাঘাত ব্যর্থ হইল, আমাকে মাতৃ-আকর্ষণ হইতে, নিবৃত্তির পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। কেন? আমি ত আর মাকে ধরি নাই যে, আমার হাতখানা ছাড়াইতে পারিলেই অসুরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমি দুই হাত তুলিয়া—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়হস্ত উত্তোলিত করিয়া, মায়ের জয়ধ্বনি ও আনন্দে নৃত্য করিতেছি, আমার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই। উভয়হস্ত উত্তোলিত দেখিয়া, মা আমায় দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং ভয় কি? আমার হস্তে অসুরের খড়্গাঘাত হইলে, নিশ্চয়ই হস্তস্খলিত হইত; কিন্তু এ যে মায়ের হাত, এখানে অসুরের খড়্গই ভগ্ন হইয়া গেল।

জীব! যতদিন তুমি নিজে সাধনা করিয়া মাকে পাইবার চেষ্টা করিবে, ততদিন প্রতিপদে অসুরের আঘাত সহ্য করিতে হইবে। তুমি কেবল নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বনই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিও না, আবার প্রবৃত্তির বশেও উচ্ছৃঙ্খল হইও না; নিত্যই যে মায়ের কোলে অবস্থিত রহিয়াছ, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লও। নিবৃত্তির প্রয়োজন হয়, মা করাইয়া দিবেন। প্রবৃত্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, মা করাইয়া দিবেন। তুমি শুধু দৃঢ় বিশ্বাসে ধারণা করিয়া লও—"আমি আশ্রিত, মা আশ্রয়"।

যাহা হউক অসুরের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভেদজ্ঞান কার্য্যকরী হইল না

দেখিয়া চিক্ষুর শূল গ্রহণ করিল। এইশূল কি? মূল অজ্ঞান। "আমাকে আমি জানিনা," ইহাই মূল অজ্ঞান। অগণিত জন্মমৃত্যু, অসংখ্য জীব জগৎ, এই একটিমাত্র অজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অতি সূক্ষ্মাগ্রভাগ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রকে শূল কহে। এই মূল অজ্ঞানও অতি সূক্ষ্ম, ইহার যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করা বড়ই দুরূহ। যাবতীয় বিষয়জ্ঞান বা অজ্ঞান, একমাত্র আত্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ সূক্ষ্মাগ্র শূলের উপরে অবস্থিত। এই যে এত বড় জগৎপ্রপঞ্চ, এই যে অনন্ত বৈচিত্র এই যে অনাদি জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ, এই যে হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, পাপ পূণ্য, এই যে সঞ্চিত প্রারব্ধ এবং আগামী কর্ম্ম-বীজরাশি, এই সকলই "আমাকে আমি জানিনা" রূপ মূল অজ্ঞান-স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি গুরুর কৃপায় ঐ মূল অজ্ঞানটি কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তবে ভিত্তিহীন রাজপ্রাসাদের ন্যায় অকস্মাৎ জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়প্রাপ্ত হয়। বহু সাধনার ফলে সাধকগণ এই মূল অজ্ঞানের সমীপস্থ হইতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—"বহু বহু জন্মের পর জীব জ্ঞানবান্ হয়।" জ্ঞান অর্থই—অজ্ঞান যে কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্য জ্ঞানলাভ হইলে, মানুষ যথার্থ জ্ঞানবান্ হয় না। "আমি যে একটী অজ্ঞানমাত্র" ইহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান। ভেদ জ্ঞানের সংস্কারও যে অসুরের অস্ত্র অর্থাৎ উৎপীড়নমাত্র, এরূপ উপলব্ধি হইলে, তারপর এই মূল অজ্ঞান ধরা পড়ে। মায়ের চরণে যথার্থ শরণ লইতে পারিলে, কিরূপে মুক্তিমন্দির সন্নিহিত হয়, তাহাই এই চণ্ডীতত্ত্বে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একটির পর একটি করিয়া বন্ধনগুলি কিরূপে শিথিল হইয়া যায়, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। জীবত্বের যতগুলি গ্রন্থি আছে, মা আমার দয়া করিয়া তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ছিন্ন করিয়া দিতে থাকেন। জীব জানে না—তাহার কোথায় অজ্ঞান, কোথায় ভেদজ্ঞান, কোথায় বন্ধন, কোথায় মুক্তি; কিন্তু মায়ের চক্ষুতে কিছুই লুকাইয়া থাকিতে পারে না। মা যে আমার অজ্ঞেয় রোগের বীজাণু গুলিকে প্রকট করিয়া, সুচিকিৎসকের ন্যায় সমূলে উন্মুলিত করিয়া

থাকেন। তাই বলি জীব! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শুধু মা বলিয়া আত্মনিবেদন কর, তোমার ভবব্যাধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে।

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ॥
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবীশূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। অনন্তর মহাসুর (চিক্ষুর) ভদ্রকালীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল। সূর্যমণ্ডলের ন্যায় জাজ্বল্যমান সেই শূল আকাশ হইতে আপতিত হইতেছে দেখিয়া দেবীও শূল ত্যাগ করিলেন। সেই শূলের আঘাতে অসুর-নিক্ষিপ্ত শূল এবং সেই মহাসুর উভয়ই শতধা খণ্ডিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা। অসুর- শক্তির একদিকে যেমন আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া চিরতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়, অন্যদিকে তেমনি আবার মুক্তিমন্দিরের সুদৃঢ় অর্গল উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। বর্ষাকালে ভাগীরথীর সলিলরাশি পঙ্ককলুষিত হয় বটে, কিন্তু অচিরেই শরৎসমাগমে উহা যে সুনির্ম্মল হইবে, তাহারও পূর্ব্বসূচনা করিয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত রোগবীজাণুগুলি, দেহময় প্রকট ব্যাধির আকারে প্রকাশিত হইয়া মানুষকে অতিশয় যন্ত্রণা দেয় বটে, কিন্তু দেহটিকে সর্ব্বথা রোগ-শূন্য করিবার পক্ষে উাহাই প্রয়োজন। সাধক এতদিন কেবল পরিচ্ছিন্ন ভাবাসুরগণের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ সেই অসুরই তাহাকে ভাববৃন্দের মূলকেন্দ্রে উপনীত করিয়াছে। অসুর শূল নিক্ষেপ করিয়াছে, সাধক মূল অজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছে। এইরূপ যে মুহূর্ত্তে জীব "আমাকে আমি জানিনা" রূপ মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায়, সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞানের মূল শিথিল হইয়া যায়। নিজের দোষ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেই দোষের প্রতিকার হইতে থাকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন—এ কথাটা আর কে না জানে যে, আমরা আমাদের স্বরূপ জানিনা বলিয়াই বদ্ধ জীব হইয়া আছি। বাবা! মুখে বলিলেই জানা হয় না, জানা মানে উপলব্ধি করা; বেদান্তের ভাষায় ইহাকে কারণ শরীর বা আনন্দময় কোষ কহে, বিজ্ঞানময় কোষে স্বাধীনভাবে বিচরণের যোগ্যতা হইলে, তবে এই অজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সকল কথা উপস্থিত করিয়া বিষয়টি জটিল করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; স্থূল কথা—মাতৃ-চরণে নির্ভরশীল, মাতৃ-লাভেচ্ছু সন্তান কিরূপে অনায়াসে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানময় স্বরূপে উপনীত হয়, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য। জীব জ্ঞানে অজ্ঞানে, সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, সর্ব্বাবস্থায় যখন পূর্ণভাবে মাতৃ-চরণে নির্ভরশীল হয়, তখনই এরূপ অঘটন সংঘটন হইয়া থাকে। তাই অসুর ভদ্রকালীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল—জীব মূল অজ্ঞানের সন্ধান পাইল। যিনি মহাকাল-শক্তিরও উপরে অধিষ্ঠিতা, যিনি সর্ব্বতোভদ্রস্বরূপা—নিত্য মঙ্গলময়ী, সেই ভদ্রকালী মা-ই—জীবের সকল ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া জীবকে এইরূপে মূল অজ্ঞানের সন্ধান দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের সুযোগ প্রদান করেন।

যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—জাজ্জ্বল্যমান সূর্যবিম্বের ন্যায় সেই শূল আপতিত হইতেছে দেখিয়া, দেবী স্বকীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে অসুর ও তন্নিক্ষিপ্ত শূল উভয়ই বিনষ্ট হইল। সাধকও যখন পূর্ব্বোক্ত মূল অজ্ঞানের সমীপস্থ হয়, অর্থাৎ একটু একটু করিয়া মূল অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে থাকে, তখন ইহাকে তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যবিম্বের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্যই মনে করে! যেরূপ মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র নেত্র নিমীলিত করিতে হয়, ঠিক সেইরূপ মূল অজ্ঞানের নিকটস্থ হইতে না হইতেই বৈষয়িক জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। এই মূল অজ্ঞান যে যথার্থই দুর্নিরীক্ষ্য, তাহা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। সাধকগণ যখন যাবতীয় বৈষয়িক স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করিয়া, অতি সন্তর্পনে আত্মসংস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখন ধীরে

ধীরে এই মূল অজ্ঞান উপলব্ধিযোগ্য হইতে থাকে এবং নিমেষার্দ্ধ কালের মধ্যেই লক্ষ্যচ্যুত হইয়া, আবার বৈষয়িক স্পন্দন গ্রহণ করে। ইহাই নিক্ষেপশক্তির সর্বশেষ প্রযত্ন। কিন্তু উহা যতই দুর্নিরীক্ষ্য হউক না কেন, মাতৃ-শূলাঘাতে উহারও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। মায়ের শূল কি ? আত্মজ্ঞান। আমার স্বরূপ কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সেই মুহূর্ত্তেই জীবের যাবতীয় অজ্ঞান ও তজ্জন্য জন্ম মৃত্যু বন্ধন মুক্তি প্রভৃতি ফল উভয়ই যুগপৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আরে, আমি যে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ—মাত্র "জ্ঞ" পদার্থ, এইরূপ উপলব্ধি হওয়া মাত্রই ত মন বুদ্ধি চিত্ত ইন্দ্রিয় দেহ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কার বিলুপ্ত হয়। সাধক ! পুনঃ পুনঃ এই সকল বিষয় আলোচনা কর, অজ্ঞান দূর হইবে।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নিহত হইলে, দেবতাগণের উৎপীড়ক চামর, গজারোহণে যুদ্ধার্থ আগমন করিল।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ-শক্তির বিলয় হইয়াছে, এইবার আবরণ-শক্তির যুদ্ধ ও বিলয়ের বিষয় কথিত হইবে। সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিই যখন মাতৃ-শূলাঘাতে অনায়াসে নিহত হইয়াছে, তখন অন্যান্য সেনানীগণ যে অচিরাৎ বিধ্বস্ত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? চামরাদি অসুরের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে ; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই মন্ত্রে চামরের দুইটি বিশেষণ দেখিতে পাই—একটি ত্রিদশার্দ্দন এবং অন্যটি গজারূঢ়। ত্রিদশার্দ্দন শব্দের অর্থ দেবতাগণের উৎপীড়ক। অনাত্মবস্তুর প্রতীতিই আবরণ-শক্তির কার্য্য। আত্মার নাম অমৃত। দেবতাগণ সেই অমৃতভোগী, অর্থাৎ সর্ব্বদাই আত্মসংস্থ। কিন্তু আবরণশক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত অনাত্ম বস্তুর ভাণ হয় ; সুতরাং দেবতাগণ অমৃত হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহাই

দেবতাগণের প্রতি চামরাদি অসুরের উৎপীড়ন। দ্বিতীয় বিশেষণ গজারূঢ়! গজ ধাতুর অর্থ বন্ধন। যেখানে আবরণ সেইখানেই ত বন্ধন। আত্মা—মা যে আমার নিত্য স্বপ্রকাশ-স্বরূপা ইহা বুঝিতে না পারাই জীবের বন্ধন! আত্মা ব্যতীত অপর একটা বস্তুর সত্তা উদ্ভাসিত করিয়া, আবরণ শক্তি যেন আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে। আত্মা যতদিন আবৃত, জীব ততদিনই বদ্ধ! তাই গজ অর্থাৎ বন্ধনই চামরের যোগ্য বাহন।

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। সেই চামরও দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা তাহা অভিহত ও নিষ্প্রভ করিয়া সত্বর ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেহাদি অনাত্ম বস্তুর প্রতীতি আবরণক্তির কার্য্য, ইহাই চামর নিক্ষিপ্ত শক্তি-অস্ত্র। অম্বিকা—মা আমার অতি অল্পকাল মধ্যেই হুঙ্কার প্রয়োগে উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। হুঙ্কার একটি শব্দবিশেষ। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে বাগ্‌যন্ত্র হইতে ঐরূপ শব্দ নির্গত হয়। আমি স্বপ্রকাশ স্বরূপ—আমারই প্রকাশে সকল প্রকাশময়। আমাকে আবৃত করিয়া রাখিবে কে? এই ক্রোধমূলক ভাবের উদ্বেলন হইলেই, আবরণ-শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে হুঙ্কারটি স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র বা প্রণবের উপলক্ষণ। তন্ত্রশাস্ত্র হুঙ্কারকে কূর্চ্চবীজ বলিয়া থাকেন। তন্ত্রোক্ত ঐ সকল মন্ত্রকে চৈতন্যময় করিয়া জপ করিলে, আবরণশক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করিবার সামর্থ লাভ হয়। সাধকগণ ঐ সকল মন্ত্রের সাহায্যে চিত্তকে অনাত্মভাব হইতে আকৃষ্ট করিয়া আত্মসংস্থ করিতে প্রয়াস পান। যতদিন এইরূপ স্বয়ংকৃত অধ্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য থাকে, অর্থাৎ "আমি মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিব" এইরূপ বোধ থাকে, ততদিন প্রায়ই ব্যর্থমনোরথ হইতে

হয়। আর যখন দেখে—মাই-ই হুঙ্কারাদি মন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনাত্মভাবের বিলয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই অনায়াসে আবরণশক্তির কার্য্য বিনষ্টপ্রায় হইয়া থাকে।

খুলিয়া বলি—যদিও আত্মা স্বপ্রকাশ নিরাবরণস্বরূপ, তথাপি যখনই আমরা বিষয় দর্শন করি, তখনই অনাত্মবস্তুর ভাণ হয় ও আত্মস্বরূপ আবৃতবৎ থাকে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও প্রারব্ধ সংস্কারবশতঃ অনাত্মবস্তুর ভাণ হয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই অনাত্মভাব দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। প্রথমতঃ মায়ের—আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার নাম সত্য-প্রতিষ্ঠা। তারপর প্রাণই যে মা, প্রাণই যে আত্মা, ইহা বুঝিতে হয়। প্রাণই জগৎময় পরিব্যাপ্ত, বিষয়ের আকারে প্রাণেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি আমরা যে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছি, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। হুঙ্কারাদি মন্ত্র ঐ প্রাণ প্রতিষ্ঠা-রূপ সাধনার সহকারী আলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে হয়। এ সকল তত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত বিনীতভাবে শ্রীগুরুর মুখ হইতে শিক্ষা করিলেই অচিরে ফলদায়ক হইয়া থাকে।

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ ১২॥

অনুবাদ। শক্তি অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া চামর সক্রোধে শূল নিক্ষেপ করিল, দেবীও বাণপ্রয়োগে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ-শক্তির শেষ চেষ্টা যেরূপ মূল অজ্ঞানের উদ্বোধ, আবরণ-শক্তিরও সর্ব্বশেষ প্রযত্ন সেইরূপ শূলনিক্ষেপ বা মূল অজ্ঞানের উদ্বোধ। সাধকগণ আবরণ ও বিক্ষেপ উভয় শক্তি ধরিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলেই এই মুল অজ্ঞানের সমীপস্থ হইতে পারেন। এখানে আসিলে মাতৃ-কৃপায় অনায়াসে এই অজ্ঞান ভেদ হয়। মা বাণপ্রয়োগে—স্বকীয় আকর্ষণী-শক্তিপ্রভাবে অচিরাৎ

সন্তানকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানময় অবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকেন।

কিরূপে ইহা সম্ভব হয়?—"আমাকে আমি জানিনা" এই যে মূল অজ্ঞান, উহাও জানামাত্ররূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানেই অবস্থিত। এইখানেই জ্ঞান অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় সম্মিলন। সাধক যখন গুরুকৃপায় ধীরে ধীরে বিক্ষেপ ও আবরণশক্তির মূল অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তখন এই অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয়; বহু সৌভাগ্যের ফলে, বহুজন্মার্জ্জিত শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের ফলে এই মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায়। এখানে দাঁড়াইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। যেহেতু এই অজ্ঞান, বিশুদ্ধ আত্মবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এস, অজ্ঞানান্ধ জীব! এস, দুঃখিত শোককাতর সংসারক্লিষ্ট জীব! এস মা বলিয়া, গুরু বলিয়া, আত্মা বলিয়া, সত্য বলিয়া, প্রাণ বলিয়া ছুটিয়া এস। তোমরা অজ্ঞানের পরপারে পৌঁছিবে! অমৃতের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইবে।

ততঃ সিংহ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সিংহ উল্লম্ফনপূর্ব্বক গজকুম্ভদ্বয়ের অন্তরে অবস্থান করতঃ, সেই ত্রিদশারির সহিত ঘোরতর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ ও আরণশক্তির সর্ব্বশেষ প্রযত্নের ফলেই জীব মূল অজ্ঞানের সন্ধান পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানময় স্বরূপের উপলব্ধি করে। অসুরগণ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তাই দেখিতে পাই—চিক্ষুর ও চামর উভয়ই দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শূল নিক্ষেপ করিল এবং তাহারই ফলে জীব যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান পাইল। অসুরগণের অত্যাচারের মাত্রা যত বেশী হয়, সাধকের আত্মপ্রতিষ্ঠাও তত শীঘ্র হইতে থাকে। এই দেখ—অসুরগণ

মনে করিয়াছিল, মূল অজ্ঞানের স্বরূপটি সাধকের সম্মুখে ধরিতে পারিলেই সে চিরদিনের মত বশ্যতা স্বীকার করিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ফল হইল। সাধক মূল অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারের পার্শ্বেই আত্মজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া, সিংহবিক্রমে চামর অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

জীব এতদিনে জ্ঞান-অজ্ঞানের সম্মিলন স্থানে—বন্ধন ও মুক্তির মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই "গজকুম্ভান্তরস্থিত"। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—মহাসুর চামর গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। যেখানে বন্ধনের শেষ ও মুক্তির আরম্ভ, সেই স্থানকে "গজকুম্ভান্তর" বলা যায়। মূল অজ্ঞানই বন্ধনের শেষ বিন্দু, ঐ স্থান হইতেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই বন্ধন ও মুক্তির মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সিংহ—জীব প্রাণপণে অসুরবিনাশের জন্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—জীব যখন প্রথম মুমুক্ষু হয়, তখন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনকেই বন্ধন বলিয়া মনে করে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে—দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইহারাই বন্ধন; কিন্তু সর্ব্বশেষে দেখিতে পায়—আমার যথার্থ বন্ধন—এই মূল অজ্ঞান। "আমাকে আমি জানি না" এই অজ্ঞানই বন্ধনের যথার্থ স্বরূপ। কোন্ অনাদিকাল হইতে, কি খেয়ালে এই অজ্ঞানটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, ঐ একবিন্দু অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কত জন্ম মৃত্যুরই স্রোত বহিয়া যাইতেছে, কত সুখ দুঃখের স্বপ্নই দেখিতেছি! আবার ঐ অজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়াই উহাকে বিলয় করিতে কত চেষ্টা, কত প্রাণপাত তপস্যা, কত কঠোর ব্রত-নিয়ম ধর্ম্মচর্য্যার অনুষ্ঠান হইতেছে! এ চিত্র একবার নয়নপথে পতিত হইলে, আনন্দময়ী লীলাময়ী মহামায়ার চরণে প্রণত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

ধন্য মা তোর এই অনির্ব্বচনীয় লীলা! মা গো, সহস্রবার বুঝিলেও আবার যে ভুলিয়া যাই। এই জন্ম মৃত্যু হাসি কান্না বন্ধন

মুক্তি যা কিছু এ সকলই যে ইচ্ছাময়ি তোরই ইচ্ছামাত্র, এ কথা কিছুতেই এ পোড়া প্রাণ মানিয়া লইতে চায় না। মাগো! তোমার ইচ্ছায় অজ্ঞান, তোমার ইচ্ছায় বন্ধন, আবার তোমারই ইচ্ছায় মুক্তি! আর কত কাল এ বন্ধন দেখবি মা! তুই দুই হাতে কি কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিস্, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ্ ত্রিনয়নি! কত কাল কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এ অজ্ঞানের বন্ধন-যাতনা সহ্য করিয়া আসিয়াছি। আর যে পারি না মা! বুক যে ভাঙ্গিয়া যায় মা! এক একটা তরঙ্গ আসে, আর মর্ম্মস্থলে কি ভীষণ আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত এক একটা ভাব আসিয়া, কোন্ অনাদিকাল হইতে এমনই সজোরে আঘাত করিতেছে। মাগো কতদিনে এ মর্ম্মব্যথার অবসান হইবে? দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কত আশায় বুক বাঁধিয়া দিন গণনা করি; কিন্তু কই, তুই ত তেমন করিয়া আমাদের ব্যথা দূর করিতে—চিরদিনের মত জীবত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে, স্নেহময়ী মায়ের মত ছুটিয়া আসিলি না! আমাদের এই ক্ষত বিক্ষত বক্ষে একবারও ত যথার্থ মুক্তির অমৃতময় স্পর্শ দিলি না! মা মা মা, আর বলিবার কিছুই নাই। শুধু বুঝিতে দাও—তুমি আমায় যথার্থই ভালবাস। সত্যই তুমি আমার প্রাণ! সত্যই তুমি আমার আত্মা! সত্যই তুমি আমার আমি! ওগো, এই একটা কথা বুঝিতে পারিলেই যে আমাদের সকল যাতনার অবসান হয়।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে চামরের সহিত সিংহের বাহুযুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে বাহুযুদ্ধের রহস্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব যখন একবার অজ্ঞানের পরপারের সন্ধান পায়, তখন সেই জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সর্ব্ববিধ বৈষয়িক স্পন্দনকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় হস্তে ধরিয়া ধরিয়া, জ্ঞানবক্ষে বিলীন করিতে প্রয়াস পায়।

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। তাহারা উভয়ে (চামর এবং দেবীর বাহন সিংহ) যুদ্ধ করিতে করিতে হস্তী-হইতে ভূতলে অবতরণ করিল এবং অতিশয় ক্রোধ বশতঃ পরস্পর অতি দারুণ প্রহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। জীব যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহায্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় হস্তদ্বারা বৈষয়িক স্পন্দনগুলিকে মহাপ্রাণময়ী মাতৃ-অঙ্কে মিলাইয়া দিতে থাকে, অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুর ভাণকে পূর্ণরূপে বিলয় করিয়া, বিশুদ্ধ আত্মবোধে অবস্থান করিতে প্রয়াস পায়, তখন এক একবার সেই বন্ধন মুক্তির মধ্য বিন্দু হইতে অবতরণ করিতে হয়। এক একবার সেই সূক্ষ্ম বোধময় অবস্থা হইতে স্থূলে নামিয়া আসিতে হয়। উদ্দেশ্য—যাবতীয় স্থূল জ্ঞানকেও বোধময় সত্তায় লইয়া যাওয়া। ইহাই গজকুম্ভান্তর হইতে মহীতলে অবতরণ ও পরস্পর দারুণ প্রহার। আরে, পার্থিব ভাবগুলি বহুদিন হইতে সাধকের চিত্তে যে ঘন স্থূল সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে, ইহার বিলয় সাধন করিতে হইলে, পুনঃ পুনঃ উহাদিগকে বোধময় সত্তায় লইয়া আসিতে হয়। যাহাকে আমরা জল মাটী বৃক্ষ পর্ব্বত জীব জন্তু বলিয়া, অতি স্থূল জড় পদার্থরূপে দেখি, উহার বাস্তব সত্তা যে বোধ বা প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এইরূপ উপলব্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে এইরূপ বাহুযুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সাধক! শুধু দেখিতে থাক—তোমার প্রবৃত্তি যাহা চায়—গ্রহণ করে এবং নিবৃত্তি যাহা চায় না—পরিত্যাগ করে, উহার সকলেই তোমার প্রাণ—তোমার বোধ। তুমি একবার মূল অজ্ঞান হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুকে ধরিয়া প্রাণময় সত্তায় মিলাইয়া দিতে চেষ্টা কর। ইহাই আবরণ-শক্তির সহিত জীবের অতি দারুণ বাহুযুদ্ধ। অসুরের পক্ষে—জড়ভাবের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা অতি দারুণ প্রহার। কত জন্ম হইতে জড়ত্বের ভাণ নিয়া রহিয়াছ,

আর আজ সকলই চৈতন্যময়—বোধময় হইতে চলিয়াছে। অসুরকুলের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দারুণ আঘাত আর কি থাকিতে পারে ? আবার জীবের পক্ষেও ইহা অসুরের দারুণ আঘাত। কারণ, জীব গুরুকৃপায় বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, ইহা আমারই প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; কিন্তু তথাপি জড় বস্তুর প্রতীতি ত' একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই মন্ত্রেও পরস্পর দারুণ প্রহারের কথাই উক্ত হইয়াছে।

ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্॥ ১৫॥

অনুবাদ। অনন্তর মৃগারি সবেগে আকাশে উল্লম্ফনপূর্ব্বক, কর-প্রহারে চামরের শরীর হইতে শিরকে পৃথক করিয়া দিল।

ব্যাখ্যা। এখানে জীবকে মৃগারি বলা হইয়াছে। মৃগারি শব্দের অর্থ অন্বেষণের শত্রু। অন্বেষণার্থক মৃগ্ ধাতু হইতে মৃগ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। জীব যখন মাতৃ-অন্বেষণের শত্রু হয়, তখনই তাহাকে মৃগারি বলা যায়। কই মা কোথায় ? এই রূপ অন্বেষণের ভাবটা যখন একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই জীব মৃগারি হয়। সাধক! তোমার অন্বেষণের চক্ষু মুদ্রিত করিতেই হইবে। তোমাকে মৃগারি হইতেই হইবে। তাহা না হইলে যে চামর নিধন হইবে না, আবরণ-দোষ বিদূরিত হইবে না। আরে, কাহার অন্বেষণ করিবে ? যে বস্তু লুকাইয়া থাকে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মা যে আমার সর্ব্বতঃ সুপ্রকাশ-স্বরূপা। মা ছাড়া কোথাও যে কিছুই নাই। তাঁকে আবার অন্বেষণ করিবে কি ? যাহা দেখ, যাহা শোন, যাহা ভাব সবই ত' মা। তোমার উর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্রই ত' মা রহিয়াছেন, আরও নিকটে ঐ যে তোমার বুকের ভিতরে তিনি নিত্য বিরাজিতা! ওরে, এত সুলভ, এত সহজ আর কি আছে! শুধু মা বলিবার অভাব, মায়ের

অভাব কোথাও নাই। যতক্ষণ দেখিবে—তুমি ধ্যান ধারণার সাহায্যে মাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছ, ততক্ষণও বুঝিব—তুমি মাকে অন্বেষণ করিতেছ। অন্বেষণের চক্ষু মুদ্রিত কর। সর্ব্বত্র মাকে দেখ! মা বলিয়া, প্রাণ বলিয়া আদর কর! আপনার প্রাণকে কত আদর কর, কত ভালবাস! ঐ প্রাণই ত মা, ঐ মা-ই ত' বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আর অনাদর করিও না, আর অবিশ্বাস করিও না। প্রত্যেক ভাবে, প্রতি প্রচেষ্টায় মাকে দেখিতে থাক! তুমিও মৃগারি হইবে, তোমার বহু জন্ম-সঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণ বিদূরিত হইবে।

যতদিন জীব শিশু থাকে—অজ্ঞান থাকে, ততদিনই কই মা কোথায় মা বলিয়া অন্বেষণ করিতে থাকে; কিন্তু একবার যদি বুঝিতে পারে—"পূর্ণমন্তর্বহির্যেন", "ত্বয়া ততং বিশ্বং" "স এব সর্ব্বং" তখন কি আর তাঁহাকে খুঁজিতে হয়! যাহা দেখে, যাহা ধরে, যাহা জানে, সবই যে প্রাণ—সবই যে মা। সাধক! যদি তুমি মাটিকে ধরিয়া "মা" টী বলিতে না পার, জলকে ধরিয়া রসময়ী মায়ের সত্তা বুঝিতে না পার, যদি সমীরণস্পর্শে মাতৃ-স্পর্শ বলিয়া পুলককণ্টকিত না হও, তবে কোন্ বলে, কি সাহসে তত্ত্বাতীতা ভাবাতীতা মাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইবে? একটী আত্মসম্বেদনে উক্ত হইয়াছে—জগদ্দর্শনমাত্রেণ নচেদাত্মস্মৃতির্ভবেৎ। বিশ্বাতিগং পরং ব্রহ্ম কথং গচ্ছেন্নিরঞ্জনম্॥ জগদ্দর্শন মাত্রে যাহার আত্মস্মৃতি না হয়—মাকে মনে না পড়ে, সে কি করিয়া বিশ্বের অতীত নিরঞ্জন পরব্রহ্ম তত্ত্বে উপনীত হইবে?

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মৃগারি আকাশে উৎপতিত হইয়া, চামরের শিরচ্ছেদ করিয়াছিল। জীবেরও যখন অন্বেষণের ভাবটা দূরীভূত হয়—সাধক যখন চক্ষু চাহিলেই মাকে দেখিতে পায়, তখনই মৃগারি হইয়া আকাশে উৎপতিত হয়—নির্ম্মল চিদাকাশে অবস্থান করে এবং তথা হইতে অনাত্মভাবের আবরণকে বিলয় করিয়া, পরমাত্মরসের আস্বাদে অমর হইয়া যায়।

এইরূপে চিক্ষুর ও চামর অসুর নিহত হয়—বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তি বিলয় হয়। বিশুদ্ধ বোধ ফুটিয়া উঠে। সাধক! মনে করিও না—একদিন একবার মাত্র বিক্ষেপের কিংবা আবরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই বাকী জীবনকালের মধ্যে আর কখনও চিত্তক্ষেত্রে বিক্ষেপ আসিবে না, অথবা অনাত্মভাব ফুটিয়া উঠিবে না। তাহা নহে—যতদিনই দেহ আছে, ততদিন বিক্ষেপ এবং আবরণ আছে। তবে উহারা আর কখনও তোমাকে মাতৃ-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না, মাতৃ-অস্তিত্বে সংশয় আনিতে পারিবে না, মাতৃ-প্রকাশকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারিবে না। উহারা থাকিবে —কিন্তু মস্তক-বিহীন! আর উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। যতদিন প্রারব্ধ ক্ষয় না হয়, ততদিন উহারা মস্তকবিহীন শবদেহের ন্যায় অবস্থান করিবে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পরে বলিব।

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টি তলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ। দেবী উদগ্র অসুরকে শিলাবৃক্ষাদি প্রহারে এবং করাল অসুরকে দন্তমুষ্টি ও তল প্রহারে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ ও আবরণশক্তিই যাবতীয় অসুরকুলের আশ্রয়। মূল বিনষ্ট হইলে শাখাপ্রশাখাগুলি সহজেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উদগ্র—দর্প—কর্ত্তৃত্বাভিমান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেবী উহাকে শিলাবৃক্ষাদি প্রহারে নিহত করিলেন। গাছ পাথর মাটি, অর্থাৎ পার্থিব পদার্থই ত, আমাদের দর্পের বিষয়। উহারই কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া, আমার বলিয়া ধরিয়া রাখি ও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি। অনেক সময় বাক্যের আকারেও সে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু চিন্ময়ী মায়ের আবির্ভাব হইলে—সর্ব্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শনে অভ্যস্ত হইলে, ঐ দর্প সমূলে বিনষ্ট হয়। কারণ, তখন একদিকে যেমন জড়ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ সঞ্চয় করিবার মত

কিছুই পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তেমন "আমার" বলিতেও কিছুই থাকে না। এইরূপে উদগ্র অসুরের উন্নত মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়। মনে রাখিও সাধক! অহঙ্কারনাশই মাতৃ-দর্শনের ফল। যতদিন মাকে—যথার্থ আমিকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিনই এই কল্পিত আমিটাকে নিয়া দর্প করিবার অবসর থাকে। কিন্তু একবার "আমির" সন্ধান পাইলে—আর দর্পের লেশও থাকে না। তখন আচার্য্য শঙ্করের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়, "কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিম্। আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥"

তারপর করাল অসুর। ইহার নাম ভয়। আত্ম-অস্তিত্বনাশের কল্পনাজন্য চিত্তের এক প্রকার সঙ্কোচভাব। আমি থকিব না—আমি মরিব, এইরূপ একটা কল্পিত সঙ্কোচ, শিশুজীবগণের একান্ত স্বাভাবিক। অজ্ঞান জন্যই ঐরূপ কল্পিত ভয় উপস্থিত হয়। করাল অসুর ইহাকেই বলা হয়। এই মৃত্যুভয় মানুষকে স্বাধীনভাবে আনন্দভোগ করিতে দেয় না, শিশু জীবের পক্ষে উহা অতিশয় হিতকর; কারণ উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া রাখে। মৃত্যুভয় না থাকিলে, মানুষ বোধ হয়, পশুরও অধম হইত। এই করাল অসুরের অত্যাচারই আমাদিগের মৃত্যুমুখী গতি ফিরাইয়া দেয়। সাধারণ মনুষ্যগণ যে দিবারাত্র মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, তাহা বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই। বেশ খায় দায় বেড়ায়, হাসি গল্প করে আমোদ উৎসবে যোগ দেয়, ভয় আবার কোথায়? কিন্তু একটু ধীরভাবে দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে—জীব মৃত্যুভয়ে কত সঙ্কুচিত, খোলা প্রাণে, স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারে না। আহার বিহার অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ হইলেও, অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়; পাছে অসুখ করে—রোগ হয়। এরূপ স্বাধীনভাবে কেহই বিষয় ভোগ করিতে পারে না। মৃত্যু ভয়ে ভোগ সঙ্কুচিত হয়, তাই মানুষ-মাত্রেই ভোগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশী করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" পৃথিবীতে সমস্ত বস্তু ভয়ান্বিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়। মাকে—

অভয়াকে না পাইলে, বৈরাগ্য আসে না। বৈরাগ্য না আসিলে, করাল অসুর নিহত হয় না। যতই যোগ কৌশল অবলম্বন করা হউক না কেন, মৃত্যুভয় জীবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। মৃত্যুর করাল চীৎকার পাছে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাই মানুষ দিবারাত্রি বিষয়চিন্তা, কাম-কাঞ্চনের সেবা করিতে বাধ্য হয়। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সে চীৎকারকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে,—আমাদের এই যে আহার নিদ্রা বিষয়চিন্তা, এ সকলই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। জীবনটাই যেন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করা। কিছুদিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়া, শেষে কিন্তু একদিন উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মায়ের কৃপা ব্যতীত উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের অন্য উপায় নাই। তুমি মাকে ধরিয়া আছ, তাই মা তোমাকে এই মৃত্যুভয়রূপ করাল অসুরের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দন্ত, মুষ্টি এবং তলপ্রহার করিলেন। প্রথমতঃ মা দংষ্ট্রাকরাল মুখ ব্যাদান করিয়া, করাল অসুরকে জগৎ গ্রাসকারিণী দন্তপংক্তি-দর্শন করান। দ্বিতীয়তঃ মুষ্টির দ্বারা উহাকে গ্রহণ করেন। তৃতীয় করতলদ্বারা অভয় প্রদান করেন আধ্যাত্মিক রহস্যে দেখ—কালজ্ঞান হইতে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়! এই কালশক্তি যেখানে নিরুদ্ধ, সেই মহাকালী চিতিশক্তির দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিলে সর্ব্বভাবরূপ মৃত্যুভয় স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়। মুষ্টিপ্রহারশব্দে আদানশক্তি বুঝিতে হইবে। মা আমার সহস্র হস্তে সহস্র মুষ্টিতে সর্ব্বভাবকে ধরিয়া ধরিয়া, আপনার অঙ্গে বিলীন করিয়া দেন। তারপর উত্তান হস্তে করতল প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবকে অভয় প্রদান করেন। অভয় জ্ঞানই মায়ের করতল শ্রুতিও বলেন—"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।" দ্বিতীয়-প্রতীতি হইতেই ভয় আপতিত হয়। একত্ব-জ্ঞানে উপনীত হইলে, অর্থাৎ সর্ব্বভাবের —বহু ভাবের সম্যক্ বিলয় হইলেই, জীব অভয় হয়। মৃত্যুভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৭॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈবচ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥ ১৮॥
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখং চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ১৯॥

অনুবাদ। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধত অসুরকে গদাঘাতে, বাস্কল অসুরকে ভিন্দিপাল অস্ত্রে, তাম্র ও অন্ধক অসুরকে বাণ প্রয়োগে নিহত করিলেন। এইরূপ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূলের আঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য এবং মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে নিহত করিয়াছিলেন। অসির অঘাতে বিড়ালাক্ষ নামক অসুরের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটি মন্ত্রে মহিষাসুরের অন্যান্য সেনানীগণের নিধন-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মহিষাসুরসৈন্যসজ্জার ব্যাখ্যানাবসরে বাস্কল মহাহনু এবং বিড়ালাক্ষের রহস্য উক্ত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন এস্থলে উদ্ধত প্রভৃতি আরও কয়েকটি অসুরের নাম পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান্—"দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে যে অসুর-সম্পদের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত এই অসুরগণের নামানুযায়ী সামঞ্জস্য করিয়া লইলেই, পাঠকগণ অনায়াসে এ রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন। উক্ত অসুরগণের নাম প্রায়ই অন্বর্থ। উদ্ধত—দম্ভ, তাম্র—পারুষ্য (পরুষভাব), অন্ধক—মোহ, উগ্রাস্য—ক্রোধ, উগ্রবীর্য্য—পশুবল, দুর্দ্ধর—অক্ষমা, দুর্ম্মুখ—পরুষবাক্য-প্রয়োগ। মাতৃ-কৃপায় এই দম্ভ পারুষ্য প্রভৃতি আসুরিক বৃত্তি-নিচয় অল্পকাল মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। একমাত্র শরণাগত ভাব আসিলেই সাধক অনায়াসে এই সকল বৃত্তির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায়। পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু

ইহাই এস্থলে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় আসুরিক বৃত্তি বিদ্যমান থাকিতেও জীব মায়ের কৃপা লাভ করিতে পারে। একবার মাতৃ-কৃপার অনুভূতি আসিলে, ঐ সকল বৃত্তি অল্প কাল মধ্যে হীনবল হইয়া পড়ে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমাদিগকে যে অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, চণ্ডীতে তাহারই কার্য্যকরী অবস্থা অসুর নিধনচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ভগবান বলিয়াছেন—"জীব! তুমি যত বড় দুরাচারই হও না কেন, আমাকে আশ্রয় করিবার—আমার শরণাগত হইবার যোগ্যতা তোমার আছে। অনন্যভাক্ হইয়া আমাকেই একান্ত আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তোমার আছে। তোমার দুরাচারিতা সে সামর্থ্যকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। যদি আমার দিকে মুখ ফিরাও, তবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তুমি ধর্ম্মাত্মা সাধু হইয়া উঠিবে। তোমার দুরাচারনিচয়কে আমিই বিলয় করিয়া দিব। মনে রাখিও—আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই অভয়বাণী কিরূপে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই মায়ের এই অসুরবধের লীলা। এ তত্ত্ব ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। গীতায় যাহা উপদেশ—চণ্ডীতে তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত। যাহারা সর্ব্বভাবেই প্রাণময়ী মায়ের বিকাশ দেখিতে অভ্যস্ত, তাহাদের দম্ভ পারুষ্য মোহ ক্রোধ পশুবল অক্ষমা কঠোর বাক্যদ্বারা অপরের প্রাণে ব্যাথা দেওয়া প্রভৃতি দোষরাশি অচিরেই বিদূরিত হইয়া যায়।

———

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্॥ ২০॥

অনুবাদ। এইরূপে স্বকীয় সৈন্যবল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া

মহিষাসুর মহিষের রূপ ধারণ করিয়া দেবীর গণসৈন্যবৃন্দকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুরের যাবতীয় সেনানী একে একে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। রজোগুণের যত রকম বৈষয়িক স্পন্দন, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এইবার সৈন্যবলবিহীন স্বয়ং মহিষাসুর একবার শেষ উদ্যম করিল। প্রথমেই মহিষরূপ ধারণ করিয়া গণসৈন্যবৃন্দকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। "মহীং ইষ্যতি ইতি মহিষঃ" (ঈকার হ্রস্ব)। যে মহীকে ক্ষিতিতত্ত্বকে অর্থাৎস্থূলভাবকে অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, সে-ই মহিষ। স্থূলাভিমানী রজোগুণ সহায়-বিহীন হইয়া স্বকীয় সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে, চরম সম্বল পার্থিব দেহটিকেই বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরে। যখন সাধকের দর্প অভিমান প্রভৃতি রজোগুণসমুদ্ভুত দোষ-নিচয় দূরীভূত হয়, তখনও সে দেহাত্মবোধের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্থূলদেহের প্রতি অতিশয় আসক্তিই উহার হেতু ইহাই মহিষাসুরের শেষ আক্রমণ। যতদিন সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের অশ্লেষ না হয়, ততদিন কিছুতেই দেহাত্মবোধ শিথিল হইতে চায় না। অথবা যতদিন দেহাত্মবোধ ছিন্নমূল না হয়, ততদিন সঞ্চিত কর্ম্মের অশ্লেষ হয় না। মনে রাখিও সাধক—অন্তররাজ্যে কার্য্যকারণভাবের যথাযোগ্য পৌর্ব্বাপর্য্যভাব স্থির করা যায় না। জগতে দেখিতে পাই—আগে কারণ, তারপর কার্য্য; কিন্তু এখানে কারণ ও কার্য যেন যুগপৎ একত্র অবস্থিত। অনেকে বলেন—আগে সাধনা, তারপর সিদ্ধি। আমরা কিন্তু দেখি—আগে ফল, তারপর ফুল। বাস্তবিক সূর্য্য ও রশ্মির ন্যায়, সিদ্ধি ও সাধনা যেন সহাবস্থিত।

সে যাহা হউক, সঞ্চিত সংস্কারসমূহ ফলোন্মুখ না হইলেও, উহা প্রারব্ধ ক্ষয়ের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়। কারণ পশ্চাদ্বর্ত্তী পুঞ্জীভূত সংস্কাররাশির চাপ পড়িয়া, প্রারব্ধ সংস্কারগুলির বিনাশের পথ রুদ্ধ হয়। স্থূল দেহের প্রতি একান্ত আসক্তি উহার বহিলক্ষণ, ইহাই মহিষরূপধারী মহিষাসুরের অত্যাচার। ইহার প্রথম আক্রমণ—

গণসৈন্যের উপর। গণসৈন্যের রহস্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসই গণসৈন্য। শ্বাসপ্রশ্বাস ধরিয়াই দেহাত্মভাব ফুটিয়া উঠে। সাধকগণ ইহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা মাতৃযুক্ত হন, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে অবস্থান করেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যায়। আবার যখন দেহাত্মবোধ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তখনই বাহিরে শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়াই পার্থিব দেহে বোধ নামিয়া আসে; তাই ঋষি বলিলেন—মহিষরূপী অসুর প্রথমে গণসৈন্যকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল।

কাশ্চিৎতুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্॥ ২১॥
বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ২২॥

অনুবাদ। মহিষাসুর কতকগুলি গণসৈন্যকে তুণ্ডাঘাতে কতকগুলিকে খুরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গুলাঘাতে, কতকগুলিকে শৃঙ্গাঘাতে বিদারিত করিয়াছিল। অপর কতকগুলিকে স্বকীয় বেগের দ্বারা, কতকগুলিকে গর্জ্জন করিয়া এবং অন্য কতকগুলিকে নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে দেখিতে পাই—মহিষাসুর গণসৈন্যকে বিমথিত করিবার জন্য অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল (১) তুণ্ডপ্রহার (২) খুরক্ষেপ (৩) লাঙ্গুলাঘাত (৪) শৃঙ্গাঘাত (৫) বেগ (৬) নাদ (৭) ভ্রমণ (৮) এবং নিশ্বাস। সাধক! তুমিও দেখ স্থূলদেহের প্রতি একান্ত আসক্তিরূপ মহিষমূর্ত্তি অসুর অর্থাৎ স্থূলত্বপ্রিয় রজোগুণ-সমুদ্ভূত কাম—"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥" এই অষ্টবিধ উপায়ে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া, একেবারে স্থূল—পার্থিব

বিষয়ে নামাইয়া আনিতেছে। তোমাকে বিশুদ্ধ বোধ হইতে, মায়ের স্নেহময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এস, একবার আমরা মায়ের নাম করিয়া, এই অষ্টবিধ উৎপীড়নের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে চেষ্টা করি।

প্রথমেই স্মরণ; অর্থাৎ রূপরসাদি কাম্য বিষয়ের স্মৃতি উপস্থিত হয়। ইহাই মহিষরূপী অসুরের প্রথম উৎপীড়ন। মনে রাখিও, যে শক্তিপ্রভাবে কাম্য বিষয়ের স্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ হয়, উহাই রজোগুণ বা মহিষাসুর। কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইলেই ক্রমে তদ্‌বিষয়ক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ কাম্য বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা চলিতে থাকে। তারপর অকস্মাৎ কোনও স্থানে উক্ত বিষয়ের সহিত সঙ্গ হইয়া পড়ে, ইহারই নাম কেলি। একবার সঙ্গ হইলেই, বিষয় ভোগের যে সুখ, তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারে; তখন প্রেক্ষণ বা অন্বেষণ আরম্ভ হয়। অন্বেষণে অভিলষিত বিষয়ের সন্ধান পাইলে, উহা সংগ্রহ করিবার জন্য গুহ্যভাষণ অর্থাৎ গোপনে পরামর্শ চলিতে থাকে। এরূপ পরামর্শ একাকীও অর্থাৎ কেবল মনবুদ্ধির সহিত চলিতে পারে। পরামর্শ স্থির হইলেই, ইহা লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। এইরূপ ক্রমে সঙ্কল্প হইতে অধ্যবসায় বা তীব্র প্রযত্ন, ও তাহারই ফলে ক্রিয়ানিষ্পত্তি, অর্থাৎ কাম্য বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে। এই আটটী উপায় যে কেবল কামেন্দ্রিয় চরিতার্থতাকল্পে প্রযুক্ত হয়, তাহা নহে। যে কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিষ্ট বিষয়ের সংযোগ হইলেই বুঝিতে হইবে—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যথাযোগ্যভাবে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

মনে কর—তোমার অভীষ্ট অর্থলাভ হইল। দেখ, কিরূপে উহার মধ্যে এই অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে অর্থের স্মরণ হয়। (এই স্মৃতিটা যাহা হইতে হয়, তাহার নাম সংস্কার। ঐরূপ যাবতীয় সংস্কারই রজোগুণের উদ্বেলন মাত্র। এই রজোগুণেরই নাম মহিষাসুর। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।) অর্থবিষয়ক স্মৃতি হইতেই উহার কীর্ত্তন বা আলোচনা হয়। তারপর কোনও অর্থশালী

পুরুষের সঙ্গ হয়, অর্থাৎ কোনও ধনী লোকের আচার ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালীর সংসর্গে আসিয়া পড়িতে হয়। ইহারই নাম কেলি বা ক্রীড়া। তারপরই আরম্ভ হয় প্রেক্ষণ—কোথায় অর্থ আছে, তাহার সন্ধান। অনন্তর গুহ্যভাষণ—কি উপায়ে উহা লাভ করা যায়, তাহার পরামর্শ। এইরূপ ক্রমে সংকল্প ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়া, উহা ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অভীষ্ট অর্থ লাভ হয়। এইবার দেখ—তোমার স্বস্থ চিত্তকে মহিষাসুর কিরূপ উপদ্রুত বিমথিত করিয়া তোলে। স্বস্থ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ বা নাসাভ্যন্তরচারী থাকে, আর এই অষ্টবিধ উৎপীড়নে উহাদের গতি অস্বাভাবিক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তুণ্ডপ্রহার খুরক্ষেপ প্রভৃতি উপায়ে সৈন্যগণকে বিমথিত করার ইহাই তাৎপর্য। মন্ত্রেও "পাতয়ামাস ভূতলে" অর্থাৎ গণসৈন্যসমূহকে তুণ্ডপ্রহার প্রভৃতি অষ্টবিধ উপায়ের সাহায্যে ভূতলে নিপাতিত করার কথাই উক্ত হইয়াছে। বোধময় স্বরূপ হইতে চিত্ত কিরূপে ভূতলে অর্থাৎ স্থূল ভাবে নামিয়া আসে, তাহাই এস্থলে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইল। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিদ্বারাই চিত্তের অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রাণবায়ুর চাঞ্চল্য চিত্তচাঞ্চল্যেরই বহির্লক্ষণ।

শাস্ত্রকারগণ এই স্মরণ কীর্ত্তন প্রভৃতিকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বা অব্রহ্মচর্য্য বলিয়াছেন। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ মিথুনভাব হইতেই উহার উৎপত্তি। তাই ইহাকে মৈথুন বলা হয়। যে কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই, এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিষ্পন্ন হয়। ইহা ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করিবার পক্ষে মহান্ অন্তরায়। ভাবিও না সাধক, শুধু উপস্থসংযম বা বিন্দুনিরোধ করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়। "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্" ইহা ব্রহ্মচর্য্যের বহির্লক্ষণ মাত্র। তুমি চক্ষুদ্বারা ফুলমাত্ররূপে ফুলটি দেখিলে কর্ণ দ্বারা শব্দমাত্ররূপে শব্দশুনিলে, এগুলিও মৈথুন—ইহাও ব্রহ্মচর্যের বিরোধী। যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য তখনই নিষ্পন্ন হইবে—যখন ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও, ব্রহ্মসম্বেদন

ব্যতীত অপর কোনরূপ অনুভূতি আনয়ন করিবে না। যখন তুমি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন "ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই", এই দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেবল তখনই—তুমি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু হায়? ঐরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও আবার "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ"! ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ বিষয় গ্রহণ করিয়া ফেলে। দীর্ঘকাল সৎকারপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুপালন ও অনুশীলন না করিলে, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন বা অব্রহ্মচর্য্যের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশা নাই।

আবার সাধনার দিক দিয়া দেখ— এই স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান যদি আত্মাভিমুখী হয়, তবে উহাই ব্রহ্মচর্য্যের চরম আদর্শ হইয়া থাকে। আরে, ব্রহ্মে বিচরণ করার নামই ত ব্রহ্মচর্য্য! ব্রহ্ম ত আত্মা মা আমার! আচ্ছা, এইবার এক একটী করিয়া দেখিতে থাক। প্রথমেই স্মরণ—মাতৃ-স্মৃতি। যদি গুরুর কৃপা লাভ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছ। ঐ বিশ্বাসই তোমার মূলধন, উহাই রজোগুণের অন্তরমুখী বিকাশ বা পুরন্দর। মহিষাসুর যেরূপ বিষয়ের স্মৃতি লইয়া আসে, পুরন্দর তেমনই মাতৃ-স্মৃতি লইয়া আসিবে। নিশ্চয়ই আসিবে। যে পরিমাণে স্মরণ হইতে থাকে, সেই পরিমাণে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়—মায়ের স্নেহ দয়া মহত্ত্ব স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকে। ঈশ্বরীয় কথা ভাললাগে। গীতাও বলিয়াছেন—"কীর্ত্তয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ"। কীর্ত্তনের পর হয় কেলি—খেলা, স্তব জপ পূজা বন্দনা ইত্যাদি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! যাহাকে তোমারা সাধনা বল, উপাসনা বল, ঐগুলিই খেলা। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি, যিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁকে নিয়া যখন আমরা সাধনা উপাসনা করি, তখন উহাকে খেলা ভিন্ন আর কি বলা যায়? শাস্ত্রও বলেন—"বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং

নামরূপাদিকল্পনম্”, সাধন মাত্রই বালকোচিত ক্রীড়ামাত্র। যত কঠোর তপস্যাই কর, কিংবা যত যোগকৌশল অবলম্বনই কর, মায়ের কাছে উহা ছেলে-খেলা মাত্র। শুন—মাকে পাওয়ার অর্থই—মায়ের হওয়া বা মা হওয়া। অনেকে মনে করেন—ভগবান্‌কে পাওয়া বুঝি, জগতেরই কোন বস্তু পাওয়ার মতন একটা কিছু। তা নয়, তাঁকে পাওয়া মানেই—আপনি তাঁর হওয়া, আপনাকে তাঁর চরণে অর্পণ করা। তাই ত বলি—মাকে পাওয়া, আমাকে দেওয়া ও মা হওয়া, এই তিনই এক কথা। ইহা কি সাধনা করিয়া—খেলা করিয়া হয়? না হইতে পারে? হয়—তাঁর দয়ায়, তাঁর ইচ্ছায়! তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন; তাই জীব আপনাকে দিয়া ফেলে, অথবা আপনাকে হারায়। তবে জগতে যে একটা সাধনার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—উহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার—যখন মা আত্মপ্রকাশ করেন—আসেন, তখন তাঁহার আগমনের পূর্ব্বলক্ষণস্বরূপ কতকগুলি ঘটনা জীবের মধ্যে সংঘটিত হইতে থাকে, উহারই নাম সাধনা। যেরূপ জোয়ার হইলেই জলগুলি ফুলিয়া উঠে, ঠিক সেইরূপ মাতৃ-আগমনের পূর্ব্বলক্ষণস্বরূপ, জীব সাধন ভজনের অনুষ্ঠান করে। আজ পর্য্যন্ত যত লোক মাকে পাইয়াছেন, তাঁহারা কেহই একথা বলেন নাই যে, “আমি সাধনা করিয়া মাকে পাইয়াছি।” সাধনা এবং মা, ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্রবৎ অত্যন্ত বিভিন্ন। যতক্ষণ মাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণই মনে হয়, “আমি কঠোর সাধনা করিতেছি। কিন্তু মাকে পাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সাধনা করিয়া এ জিনিষ পাওয়া যায় না, এমন কোনও উপায় নাই, যাহা দ্বারা মাকে ধরা যায়। আরে, সাধনা বা উপায়গুলি ত' মন বুদ্ধি নিয়া নাড়া চাড়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। মা যে আমার ইহা হইতে বহু দূরে অবস্থিতা। যাহা হউক, আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এস সাধক, আবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই।

বলিয়াছিলাম—কীর্ত্তন হইতে কেলি বা খেলা হয়। খেলা হইতে

প্রেক্ষণ বা অন্বেষণ আরম্ভ হয়। মায়ের পথ চাহিয়া সাধক-সন্তান অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, অথবা মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তারপর গুহ্যভাষণ, মায়ের সন্নিহিত হইয়া যতকিছু আবেদন নিবেদন, যত কিছু সুখ দুঃখের কাহিনী গোপনে প্রাণে প্রাণে চলিতে থাকে। অনন্তর মাতৃ-লাভবিষয়ক দৃঢ় সঙ্কল্প ও তদনুযায়ী অধ্যবসায় বা তীব্র প্রযত্ন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে কেলির সময়ে অর্থাৎ সাধনকালে যে চেষ্টা যত্ন থাকে, তাহা মৃদু বা ভাসা ভাসা কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র। আর এই অধ্যবসায় যখন উপস্থিত হয় (মনে রাখিও, মাকে পাওয়ার পূর্ব্বে যথার্থ অধ্যবসায় আসে না) তখন সাধক প্রাণের টানে, প্রবল আকাঙ্ক্ষায় মহাপ্রাণে মিলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সর্ব্বশেষে—ক্রিয়ানিষ্পত্তি—সর্ব্বকর্ম্মের অবসান বা নৈষ্কর্ম্ম্য। জীব তখন ব্রহ্ম হইয়া যায়। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

আবার বিষয়ের দিক্ দিয়া দেখ—তুমি গোলাপ ফুল ভালবাস। ফুলকে ফুলমাত্র না বুঝিয়া প্রাণ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। ফুলের স্মরণ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের—মায়ের স্মরণ কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। এইরূপে অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণেই তোমার ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইবে। যখন গোলাপ ফুলটী পাইবে, তখন আর মনে হইবে না যে; আমি ফুল পাইলাম। তখন দেখিবে—সত্যই উপলব্ধি করিবে—আমার প্রাণই গোলাপ ফুলের রূপ ধরিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে আসিয়াছেন। এইরূপে যখন বিষয়গুলিকে একমাত্র প্রাণের মূর্ত্তিরূপে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তখনই তুমি যথার্থ রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত আসক্তিবর্জ্জিত সুতরাং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অধিকারী হইতে পারিবে। ইহা শুনিতে যত কঠোর, কার্য্যে পরিণত করা তত কঠিন নহে। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই ইহা প্রকৃতিগত হইয়া যায়। তখন আর চেষ্টা করিয়া বিষয়কে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হয় না। আপনা হইতেই উহা নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে প্রেমলক্ষণ ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহাও এই স্মরণ কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে। অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি—গো। ইন্দ্রিয়প্রবাহ বা শক্তিগুলি—গোপী। পরমাত্মার আকর্ষণে বিষয়াসক্তিরূপিণী গোপীগণ বিষয়রূপ কুল ছাড়িয়া, কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসে। বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া, কৃষ্ণ স্বরূপে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলেই, স্মরণ কীর্ত্তনাদি অষ্টাঙ্গ অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং জাগতিক কার্য্যগুলির মধ্য দিয়াও একমাত্র কৃষ্ণসেবা বা পরমাত্মপ্রীতি ফুটিয়া উঠে। উহাই শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পঞ্চভাবরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বকথিত স্মরণ কীর্ত্তনাদি অষ্টাঙ্গ মৈথুন অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ যখন এইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরূপেই পর্য্যবসিত হয়, তখনই উহা 'প্রেম নাম ধরে'; আর তাহার বিপরীতভাবে যতদিন কেবল স্বকীয় ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত থাকে, ততদিন উহা কাম নামেই পরিচিত হয়। প্রেমে ও কামে এই প্রভেদ। কিন্তু সে অন্য কথা—

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। গণসৈন্যদিগকে নিপাতিত করিয়া, সেই অসুর মহাদেবীর সিংহকে হত্যা করিবার জন্য অভিধাবিত হইল। ইহাতে অম্বিকা কোপ প্রকাশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ উপায়ে গণসৈন্যদলকে বিত্রস্ত করিতে লাগিল। চিত্তকে একবার বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই, সাধকের জপাঙ্গ শ্বাস প্রশ্বাস, সাধারণ জীবের মতই হইতে থাকে, মহিষাসুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সাধক! যখন তুমি শ্বাস প্রশ্বাসগুলিকে মাতৃ-নিশ্বাসরূপে উপলব্ধি করিয়া, দেহাত্ম-

বোধকে শিথিল করিতে যত্ন করিতেছ, ঠিক সেই সময় অন্তরে কোন বৈষয়িক স্মৃতি ফুটিয়া উঠিল, ক্রমে উহা কীর্ত্তন কেলি প্রভৃতির মধ্য দিয়া—ক্রিয়া-নিষ্পত্তিরূপে পরিণত হইল, এইরূপে যেই তুমি স্থূলে বাহ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইলে, অমনি দেখিবে—তোমার সেই যে মাতৃ-নিশ্বাসের উপলব্ধি, তাহা হারাইয়াছ। সেই যে আত্ম-সমর্পণের বিপুল আনন্দ, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছ। আর তোমার সে বৃত্তিনিরোধের অবস্থা নাই। মনে রাখিও—ইহাই মহিষাসুর-কর্ত্তৃক গণসৈন্যের বিনাশ।

কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়াই অসুর নিরস্ত হয় না, সিংহকেও আক্রমণ করে। তোমার জীবভাবের প্রতি যে হিংসা, তাহা রহিত হয়। সাধারণ জীবের মত বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অতিকষ্টে একবার দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে বিশুদ্ধ বোধময় মাতৃ-স্বরূপে অবস্থানপ্রয়াসী হইয়াছিলে, তাহা হইতে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। তুমি যে সত্যই দেবীর বাহন—মাতৃ-শক্তির পরিচালক যন্ত্র-মাত্র, এ বোধ হইতেও তুমি বিচ্যুত হইয়া পড়। সাধক! দেখিও একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মেষ করিয়া তোমার এত যত্ন, এত সাধনা, এক মুহূর্ত্তে যেন সব ব্যর্থ করিয়া, অসুর-শক্তি স্বকীয় সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বসে। যদি সাধক হইয়া থাক, তবে এ অত্যাচার বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতে পারিবে। কিন্তু ভয় নাই। "কোপঞ্চক্রে ততোম্বিকা" মা আমার ক্রোধময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অচিরাৎ এই অসুরের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। (অম্বিকার ক্রোধভাব দেখিয়া) সেই মহাবীর্য্য মহিষাসুরও ক্রুদ্ধ হইয়া, খুর দ্বারা ধরণীপৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চউচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ, এবং ভয়ানক শব্দ করিতেছিল।

ব্যাখ্যা। গণ-সৈন্য নিপাতিত হওয়ার কিছুকালের জন্য সাধক আপনাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করে; ইহাই দুর্ব্বলতা। এইরূপ দুর্ব্বলতা সাধক মাত্রেরই আসিয়া থাকে। অন্তর্নিহিত কামনার বীজগুলি যুগপৎ অঙ্কুরিত হইয়া, সাধককে অতিশয় বিব্রত করিয়া তোলে। নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে দীপ-শিখা যেরূপ অতিশয় উজ্জ্বল হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর যেরূপ আরোগ্য-লক্ষণ প্রকাশ পায়, মহিষাসুরের এই আক্রমণও ঠিক সেইরূপ। জীবের যখন প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত হয়, আবরণ বিক্ষেপাদি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, তখন মনে হয়—যেন তাহার অন্তর হইতে কামনার মূল উন্মূলিত হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সে নিষ্কাম পুরুষ হইতে পারে নাই। তখনও সাধকের অন্তরে কামনার বীজসমূহ লুক্কায়িত থাকে। ঐ গুপ্ত বীজগুলিকে প্রকট করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই মায়ের এই লীলা। ইহাই রজোগুণরূপী মহিষাসুরের চরম আক্রমণ। সাধক! যখন তুমি আপনাকে নিষ্কাম পুরুষ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, তখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিও—তোমার অন্তরে কামনার বীজগুলি গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। অথবা অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। মা স্বয়ংই উহাদিগকে প্রকট করিয়া, অত্যাচারের আকারে তোমার সম্মুখে ধরিবেন। তখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে—উহারা মহীতল খুরক্ষুণ্ণ করিতেছে, অর্থাৎ তোমার পার্থিব দেহ পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল মনই যে বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, তাহা নহে; তোমার স্থুল দেহ—বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও বিষয় আহরণে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিতে পাইবে,—তোমার দেহ ও মন, যে পরিমাণে বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে "আমি মুক্ত হইব, আমি মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থান করিব" প্রভৃতি পর্ব্বততুল্য আশাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; এবং চিত্তক্ষেত্রে নানারূপ বৈষয়িক গোলযোগরূপ নাদ অর্থাৎ কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে অধিকাংশ

সাধকই হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। "আমি বুঝি মোক্ষমার্গে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না" বলিয়া একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

—০—

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ২৫ ॥
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। তাহার ভ্রমণের বেগে মহী ক্ষত বিক্ষত হইয়া বিশীর্ণ ভাব ধারণ করিল। লাঙ্গুলের আঘাতে সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিতে লাগিল। শৃঙ্গের আঘাতে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইতেছিল। এবং নিশ্বাসবায়ুর বেগে উৎক্ষিপ্ত পর্ব্বতসমূহ আকাশ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতেছিল।

ব্যাখ্যা। কি শোচনীয় অত্যাচার! ইহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। মুমুক্ষু সাধকগণ যখন অন্তর হইতে কামনার বীজ সকলকে সমূলে উৎপাটিত করিতে উদ্যম হন, তখন তাহাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ এইরূপ অত্যাচার হইতে থাকে। পূর্ব্বে মহিষাসুরের যে অষ্টবিধ অত্যাচার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহাই তাহার একমাত্র সম্বল। কোথাও দুইটি, কোথাও চারটি, কোথাও ছয়টি, কোথাও বা আটটি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়া থাকে। অসুরের এতদ্ অতিরিক্ত অস্ত্র বা অত্যাচার আর কিছুই নাই। এ স্থলে বেগে ভ্রমণ, লাঙ্গুলাঘাত, শৃঙ্গকম্পন এবং শ্বাসানিলরূপ চারিটী অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা যথাক্রমে, মহী, অব্ধি, ঘন এবং নভঃ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও ব্যোম, এই পঞ্চতত্ত্বই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ঘন শব্দটি বয়ু ও তেজস্তত্ত্বের উপলক্ষণ। যদিও মেঘ জলেরই পরিণামমাত্র, তথাপি বায়ুমার্গেই উহার গতি স্থিতি ও উৎপত্তি বলিয়া ঘন শব্দে এখানে মরুৎতত্ত্বই বুঝিতে

হইবে। মন্ত্রে তেজস্তত্ত্বের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, বিদ্যুৎ-যুক্ততা নিবন্ধন ঘনশব্দে তেজস্তত্ত্বও বুঝিতে হইবে। স্থূল কথা পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের উপরই কামনার যত কিছু অত্যাচর। ক্ষিতিতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু। অপ্ তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা, কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ। তেজস্তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাদ। মরুৎতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাণি এবং ব্যোম তত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্। এইরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং রূপ রস শব্দ স্পর্শ ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয়; এই পর্য্যন্তই কামনার ক্ষেত্র। ইহার উপরে কামনা বলিয়া কিছু নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূতেরই সাত্ত্বিক বা রাজসিক পরিণামমাত্র। সুতরাং কামনার ক্ষেত্র বলিলে,—সংক্ষেপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পর্য্যন্তই বুঝা যায়; তাই মন্ত্রে দেখিতে পাই—মহিষাসুরের অত্যাচার, মহী অব্ধি ঘন (তেজ ও মরুৎ) এবং নভঃ, এই পঞ্চতত্ত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। সাধারণ জীবে ও সাধকে এইখানেই প্রভেদ। বিষয়কে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে গেলে উহা যে অসুরের অত্যাচার হয়, ইহা সাধারণ জীব কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও ধারণা করিতে পারে না। সে মনে করে—উহা পাগলের প্রলাপ মাত্র। আমি চক্ষু দিয়া গোলাপ ফুলটী দেখিলাম, ইহার মধ্যে আবার অসুরের অত্যাচার কি? এই জন্য প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মাত্র তাঁহাদের পক্ষেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই আধ্যাত্মিক রহস্য অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ হইবে।

সে যাহা হউক, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বিষয়রূপ কামনা-ক্ষেত্রে যাহাদের আবির্ভাব হয়, উহারাও যে বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, চৈতন্য বা প্রাণই যে উহার একমাত্র সত্তা, এইরূপ উপলব্ধি হইতে সাধক যে মুহূর্ত্তে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই উহারা পৃথক্‌রূপে সত্তাবান্ হইয়া চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিবার জন্যই অত্যাচারের অভিনয়।

সাধক! তুমিও তোমার চিত্তক্ষেত্রে লুক্কায়িত কামনারাশির কার্য্যকলাপ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ কর। দেখিবে—উহারা যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সত্য সত্যই মহী বেগভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা হয়। এইরূপ আকস্মিক কামনার বেগে কত সাধক যে অপনাদিগকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে স্খলিত বলিয়া মনে করে, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যখন প্রবলভাবে কামনার বেগ প্রবাহিত হয়, তখন যথার্থই নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও হীন বলিয়া মনে হয়। উচ্চ সাধনা, কঠোর তপস্যা, অলৌকিক যোগশক্তি, সকলই যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তারপর "লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ"। পুচ্ছদ্বারা আহত হইয়া সমুদ্র সর্ব্বত্র প্লাবিত করিয়া দেয়। অব্ধি শব্দে কেবল জলসমুদ্র না বুঝিয়া, রসের সমুদ্র, এবং পুচ্ছ শব্দে কর্ম্মফল বুঝিয়া লও। পুচ্ছ—কামনারূপ অসুরের চরম অবয়ব। কর্ম্মফলই কামনার চরম প্রতিষ্ঠা। উপনিষদেও পুচ্ছ প্রতিষ্ঠারূপেই উক্ত হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট কর্ম্মফলের মোহে সাধক একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হইতে পারে—উহা অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য; কিন্তু যে রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া, সাধক যাবতীয় বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষার পরপারে চলিয়া যাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সেই রসসমুদ্র নগণ্য বিষয়াসক্তিদ্বারা তরঙ্গায়িত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কেবল ইহাই নহে, শৃঙ্গাঘাতে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড হইতে থাকে। শৃঙ্গ—উত্তমাঙ্গ। মেঘ—তেজ ও মরুৎ-তত্ত্ব। বিষয়-চিন্তনে দেহস্থ তেজ ও মরুৎতত্ত্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উহারা প্রতিনিয়ত বৈষয়িক স্পন্দন নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে, শ্বাস প্রশ্বাসের যে সমতা—নাসাভ্যন্তরচারিতা, তাহাও দূরীভূত হয়। উহারা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বৈষয়িক চিন্তা উপস্থিত হইলেই, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি যে অস্বাভাবিক হয়, ইহা একটু ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন। যতক্ষণ মাতৃ-নিশ্বাস বলিয়া বোধ থাকে, ততক্ষণ উহাদের গতি অতি মৃদু—উদ্বেলনশূন্য থাকে;

কিন্তু যেই বিষয় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি উহারা অতি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-লাভ বিষয়ক অন্তরের পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ আশাগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইতে থাকে। ইহাই মন্ত্রস্থ—শ্বাসানিলের বেগে পর্ব্বত-পতন কথাটীর তাৎপর্য্য।

এইরূপ যত অত্যাচারই আসুক, তুমি সাধক তুমি মাতৃলিপ্সু সন্তান, তুমি অবসন্ন হইও না, হতাশ হইও না। নিজের অঙ্গে বিরুদ্ধ কর্ম্মফলের মলিনতা দেখিয়া, মায়ের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইও না। নিজের মলিনতার চিন্তা করিও না, বিষয়ের—সংসারের চিন্তা করিও না। চিন্তা যদি করিতে হয়, মাতৃ-চিন্তাই করিও। বিষয়ের মধ্যে চিন্তা করিবার মত কিছু নাই। জগতের কার্য্যগুলি উপস্থিতমতে সাধারণ জ্ঞানেই বেশ সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। চিন্তা করিয়া, মাথা খাটাইয়া, জগতের কোন কার্য্যই করিতে হয় না। আমরা বহুদিন যাবৎ বিষয় চিন্তা করিয়া এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে চিন্তা বলিলেই বিষয়ের চিন্তা বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিক কিন্তু জগতের কার্য্যগুলি চিন্তা ব্যতীতও বেশ সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। যেরূপ ক্ষুধা হইলে আহার করি, মলমুত্রের বেগ আসিলে, উহার নিঃসারণ করি, এ সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে একটা চিন্তা করিতে হয় না; ঠিক সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন, বিষয় সংরক্ষণ ইত্যাদিও চিন্তা ব্যতীত বেশ নিষ্পন্ন হইতে পারে—যদি মাতৃ মুখী চিন্তাপ্রবাহ থাকে। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। "আমি ছাড়া আর কিছুই নাই! সুতরাং চিন্তা করিবে ত' আমারই চিন্তা কর। এইরূপ করিলেই তোমার যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করিব—তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আমি বহিয়া আনিয়া দিব।"

মা, বুঝিলাম তোমাকে ভাবিতে পারিলে, আর আমাদের অন্য কোন ভাবনাই থাকে না। কিন্তু তাহা যে পারি না। বারংবার অনাবশ্যক বিষয় চিন্তা আসিয়া চিত্তক্ষেত্রকে আকুল করিয়া তোলে।

তোমার ভাবনা ছাড়িয়া, কতক্ষণে বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত হইব, সেই অবসর খুঁজিতে থাকি। একটু যদি তোমার কথা নিয়া বসি, তবে কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকি—কতক্ষণে বিষয় চিন্তায়, বাজে কার্য্যে নিযুক্ত হইব।

মাগো, এমনই আমাদের বহির্মুখী প্রকৃতি। এমনই আমাদের প্রতি মহিষাসুরের অত্যাচার। বুঝি—ইহা অন্যায়, বুঝি—ইহা অত্যাচার; তথাপি মা, উহাই যে ভাল লাগে। বিষয় যে বড় প্রীতিকর! মাগো কতদিনে আমাদের আসুরিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে? কতদিনে আমরা কেবল তোমারই চিন্তায় কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইব? কতদিনে আমাদের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক প্রীতি তোমাতে পর্য্যবসিত হইবে? কতদিনে আমাদের সকল ভালবাসা কেন্দ্রীভূত হইয়া আত্মারূপিণী মা তোমাতেই পর্য্যবসিত হইবে? কতদিনে পরমপ্রেমের আস্বাদে আমাদের জীবন ধন্য হইবে? মাগো, সন্তানের এ আশা কতদিনে পূর্ণ হইবে?

—০—

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ॥ ২৭॥

অনুবাদ। এইরূপে সেই মহাসুর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অভিপতিত হইতেছে দেখিয়া, চণ্ডিকা তাহাকে বধ করিবার জন্য কোপ প্রকাশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে এই মহিষ যখন সিংহের প্রতি প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল, তখনও মা একবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে ক্রোধে জীবের যাবতীয় সঞ্চিত কামনার মূল শিথিল হইয়াছে। আবার কিছু পরেই আমরা দেখিতে পাইব, আবার দেবতাগণ বলিতেছেন—"রুষ্টা তু কামান সকলানভীষ্টান্"। মা রুষ্টা হইলেই সন্তানের যাবতীয় কামনা বিধ্বস্ত হয়। এখানেও মায়ের কোপে তাহাই হইতেছে—জীব এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যে সে আর সঞ্চিত কামনার বিন্দুমাত্র উদ্বেলনও দেখিতে চায় না। অথচ লুক্কায়িত কামনার

বীজগুলি মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধককে উৎপীড়িত করে। তাই মা দেখিলেন—এখন আর নীরব থাকিলে চলিবে না, শুধু ক্রোধ করিলে চলিবে না। এ অসুরকে নিহত করিতেই হইবে। যে পরিমাণ ক্রোধের উদ্দীপনা হইলে উহার নিধন সাধন হইতে পারে, মা আমার সেই পরিমাণ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"তদ্‌বধায় কোপমকরোৎ"। অসুর-নিধনোপযোগী ক্রোধের বিকাশ হইয়াছে। ইহাঁই মায়ের আমার চণ্ডিকা-মূর্ত্তি। তাই ঋষিও মন্ত্রে "চণ্ডিকা" শব্দটির প্রয়োগ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সন্তান যেখানে উৎপীড়িত, মাতা সেখানে কুপিতা ; ইহাই চণ্ডিকা-মূর্ত্তির রহস্য। আমরা যে শত অত্যাচারেও উৎপীড়িত হই না! তাইত মা আমার চণ্ডিমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন না। যে মূহূর্ত্তে আমরা সত্যসত্যই আমাদিগকে উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পারিব, সেই মূহূর্ত্তেই মাতৃ বক্ষে স্নেহের বন্যা উঠিবে, মা সন্তানকে অসুরত্রাস হইতে মুক্ত করিবেন। ইহাই মাতৃত্ব। নতুবা মা কি? ওরে মাকে বলতে হয় না—"মা আমায় ভয় হইতে পরিত্রাণ কর"। যথার্থ ভীত হইলে, মা স্বয়ংই পরিত্রাণ করেন। আমরা মুখে সহস্রবার বলি—"ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ"। কিন্তু প্রাণে কি সত্যই ভবসাগরকে দুঃখদায়ক বলিয়া বুঝিয়াছি। তাহা নহে, উহা দশজনে বলে, তাই আমিও বলি মাত্র। মা আমাদের প্রাণ দেখেন। যেদিন বুঝিব এই ভবটা যথার্থই দুস্তর সাগর, সেদিন আর "ত্রাহি মাং" বলিতে হইবে না। বলিবার পূর্ব্বেই মা বক্ষে তুলিয়া লইবেন। আমরাও দুস্তর ভবসিন্ধু অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাইব। ঐ দেখ সাধক। তোমার প্রাণে যথার্থই উৎপীড়ন বোধ ফুটিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য স্নেহময়ী মা নির্নিমেষ-নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। ওগো, কবে তোমরা সত্য সত্যই মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে?

—০—

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৮ ॥
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ২৯ ॥
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভুন্মহাগজঃ ॥ ৩০ ॥
করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩১ ॥
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। দেবী পাশ নিক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বদ্ধ করিলেন, সেও সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়াই মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন সে খড়্গপাণি পুরুষরূপে দেখা দিল। দেবী সেই খড়্গচর্ম্মধারী পুরুষমূর্ত্তিকে বাণদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অসুরও তখন মহাগজের রূপ ধারণ করিয়া, দেবীর বাহন মহাসিংহকে শুণ্ড দ্বারা আকর্ষণ ও ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবীও সেই আকর্ষণকারী হস্তীর শুণ্ড খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন। অনন্তর সেই মহাসুর পুনরায় মহিষ-রূপ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সচরাচর ত্রিলোককে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। তাৎপর্য্যবোধে সুবিধা হইবে বলিয়া পাঁচটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা একত্র সন্নিবেশিত হইল। এই মন্ত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—মহিষাসুর যখন সিংহের প্রতি অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল তখন দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাশবদ্ধ মহিষ তখন সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিল। সিংহের মস্তকছেদন করিতে না করিতে, সে খড়্গপাণি পুরুষরূপে দেখা দিল। দেবী বাণপ্রহারে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। অমনি মহাগজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া

শুণ্ডদ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবী তাহার শুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। তখন সে মহিষমূর্ত্তিতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ অষ্টবিধ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল।

বড় সুন্দর রহস্য! এস সাধক, আমরা মাতৃ-চরণ স্মরণ করিয়া এই রহস্যে অবগাহন করি। তিনি আমাদের ধী উন্মেষিত করুন। আমারা চণ্ডীর রহস্য সম্যক্ অবগত হইয়া সংশয়ের পরপারে চলিয়া যাই।

প্রথম মহিষাসুরের পরিবর্ত্তিত রূপগুলির বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক। (১) মহিষ (২) সিংহ (৩) খড়্গপাণি পুরুষ (৪) মহাগজ (৫) পুর্নমহিষ। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি নিহত হইলে, পর পর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সঞ্চিত কামনারাশির প্রথম অত্যাচার—মহিষ রূপধারী অসুরের উৎপীড়ন। ইহা পূর্ব্ব মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি—সিংহ। জীব যখন কামনার প্রতি হিংসা করিতে আরম্ভ করে, তখনই মহিষ সিংহরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কথাটা একটু পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। জীব সঞ্চিত কামনারাশির উৎপীড়নে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া, উহার ধ্বংস করিবার জন্য সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে। স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল বা পর্ব্বত কন্দর আশ্রয় করে। ইহারই নাম কামনার মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহরূপ ধারণ। জীব এতদিন শুধু বাসনা দ্বারা উৎপীড়িত হইত, এইবার বাসনা-ত্যাগের বাসনা দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে। মনে রাখিও—বাসনা-ত্যাগের বাসনাও বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অন্তরে বাসনার বীজগুলি পুঞ্জীভূত থাকে; আর বাহির হইতে নানারূপ কঠোর সংযম ব্রত নিয়মাদির সাহায্যে উহাদিগের উদ্বেলন নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা খুব উচ্চতম অবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহা বাসনার বেশ পরিবর্ত্তনমাত্র। গৈরিক বস্ত্র পরিধান কিংবা বৃক্ষতলে বাস করিবার বাসনাও বাসনা। তত্ত্বজ্ঞগণ এতদুভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পান না। একজন সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যদি মনে করেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া

ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছি; তবে তাহা অপেক্ষা, যিনি অট্টালিকাস্থিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, মাতৃ-অঙ্কে শয়নের সম্বেদনে পুলক-কণ্টকিত হন, তিনি যে সমধিক ত্যাগী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছিলাম—বাসনা-ত্যাগের বাসনাও অসুরের অত্যাচার। মা এইরূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের শিরশ্ছেদ করেন অর্থাৎ বাসনার প্রতি হিংসা-ভাব পোষণ করাও যে, বাসনারই রূপান্তর মাত্র, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তখন আর ত্যাগের বাসনাও থাকে না। এই অবস্থায় কমনা অন্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। সে মূর্ত্তি—খড়্গপাণি পুরুষ! খড়্গপাণি শব্দটি ছেদন-তাৎপর্য্যবোধক! মাতৃ-কৃপায় জীব যখন বুঝিতে পারে—ত্যাগের বাসনাও বাসনা, তখন আর যাহাতে চিত্তক্ষেত্রে কামনার বীজ কোনরূপে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করে। সে উপায়—বৃত্তি-নিরোধ। ইহাই খড়্গপাণি পুরুষ। কোনরূপে যদি চিত্তের বৃত্তি-প্রবাহকে নিরুদ্ধ করা যায়, ভাল মন্দ, ত্যাগ গ্রহণ, কোনরূপ বৃত্তিকে আর প্রকাশিত হইতে দেওয়া না যায়, তবেই সকল আপদ বিদূরিত হয়; এইরূপ মনে করিয়া জীব প্রাণপণে বৃত্তি-নিরোধে যত্নবান হয়। কাটিয়া ছাটিয়া সব বাদ দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য, ইহাই খড়্গপাণি পুরুষের আবির্ভাব। কিন্তু মা অচিরে বাণনিক্ষেপে এই পুরুষকেও দ্বিখণ্ডিত করেন, অর্থাৎ স্নেহের সন্তানকে ধীরে ধীরে দেখাইয়া দেন—বৃত্তিনিরোধরূপ ব্যাপারটিও চিত্তের ধর্ম্ম। ব্যুত্থান চঞ্চলতা বিক্ষেপ, ওগুলি যেরূপ চিত্ত-ধর্ম্ম, ঐ নিরোধনামক অনুষ্ঠানটীও ঠিক সেইরূপ চিত্তেরই একপ্রকার ধর্ম্ম মাত্র। যোগসূত্রকার স্বয়ং পতঞ্জলিদেবও ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের উদ্দেশ্য আত্মলাভ। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ চিত্ত-ধর্ম্ম লাভ করা তাহার লক্ষ্য নহে। অবশ্য এরূপ নিরোধেও একটা অব্যক্ত সুখ আছে। পাঁচ মণ ভারবাহী ব্যক্তির মস্তক হইতে যদি ভারটি নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে যেরূপ অনেক স্বস্তি বোধ করে, বৃত্তি-নিরোধেও ঠিক সেইরূপ সুখ আছে। মুহুর্মুহুঃ একটার পর একটা তরঙ্গ আসিয়া চিত্তক্ষেত্রকে

স্পন্দিত করিতেছে, একটি বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতেই, আর একটি আসিয়া চিত্ত-ক্ষেত্রে উঁকি মারিতেছে। এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কোনরূপে যদি ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই ত পরম লাভ। এইরূপ মনে করিয়াই জীব বৃত্তি-নিরোধে যত্নবান হয়। কিন্তু পরম সুখ বা যথার্থ শান্তি এইখানে নাই। চিত্তটা শান্তিক্ষেত্রে নহে। নিরুদ্ধই হউক বা বিক্ষিপ্তই হউক, ওখানে যথার্থ শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি পাইতে হইলে বুদ্ধিরও উপরে উঠিতে হইবে। আত্মক্ষেত্রে—অমৃতময় মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিতে হইবে। যেখানে চিত্ত বলিতে, বৃত্তি বলিতে নিরোধ বলিতে কিংবা বিক্ষেপ বলিতে কিছুই নাই, সেখানে যাইতে হইবে। শুধু মাথার বোঝা ফেলিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে যথার্থ শান্তিলাভ হয় না, রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়। যে আসন মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, সেইখানেই—স্নেহময়ী মায়ের মধুময় অঙ্কে অবস্থান করিতে হইবে—আত্ম-সংস্থ হইতে হইবে, যেখানে গেলে ভ্রান্তি সংশয় অজ্ঞান চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়, সেই আমার পরমধামে অবস্থান করিতে হইবে, এই তত্ত্ব মা যখন কৃপা করিয়া জীবকে উপলব্ধি করাইয়া দেন, তখনই বৃত্তিনিরোধের প্রতি জীবের যে প্রবল আসক্তি, তাহা দূরীভূত হয়। ইহাই দেবী কর্ত্তৃক খড়্গ-পাণি পুরুষের নিধন।

অতঃপর মহাগজরূপে আবির্ভাব। গজ্ ধাতুর অর্থ বন্ধন। মহাগজ শব্দের অর্থ মহাবন্ধন। যে বন্ধন ছেদন করা দুরূহ, তাহাই মহাবন্ধন। এই অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, বৃত্তি নিরোধ, বাসনা ত্যাগ, কিংবা সাময়িক মাতৃ-অঙ্কে অবস্থান, যাহাই করি না কেন, বাসনার অত্যাচার হইতে একেবারে পরিত্রাণ কিছুতেই পাওয়া যায় না। যতক্ষণ কৌশলের সাহায্যে বৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক শূন্যবৎভাবে সুষুপ্তবৎ অবস্থান করা যায়, ততক্ষণ বেশ কাটিয়া যায়; কিন্তু নিরোধ ত চিরস্থায়ী হয় না, আবার ব্যুত্থিত হইতে হয়। অথবা মা-ও ত' দীর্ঘকাল স্বকীয় অঙ্কে স্নেহের পরশে

সন্তানকে ধরিয়া রাখেন না, আবার ছাড়িয়া দেন। তখন যে পুনরায় কামনা দেখা দেয়! যতক্ষণ আত্ম-সংস্থ হইয়া থাকা যায়, ততক্ষণ উহাদের নাম গন্ধও থাকে না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার অনাত্ম বোধ ফুটিয়া উঠে। পুনঃপুনঃ এইরূপভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় কামনা-জয় একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সাধক তখন অতিশয় ব্যথিত হইতে থাকে। "হায়! এই অব্যক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছুই উপায় নাই!" এইরূপ ভাবিয়া জীব কিছু দিনের জন্য যেন হতাশ হইয়া পড়ে। ইহাই "তঞ্চকর্ষ জগর্জ্জ চ"—ইহাই মহাগজরূপধারী মহাসুরের আকর্ষণ গর্জ্জনরূপ আক্রমণ। তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখা যায়—জীব যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তখনই সে বদ্ধ। বাস্তবিক, বন্ধন বা মুক্ত বলিতে কিছুই নাই। নিত্য মুক্ত নিত্য স্বাধীন পরমাত্মার বন্ধনজ্ঞান কল্পনামাত্র—একটা লীলা মাত্র। তথাপি জীবের পক্ষে কিন্তু এই বন্ধনজ্ঞানই সুদুর্লভ। বহু জন্মের পর, বহু সাধনার ফলে মায়ের কৃপায় জীব আপনাকে যথার্থই বদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। ওরে! বন্ধনজ্ঞান হওয়াটাই ত সাধনার ফল! মুক্তি সাধনার ফল নহে। মুক্তি তো নিত্য—চিরমুক্ত। বন্ধনবোধ হয় কই? মুখে সহস্রবার বলা যায়—আমি বদ্ধ; কিন্তু বন্ধন যে কোথায় তাহা জীব প্রথমে বুঝিতে পারে না। সাধারণ জীবের বন্ধনজ্ঞান—সংসারের উৎপীড়নজন্য একপ্রকার আনুমানিক জ্ঞানমাত্র। বদ্ধ অবস্থায় যথার্থ উপলব্ধি তাহাদের হয় না। কিন্তু মা আমার স্নেহের সন্তানকে মুক্তির আস্বাদ ভোগ করাইবেন; তাই আজ মহাবন্ধনের স্বরূপটি জীবের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিলেন। তাই আজ মহিষাসুর মহাগজ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। ক্ষণকালের তরেও মুক্তির আস্বাদ না পাইলে, যথার্থ বদ্ধভাবের উপলব্ধি হয় কি?

বন্ধন বন্ধন বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ জগতে বহুদিন হইতে উঠিয়াছে আজকাল নয়, দার্শনিক যুগের বিষয় আলোচনা করিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়—বন্ধন-জ্ঞানটা এদেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। "আমরা বদ্ধ জীব" এইরূপ ভাবনা করিতে ভারত যেদিন হইতে

শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে কেবল যে মায়ের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা নহে, বাহিরের বন্ধনও ভারতবাসীকে জর্জ্জরীভূত ও অবসন্ন করিতেছে। কিন্তু সে অন্য কথা—

ওগো আমারা যে কল্পতরু-মূলে বসিয়া আছি! এখানে বসিয়া যাহা ভাবিব, তাহাই যে পাইব! তাহাই যে সত্য হইবে! শোন—একটা গল্প বলিতেছি। একজন পথিক অতিশয় শ্রান্ত হইয়া, প্রান্তর-মধ্যস্থ এক বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। তখন গ্রীষ্মকালের দারুণ মধ্যাহ্ন, পিপাসায় পথিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে ভাবিতে লাগিল—আহা, এই সময় একটা ডাব নারিকেল যদি পাই, তবে প্রাণটা রক্ষা পায়; নতুবা আজ পিপাসায় প্রাণ গেল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই পথিক দেখিতে পাইল—তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর ডাব নারিকেল রহিয়াছে। দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু উহাকে কাটিবার মত কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে না থাকায় হতাশভাবে অস্ত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ কাটারি নিপতিত দেখিয়া, আহ্লাদে নারিকেলটি কাটিয়া জল পান করিল ও সুস্থ হইল। তখন আস্তে আস্তে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় একখানা শয্যার আবশ্যকতা অনুভব করিল। অমনি পার্শ্বদেশে একখানি শয্যা খট্বাসহ স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। তখন প্রফুল্লচিত্তে সেই বৃক্ষচ্ছায়াস্থ শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি! যাহা ভাবি, তাহাই পাই, এ ত বড় চমৎকার! আচ্ছা ভাল, এ সময়ে যদি কোন স্ত্রীলোক আসিয়া আমার পদসেবা করে, তবে বড়ই আনন্দে নিদ্রা যাইতে পারি। এই চিন্তা করিতে না করিতেই দেখিতে পাইল—একটি সুন্দরী রমণী পদতলে উপবিষ্টা। সে হাত বাড়াইয়া পদসেবা করিতে উদ্যত হইতে, পথিকের মনে বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। তাইত! এ সব ভৌতিক ব্যাপার নাকি? জনহীন প্রান্তরে এই সকল ঘটনা, ভূতের কার্য্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে! এ নিশ্চয়ই ভূত আসিয়াছে। এই স্ত্রী মূর্ত্তি ভূত! সর্ব্বনাশ, এখনই যদি আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে কি হইবে?

যেমন চিন্তা, অমনি সেই স্ত্রীলোকটি ভূতরূপে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া অদৃশ্য হইল। পথিক জানিত না, সে যে বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছিল, উহা কল্পবৃক্ষ।

ঠিক এইরূপেই আমরাও নিত্য কল্পতরু মূলে বসিয়া ভাবিতেছি —"আমি বদ্ধ" তাই আমাদের বন্ধন কিছুতেই বিদূরিত হয় না। প্রথমে স্ত্রীপুত্রাদিকেই বন্ধন মনে করি, তারপর এই দেহটাকে বন্ধন বলিয়া বুঝিয়া লই, আর যাহারা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে বন্ধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ত শীর্ষ স্থানীয়। জগতে তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। যদিও বর্ত্তমান বেদান্তদর্শন এ সকল বন্ধনকেই কল্পিত মিথ্যা ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি উহার হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পান নাই। তাঁহারা বলেন—জ্ঞানলাভ হইলে, অর্থাৎ একবার ভ্রান্তি দূর হইলেও ভ্রান্তির ফল কিছুকাল থাকে। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইয়া, ভয় পলায়ন হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষ্মণ প্রকাশ হইবার পরমুহূর্ত্তেই রজ্জুজ্ঞান হইলেও, অর্থাৎ সর্পভ্রান্তি রিদূরিত হইলেও, পূর্ব্বলব্ধ ভীতিভাব—হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণগুলি কিছুক্ষণ থাকিয়া যায়; ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও কিছুকাল মায়ার অধ্যাস থাকে। থাকুক, যাঁহারা মায়াকে বন্ধন বলেন, তাঁহারা বন্ধন দেখুন। আমাদের মায়াও মা; সুতরাং মায়ার বন্ধন আমাদিগের নিকট মায়ের স্নেহালিঙ্গন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আমরা নিত্য মুক্ত। আমরা মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্ন শিশু; সুতরাং আমাদের বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। আরে জগৎটা যে মায়ার বা মায়ের খেলা; ইহা ঠিক ঠিক যেদিন বুঝিতে পারিবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে—এ জগৎ আমারই খেলা। আবার আমার খেলা বলিয়া যেদিন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে—খেলা বলিয়া কোথাও কিছুই নাই। কেবল "আমি" আছে। না—তখন আমি শব্দও থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? যদি "আমি"-শব্দশূন্য "আমি" বস্তুটাকে ধারণা করিতে পার, তবে তাহার কিছু আভাস পাইবে।

ওঃ, সে কি মধুময় অবস্থা! কি আনন্দময় সে স্বরূপ! জানিনা কোন কোন সাধক কি করিয়া বলেন—"চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল"। তাঁহারা বুঝি মনে করেন—নির্ব্বিকল্প অবস্থাটা সুষুপ্তিবৎ আমিবোধশূন্য অন্ধকারময় একটা কিছু। তা নয় গো তা নয়। উহা পরম জ্ঞানময়, পরম আনন্দময়, পরম প্রেমময় অবস্থা। ভোগ্য নাই, ভোক্তা নাই, কেবল আনন্দস্বরূপ। ওগো এখানে যে চিনি না হইলে, চিনির আস্বাদ পাওয়া যায় না। ইহা ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করিব? যাহা হউক, সে অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া, আবার জগৎ-খেলা দেখি—সে যে আমারই খেলা! আ-মা'রই খেলা গো! আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই খেলা করি। "স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি"। আমার ইচ্ছা হয়েছে—স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগের লীলা বিলাস কর্‌বো, তাতেই আমি সুখী হবো, তাই খেল্‌ছি। যেদিন আর ভাল লাগবে না, যে দিন আর এই জগৎস্বপ্ন দেখবার ইচ্ছা হবে না, সেই দিন সব ছেড়ে একেবারে উলঙ্গ আমি এ খেলার পরপারে চলে যাব। এখন একবার "আমিকে" দেখবো, আবার জগৎ খেলায় যোগ দিব। ইহার মধ্যে বন্ধনই বা কোথায়, আর মুক্তিই বা কোথায়? যোগশাস্ত্র বলেন—বিষয়াসক্ত চিত্তই বন্ধন, আর নির্ব্বিষয়-চিত্তই মুক্তি। যাঁহারা বিষয়কে "আমি" হইতে পৃথক্ একটা সত্তারূপে দেখেন, তাঁহাদের চিত্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, বিষয়াসক্তি থাকিবে; সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধন দেখিবেন ও প্রাণপণে বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা দেখেন—সবই আমি, সবই মা, তাঁহাদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নাই, বিদ্বেষও নাই। ত্যাগ নাই, গ্রহণও নাই; তাই তাঁহাদের বন্ধন নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু এ সকল অন্য কথা নিয়া আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

মহাগজ বা মহাবন্ধন-জ্ঞান হইতেই জীবের নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ হয়। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলেই, জীব নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়।

ইহাই এই মন্ত্রস্থ "চকর্ষ" পদের তাৎপর্য্য। মা আমার দয়া করিয়া জীবের এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণটা দূর করিয়া দেন। ইহাই—"কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত" রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাহারা মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারা যতই বন্ধন-জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হউক না কেন, তাহাতে তাহাদের নিম্নগতি সূচিত হয় না। কারণ, তাহারা জানে—"আমি" নিত্যমুক্ত। যাহারা সর্ব্বাবস্থায়ই মাতৃ-চরণ জড়াইয়া ধরিয়া আছে—আকর্ষণ তাহাদের কি করিবে? না না, তাহারা মাকে ধরে নাই। মা স্বয়ং তাহাদের হাত ধরিয়াছেন, সুতরাং মহাগজ যতই আকর্ষণ করুক না কেন, কিছুতেই অধঃপাতিত করিতে পারিবে না। আমাদের দুর্ব্বল হস্ত দ্বারা মাকে ধরিয়া থাকিলে বরং হাত ছাড়াইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমরা যে সর্ব্বতোভাবে মায়ের হাতে ধৃত হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং সে হাত হইতে আমাদের স্খলন কখনই সম্ভবপর নহে।

সে যাহা হউক, এইরূপে মায়ের খড়্গাঘাতে মহাগজমূর্ত্তি দ্বিখণ্ডীকৃত হইল—বিমল বিজ্ঞান-আলোকে কল্পিত বন্ধনের স্বরূপ অপনীত হইল। তখন অসুর পুনরায় মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিল। সঞ্চিত কামনার বীজগুলি নানারূপে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিয়াও যখন কিছু করিতে পারিল না, বরং প্রত্যেক ছদ্মবেশটীই মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন অগত্যা পুনরায় সেই মহিষমূর্ত্তিতে—প্রকাশ্য কামনা বাসনার আকারে পূর্ব্বোক্ত স্মরণ কীর্ত্তনাদি অষ্টবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিল। ঐ আটটী ব্যতীত কামনার অন্য কোন অস্ত্র নাই, তাই মন্ত্রে—"তথৈব ক্ষোভয়ামাস" বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূতল এবং ব্যোমমণ্ডলকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল, এইবার ত্রিলোকব্যাপী অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। মূলাধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত এক লোক, মণিপুর হইতে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত একলোক, এবং বিশুদ্ধ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত অপর এক লোক। সহস্রার লোকাতীত, তাই সেখানে অসুর অত্যাচার পৌঁছায় না। মণিপুর পর্য্যন্ত ভূলোকীয় বা পার্থিব অত্যাচার, অর্থাৎ পুত্র ধন যশ প্রতিপত্তি প্রভৃতির কামনা। বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত ভুব বা

দেবলোকীয় অত্যাচার, অর্থাৎ দয়া ক্ষমা উদারতা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতির কামনা, আর আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সিদ্ধিশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্ব-ভাবাধিপত্য ইত্যাদি ঐশ্বরিক শক্তিবিষয়ক কামনার অত্যাচার। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মহিষাসুর সচরাচর ত্রিলোককে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মনে রাখিও—এ সকল কামনা আগন্তুক নহে—সঞ্চিত সংস্কারমাত্র। অসুর ক্রমে উচ্চ উচ্চ লোকীয় কামনার বীজগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া, তোমার চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে। উদ্দেশ্য—তোমার অলক্ষ্য দুর্ব্বলতা তোমাকে দেখাইয়া দিয়া চিরদিনের তরে আত্মরাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখিবে। কিন্তু ভয় নাই—সাধক, যখন তুমি মায়ের কৃপায় এই উচ্চস্তরীয় কামনাগুলিকে অসুরের অত্যাচার বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমার কোন ভয় নাই। মাতৃ-কৃপায় অচিরে এ অত্যাচার হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইবে।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥ ৩৩॥

অনুবাদ। অনন্তর ক্রুদ্ধা জগন্মাতা পুনঃ পুনঃ উত্তম মধু পান, এবং আরক্ত নয়নে হাস্য করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নানাপ্রকারে আত্মরূপ পরবর্ত্তিত করিয়া সিংহকে বিমথিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু মাতৃ-অস্ত্রপ্রভাবে সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে; ইহা দেখিয়াও যখন আবার পূর্ব্ববৎ অত্যাচার হইতে নিরস্ত হইল না, তখন মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, এইবার স্বহস্তে তাহাকে নিধন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মধুপান করিতে লাগিলেন। মধুপান-রহস্য কিছু পরে বিবৃত হইবে। মা পুনঃ পুনঃ মধুপান করিয়া আরক্ত নয়নে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাই মহিষাসুর নিধনের পূর্ব্বরূপ। দেখিয়াছ সাধক, মায়ের আমার সে হাস্যময়ী আরক্ত নয়নের মুখভঙ্গিমা? স্নেহ ও ক্রোধ, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, রক্ষা ও ধ্বংস, অভয় ও ভীষণ, এই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাব যুগপৎ যে মুখে ফুটিয়া উঠে, সেই মুখ গো, সেই মুখখানা। মায়ের

আমার সে হাস্য ক্রোধময়ী মুখভঙ্গীমার কথা স্মরণ করিলেও যে বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠে! মা যে আমাদিগকে কত ভালবাসেন, তাহা মায়ের সেই মুখভঙ্গিমায়ই সম্যক্ প্রতিভাত। তাই বলিতেছিলাম—মায়ের সে রক্তিম আননের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা যদি না দেখিয়া থাক তবে এখনও আপনাদিগকে যথার্থ উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পার নাই। এখনও বিষয়রস পানকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছ। তাই মা আমার চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে এখনও দেখা দেন নাই। ঐ বিষয়রসই যে অসুরের অত্যাচার; আর সেই অত্যাচারে তুমি জর্জ্জরীভূত। শত পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াও তুমি সেই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছ না দেখিয়া, যখন "ত্রাহি মাং শরাণগতম্" বলিয়া একবার কাতর প্রাণে মায়ের দিকে তাকাইবে, তখনই দেখিবে—মা আমার রণচণ্ডিকা মূর্ত্তিতে আবির্ভূ্তা হইয়াছেন। আনন্দমধুপানে মায়ের নয়নত্রয় আরক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে। ওষ্ঠাধরে অপূর্ব্ব হাস্য বিকাশ পাইতেছে।

বিপদে পড়িয়া রোগে শোকে অভাবে উৎপীড়িত হইয়া, অনেক সময়ে আমরা মায়ের শরণাগত হইতে চেষ্টা করি। সে সময়েও আমরা মাকে চাই না, মায়ের কৃপামাত্র প্রার্থনা করি। উদ্দেশ্য—বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং মা-ও সে সকলস্থলে যথাযোগ্য কৃপামাত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। আত্মস্বরূপটী প্রকাশ করেন না। কিন্তু যখন আমরা এই জীবত্বকেই একটা মহা উৎপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিব, এই ঘন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়াটাকেই আসুরিক অত্যাচার বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই মা আমার অসুর-দলনী চণ্ডিকা-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

—০—

ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। বলবীর্য্য-মদগর্ব্বিত সেই অসুরও ভয়ানক গর্জ্জন এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। সাধক! মায়ের প্রতি এই পর্ব্বতনিক্ষেপের ব্যাপারটা একবার বুঝিয়া লও; পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য কামনারাশি—আমাদিগের অন্তর্নিহিত বহুজন্মসঞ্চিত বাসনারাশিই পর্ব্বত আকারে মাতৃ-অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ওগো দেখ—আমাদের এক একটা শৈশব-প্রার্থনা—ছেলেমানুষের মত চাওয়াগুলি পূর্ণ করিতে মাকে কত কষ্ট কত দুঃখ পাইতে হয়। জ্ঞানে অজ্ঞানে যাহা চাহিয়া ফেলিয়াছি, তাহা দিতে গিয়া, সেই বাসনাগুলির মূল উৎপাটন করিতে গিয়া, স্থিরা শান্তিময়ী মাকে কতই অস্থিরা হইতে হয়, কতই অশান্তি ভোগ করিতে হয়। ভাবিও না জীব, তোমার তুচ্ছ বাসনাটীও ব্যর্থ হইবে। প্রত্যেক বাসনাই পর্ব্বত। উহা মহিষের শৃঙ্গাঘাতে—রজোগুণকৃত উদ্দীপনা-প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাতৃ-অঙ্গে আঘাত করিতেছে। ওগো, মায়ের আমার কমনীয় বপু আমারই বাসনা-পর্ব্বতের গুরুতর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তবু মা আমারই—আর কাহারও নয়, শুধু আমারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন—কবে আমি একটিবার—বেশী নয়, একবার মাত্র মা বলিয়া ডাকিব; এ স্নেহ কি ভাষায় ব্যক্ত হয়? মা! আর না, আর কখনও কিছু চাহিব না; কিন্তু যাহা চাহিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে কত ব্যথাই সহ্য করিতে হইতেছে। মাগো! এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, বাসনার আঘাত আমাকে যত ব্যথা দেয়, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক তোমায় ব্যথিত করে। আমি উদ্দাম লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কামিনী-কাঞ্চন চাহিয়াছি, আর তুমি—আমার মা, তুমি স্বয়ং সেই কামিনী-কাঞ্চনের রূপ ধরিয়া আসিয়া, আমার উদ্দাম বাসনা-অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছ। এরূপ একদিন নয়, দুই দিন নয়, কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। ওগো, যে তুমি হরি-হরব্রহ্মাদিরও ধ্যানের অগম্যা, সেই তুমি আমার কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, কত ছোট হইয়া, কত স্থূল হইয়া প্রকাশ পাইতেছ। কত অজ্ঞাতভাবে আসিয়া আমার ইন্দ্রিভোগ্য পদার্থরূপে উপস্থিত হইতেছ। মা, একবার তোমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম না। একবার সরল-প্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া

ডাকিলাম না! এত অকৃতজ্ঞতার ভার কিরূপে বহন করিব মা? এতই কঠোর আমাদের হৃদয় যে, এ কৃতঘ্নতার গুরুভারে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায় না! বুকটা ফাটিয়া শতখণ্ড হয় না! মা! আমাদিগের এ বুকটা কি একটা বজ্র দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলি?

শুধুই কি তাই! যদি কখনও সত্য সত্যই মা বলিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াই, যদি কখনও তোমার আগমনের বিন্দুমাত্র আভাস পাই অমনি "হর পাপং হর ক্ষোভং হরাশুভং" বলিয়া আমাদের যতকিছু মলিনতা, অপবিত্রতা তোমার ঐ বিশুদ্ধ অঙ্গে মাখাইয়া দেই। ওগো! যাহারা পুত্র, যাহারা মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে; তাহারা কত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম বিশ্বাসের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তোমার রাতুল চরণ সাজাইয়া দেয়। আর আমরা এমনি অধম অকৃতী সন্তান যে, তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া অকৃতজ্ঞের মত মূঢ়ের মত, বলিতে থাকি "নাও মা আমার পাপ-তাপ নাও মা আমার আধি-ব্যাধি, নাও মা আমার মলিনতা, আর গ্রহণ কর আমাদের অনাদি জন্ম-সঞ্চিত প্রকটিত-অপ্রকটিত বাসনা সংস্কার।" মাগো! আর কতকাল এমনি করিয়া তোকে কলুষিত করিব? আর কতদিন আমাদের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, আমাদের মলিন সংস্কাররাশি, তোমাতে অর্পণ করিয়া, তোমার বিশুদ্ধ চিন্ময় দেহ কলঙ্কিত করিব মা?

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেনচূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূত মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। দেবী সেই অসুরনিক্ষিপ্ত পর্ব্বতগুলিকে শর-নিকর নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, গর্ব্বিতভাবে আরক্ত মুখে তাহাকে বলিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। অনেক জন্ম-সঞ্চিত বাসনার বীজগুলি যখন রজঃশক্তি প্রভাবে ফলোন্মুখ হয়, তখন মা সেগুলিকে রাশীকৃত করিয়া শর-প্রয়োগে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। যেরূপ একরাশি পত্রকে উপর্য্যুপরি

সজ্জিত করিয়া, একটি শর দ্বারা সকল পত্রকেই যুগপৎ বিদ্ধ করা যায়, সেইরূপ মা আমাদের অপ্রকটিত সংস্কাররাশিকে প্রকট করিয়া, জন্ম-কর্ম্মরূপ শরপ্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া থাকেন। এস্থলে জন্ম-কর্ম্মরহস্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী সহজবোধ্য হইবে।

বহুজন্ম-সঞ্চিত বাসনার বীজ নিয়া, তবে জীব জন্মগ্রহণ করে। যে জন্মে জীব মায়ের জন্য কাঁদিয়া উঠে, আত্মরাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইতে যত্নশীল হয়, সেই জন্মে অনেক জন্মভোগ্য কর্ম্মসংস্কারগুলি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। যে কর্ম্মগুলির ফলভোগ করিতে দশ বিশটা জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত, সেইগুলির ভোগ মায়ের কৃপায় দুই এক জন্মেই শেষ হইয়া যায়। ইহাই মাকে ডাকিবার ফল। নতুবা তাঁহাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বাভাবিক গতিবশে একদিন নিশ্চয়ই ত জীব মাতৃ-অঙ্কে স্থান পাইবে? তা সে যত বড় পাপী, যত বড় মূর্খই হউক না কেন! মা একদিন কোলে তুলিয়া লইবেনই। তবে আর তাঁকে ডাকিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই শরবেধ। অনেক জন্ম ধরিয়া যাহা ভোগ করিয়া করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইত, তাহা দুই এক জন্মেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। যখন জীব ভোগ ব্যতীত, অথবা অল্পভোগে বহু কর্ম্মসংস্কার ক্ষয় করিতে অভিলাষী হয়, তখনই জীব মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। যে মহারাজ সুরথের উপাখ্যান লইয়া এই দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে, তিনিও লক্ষ পশুর খড়্গাঘাত লক্ষ জীবনে ভোগ না করিয়া, মাতৃ-কৃপায় এক জীবনেই ভোগ শেষ করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ হয় বলিয়াই ভগবৎমুখী জীবের অনেক স্থলে সাংসারিক জীবনে নানাপ্রকার রোগ শোক অসুখ অশান্তি লাঞ্ছনা গঞ্জনা ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়। এই সকল দেখিয়া সাধারণ লোক হয়ত মনে করিবেন—আহা! অমুক লোকটা এমন সাধুপ্রকৃতি নিষ্ঠাবান্ ভক্ত, তথাপি ভগবান্ তাহার উপর কতই না অত্যাচার করিতেছেন। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পায়—উহা অত্যাচার বা ভগবানের নিষ্ঠুরতা নহে। নিষ্ঠুরতার আবরণে অসীম করুণাধারা।

দুষ্ট ব্রণ হইতে সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে হইলে, অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকই প্রয়োজন। রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেও, তিনিই যে রোগীর যথার্থ কল্যাণকামী তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সে যাহা হউক, এইবার মা আনন্দ-উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল কণ্ঠে অসুরকে একটী কথা বলিলেন। পরবর্ত্তি-মন্ত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। যে যেরূপ অর্থ করুন, আমরা মদোদ্ধৃত শব্দের আনন্দবিহ্বল অর্থই বুঝিয়া লইব। হর্ষ অর্থেই মদ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়।

———

দেব্যুবাচ।

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে মূঢ়! আমি যতক্ষণ মধু পান করি, ততক্ষণ তুমি গর্জ্জন কর। আমা কর্ত্তৃক তুমি নিহত হইলে, দেবতাগণ এইখানেই শীঘ্র গর্জ্জন করিবেন।

ব্যাখ্যা। মা মহিষাসুরকে মূঢ় সম্বোধন করিলেন। যাঁহার প্রকাশে সমস্ত অজ্ঞান-গ্রন্থি খসিয়া পড়ে, সেই চিন্ময়ী মা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। জীব আজ মায়ের চরণে শরণাগত হইয়াছে, ভাবাতীতা নিত্যশুদ্ধা মায়ের সন্ধান পাইয়াছে : তথাপি এখনও মহিষাসুর জীবের প্রতি অত্যাচার করিতে নিরস্ত হয় নাই ; তাই সে মূঢ়। মা বলিলেন —আমি মহাপ্রাণরূপিণী সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি, জীব আমারই স্নেহের সন্তান, সে উৎপীড়িত হইয়া আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, আমাকেই একান্ত আশ্রয় বলিয়া বুঝিয়াছে। এখনও রে মূঢ়! তুই সঞ্চিত সংস্কারের মোহে আমার সেই স্নেহের সন্তানকে উৎপীড়িত করিতেছিস্? এখনও আমার সন্তান বাসনা-বিজড়িত-বক্ষে ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল অভিনয় করিতেছে? এখনও তোকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পূর্ণভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে না। এখনও আমার

মহতী আকর্ষণীশক্তি, তোর অত্যাচারের গণ্ডী হইতে সন্তানকে সবেগে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া আমার বক্ষোলগ্ন করিতেছে না? তাই তোর গর্জ্জন! তাই তোর আস্ফালন। তবে শোন্—যতক্ষণ আমার মধুপান শেষ না হইবে, ততক্ষণ তুই গর্জ্জন কর্। কিন্তু অচিরাৎ তুই আমারই হস্তে নিহত হইবি, দেবতাগণ প্রফুল্ল হইবেন।

মধু শব্দের অর্থ—আনন্দ। আনন্দই মায়ের স্বরূপ। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" যিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আর কিছুতেই ভীত হন না। নিরঞ্জন সর্ব্বভাবাতীত ব্রহ্ম যখন আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া, পরস্পর ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে আনন্দলীলার অভিনয় করেন, স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যখন তিনি লীলাবশতঃ আপনাতে যেন আনন্দের অভাব কল্পনা করিয়া দ্বৈতভাবাপন্ন হয়েন, তখন হইতেই একদিকে আনন্দের অন্বেষণ চলিতে থাকে। আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার নাম হইল তখন—আনন্দের ভোক্তা বা দ্রষ্টা। আবার অন্যদিকে স্বয়ং তিনিই আনন্দের পসরা লইয়া প্রকৃতিরূপে—বিষয়রূপে ভোক্তার সহিত যেন লুকোচুরি খেলিতে লাগিলেন। ইহারই নাম ভোগ্য বা দৃশ্য। এই যে ভোক্তা ভোগ্যের মিলন ও বিরহ, এই যে আনন্দের অন্বেষণ ও তল্লাভের লীলারস, ইহাই মধু। সাধক! একবার ধীরে সন্তর্পণে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ—জগৎময় এইরূপে মায়ের আমার অশ্রান্ত মধুপান চলিতেছে। আমরা মায়ের মধু, মা আমাদের মধু। আমরা মধুরূপিণী মহামায়াকে পান করি, আবার মাও আমাদিগকে লইয়া লীলা-মধুপান করেন। প্রতিপরমাণুরূপ জীবাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব ও দেবতাবৃন্দ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মধুর অন্বেষী। মধুই যাঁহার স্বরূপ, তিনি যেন মধুহারা হইয়া মধুর অন্বেষণরূপ লীলা করিতে লাগিলেন। ইহাই সৃষ্টির মূল রহস্য। "কোথায় মধু" বলিয়া একদিন আমরা মধুময় অবস্থা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছি। তিল তিল করিয়া মধুপান করিতে করিতে, একদিন আবার সেই নিত্য মধুময় স্বরূপেই উপনীত হইব। এই যে মধুর অন্বেষণ ও সমাপ্তি,

ইহাই সৃষ্টি ও প্রলয়। এই যে দেখিতে পাও—কপর্দ্দকহীন শত মুদ্রার আশা করে। শত মুদ্রা লাভ হইলে, সহস্র মুদ্রার আশা পোষণ করে। সহস্র মুদ্রা লাভ হইলে, লক্ষ মুদ্রার আশা হয়। এইরূপে কিছুতেই যে আশার নিবৃত্তি হয় না, উহার হেতু—যথার্থ মধুর অভাববোধ। মধুর অভাববোধ থাকে বলিয়াই, জীব যতদিন আত্ম-মধুকে না পায়, ততদিন পাগলের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করে। বড় আদরে গোলাপ ফুলটা বুকে ধরিয়া মনে করিল —"মধু পাইলাম"। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার অন্য একটার জন্য ছুটিতে হয়, তখন আর এ ফুলে মধু পায় না! এইরূপ 'কত জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে। যতদিন এই মধুর কেন্দ্র খুঁজিয়া না পাইবে, যতদিন পূর্ণ মধুচক্র নির্ম্মিত না হইবে, ততদিন জীবের এই মধুকর-বৃত্তি, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি—লোক হইতে লোকান্তরে গতির নিবৃত্তি হইবে না।

এই মধু কোথায় আছে? সর্ব্বত্রই আছে, অথবা কোথাও নাই। মধুময়ীকে বাদ দিলে, কোথাও মধু নাই। কেবল তৃষ্ণা, কেবল উৎকণ্ঠা আর মধুময়ীকে দেখিলে—সর্ব্বত্রই মধু বিরাজিত। মধুর অভাব কোথাও নাই। আমরা যে বিষয় ভোগ করিয়া আনন্দ পাই, সে আনন্দ বিষয়ের নহে, উহা আমাদের অন্তরস্থিত মধু—মধুময়ী মায়েরই মধু। প্রথমখণ্ডে এ কথা একবার বলা হইয়াছে; তথাপি আবার সেই কথার আলোচনা করিব। "শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ম্," "শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ"।

একটু ধীরভাবে শোন—বুঝতে চেষ্টা কর। একমাত্র পরমাত্মাই আনন্দ বা মধু। মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধিই পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতেই পরমাত্মার বিশেষ প্রকাশ। এই বুদ্ধি যতক্ষণ বিষয়ান্বেষী ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক আহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশ করা রূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ জীব কিছুতেই মধুর সন্ধান পায় না। মন প্রতিনিয়ত একটার পর একটা বিষয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরণ করিয়া

বুদ্ধির সম্মুখে ধরিতেছে ও বুদ্ধির আলোকে বিষয়গুলিকে প্রকাশিত করিয়া লইতেছে। যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির লাভ না হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় মনের বিশ্রাম নাই ; সুতরাং বুদ্ধিরও অবকাশ নাই। কিন্তু যেই অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়, অমনি ক্ষণকালের জন্য মন বিষয়াহরণ হইতে নিরস্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিরও একটু বিশ্রাম লাভ হয়। তখন—সেই মুহূর্ত্তে বুদ্ধি আপনাতে প্রতিবিম্বিত পরমাত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া লয় ; ইহারই নাম জীবের মধুপান, বা বিষয়ানন্দলাভ। সাধারণ জীব মনে করে "আমি বিষয় ভোগ করিয়া—কামিনী কাঞ্চনের সম্ভোগ করিয়া আনন্দ পাইতেছি"। কিন্তু বাস্তবিক বিষয়ে আনন্দ নাই, আনন্দ আমাদেরই অন্তরে। কুক্কুর যেরূপ শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে নিজের মুখই ক্ষত বিক্ষত করিয়া, সেই ক্ষত হইতে নির্গত রুধির দ্বারা লিপ্ত অস্থিকে রসময় বোধ করে, ঠিক সেইরূপ জীব স্বকীয় অন্তরস্থ মধু বিষয়ে মাখাইয়া বিষয় ভোগের আনন্দ সম্ভোগ করে। সাধক! পুনঃ পুনঃ চিন্তা, বিচার ও অনুশীলনের দ্বারা এই সত্য একবার উপলব্ধি করিয়া লইলে, তোমার বিষয়ের প্রতি আসক্তি নিশ্চয়ই তিরোহিত হইবে।

দেখ জীব! তোমার ভোগ্য-বস্তুতে আনন্দ নাই, আনন্দ তোমারই অন্তরে। বিষয় সম্ভোগের আনন্দ বিষয়ে নাই, উহা তোমারই অন্তরে। তোমারই অন্তরস্থিত গুপ্ত মধুকে উদ্দীপ্ত প্রকাশিত করিবার জন্যই তোমার এই বিষয়াহরণ—এই জন্ম-মৃত্যু। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যেন মন্থন, বুদ্ধি বা অন্তরটা যেন ক্ষীরসমুদ্র আর এই মন্থনের ফলে উত্থিত হয়—অমৃত বা মধু। একদিকে আত্মাভিমুখে নিবৃত্তিমুখী আকর্ষণ, অন্যদিকে বিষয়াভিমুখে প্রবৃত্তিমুখী বিকর্ষণ। প্রতিজীবে প্রতিমুহূর্ত্তে এই সমুদ্রমন্থন চলিতেছে। কোন্ অনাদিকাল হইতে এই মন্থন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? বৃহদারণ্যকের ঋষি জগৎময় এই অমৃতের পূর্ণ আস্বাদ পাইয়াই উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন—"এই পৃথিবী সকল প্রাণীর মধু, আবার সকল প্রাণীই এই পৃথিবীর মধু। এই জল সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত এই জলের

মধু। এই বায়ু সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত এই বায়ুর মধু। এই আকাশ সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত এই আকাশের মধু। এই প্রাণ সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত এই প্রাণের মধু। এই আত্মা সর্ব্বভূতের মধু সর্ব্বভূত এই আত্মার মধু।" ওগো দেখ—সকলেই সকলের মধু। যাহারা বিশ্বময় এই মধুর সন্ধান পায়, তাহারা আনন্দে গান করে—"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

সাধক! আর কতদিন অজ্ঞানে মধু পান করিবে? একবার জানিয়া শুনিয়া এই মধু পান কর। একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ—তোমার অর্থাৎ জীবের মধুপান বলিতে বাস্তবিক কিছু নাই, সর্ব্বত্র একমাত্র মায়েরই মধুপান চলিতেছে। নিত্যানন্দময়ী নিত্য মধুময়ী প্রতিনিয়ত এই মধু পান করিতেছেন। মা জানেন—"সবই যে আমি। সর্ব্বভূতে একমাত্র আমিই সতত বিরাজিতা সুতরাং এ জগৎ আমারই মধুপান।" তাই বলিতেছেন—"হে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জ্জন কর্।" যতদিন জীব মাতৃ-চরণে সম্যক্ আত্মসর্পণ না করে ততদিন কিছুতেই মায়ের এই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, ততদিন কিছুতেই মায়ের সর্ব্বতোব্যাপী এই মধুপান প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। মা নিজেই যে জীবহৃদয়ে বাসনার অনলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, আবার নিজেই যে বিষয়রূপে সেই অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া আত্ম-মধুপানের অপূর্ব্ব লীলা সম্পাদন করেন, এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মাতৃ-চরণে একান্ত, আত্ম-নিবেদন আবশ্যক। যতদিন মায়ের এই মধুপানের নিবৃত্তি না হয়—যতদিন মা এই বহুত্বলীলা হইতে বিরত না হন, ততদিন কিছুতেই এ অসুর গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

ওগো, দেখ তোমরা, একবার মায়ের মধুপান। তুমি কাঞ্চনের আশায় দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছ, উহা মায়েরই মধুপান মাত্র। তুমি রোগের জ্বালায় নরক-যাতনা ভোগ করিতেছ, উহা মায়ের মধুপান মাত্র। তুমি প্রিয়জনের বিরহে দুর্ব্বিসহ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছ, উহাও মায়েরই মধুপান। ইহা যদি বুঝিতে পার, তবেই

তোমার জীবনও মধুময় হইবে। দুঃখ কষ্ট জন্ম মৃত্যু রোগ শোক কিছুই থাকিবে না।

আমরা কিন্তু বলি, মা! তোর আর এই লীলা-মধু পান করিয়া কাজ নাই। নিত্যা মধুমতী মা আমার! তোমাতে কি মধুর অভাব আছে যে, লীলা করিয়া বিষয়-ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া, আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বিন্দু বিন্দু করিয়া মধুপান করিতে হইবে। ওগো আমার মধুসিন্ধু! এ বিন্দু বিন্দু মধুপান পরিত্যাগ কর! যেখানে পান করিয়া মধুর আস্বাদ লইতে হয় না, যেখানে মধু ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যেখানে ভোক্তা ভোগ্য নাই, যেখানে কেবল মধু; সেইখানে আমাদিগকে নিয়ে চল মা! আর যে তোর এ লীলামধুপানের তাণ্ডবনৃত্য সহ্য করিতে পারি না মা! যদিও ইহা তোমার পক্ষে মধুপান, তথাপি আমাদের পক্ষে কিন্তু ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু, এই হাসি কান্না, এই মন বুদ্ধি, এই বিষয় ইন্দ্রিয়, এই ধ্যান ধারণা, এ সকলই তোর মধুপান হইলেও, আমাদের পক্ষে ইহা বিষপান সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকে এই বিষের হাত হইতে পরিত্রাণ কর মা। একদিন বিশ্বেশ্বর বিশ্বরক্ষাকল্পে সমুদ্রমন্থনজাত বিষপান করিয়া হতচেতন হইয়াছিল, আর তুই সেই সময় উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার নীলকণ্ঠে তোর মধুময় হস্তামর্ষণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের মৃতুভয় বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলি। আজ আমরাও এই করাল বিষয়-বিষপানে জর্জ্জরীভূত হইতেছি; ঠিক তেমনি করিয়া আমার পাগলিনী মায়ের মত, স্নেহের উন্মাদনায় ছুটিয়া আয় মা, আমাদিগকে বিষের জ্বালা হইতে রক্ষা কর্ মা! একবার তোর অমৃতময় হস্তে আমাদের এই বিষবিদগ্ধ দেহ স্পর্শ কর, আমরা শান্তিলাভ করি—অমর হইয়া যাই মাগো, বিষয় যে বিষ নয়, মধু মাত্র; মধুই যে বিষয়ের আকারে উদ্ভাসিত, এই সত্যে জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দে, জগৎ বিষের জ্বালা ভুলিয়া যাউক, মধুপান করিয়া মধুময় হউক। আর এই দীন সন্তান জগতের সরল সত্য হাসিতে হাসি মিলাইয়া, আনন্দে বাহু তুলিয়া জয় মা ধ্বনি করিয়া ধন্য হউক। কিন্তু সে অন্য কথা।

যতদিন মায়ের মধুপান শেষ না হইবে, ততদিনই অসুরের অত্যাচার থাকিবে। তবে ভরসা এই যে, মা বলিতেছেন—"ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ"। "আমি তোমার আমিত্বকে নিহত করিব এবং দেবতাগণ শীঘ্রই আনন্দে গর্জ্জন করিবেন। এক আমি ছাড়া, আর একটা "আমি"রূপে যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছ, ঐটীকে বিনাশ করিয়া দিব। তখন দেবতাগণও—(ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গও) শেষবার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আমাতে মিলাইয়া যাইবেন।" এ রহস্য শুম্ভবধে প্রকটিত হইবে। শুম্ভবধ না হওয়া পর্য্যন্ত, যথার্থ আমিত্বের বিলয় হয় না। মহিষাসুরবধ তাহার পূর্ব্বায়োজন মাত্র। কামনা-বিলয় ও অহংনাশ এক কথা নহে। হ্যাঁ অহং নাশ হইলে, কামনা থাকে না, ইহা সত্য; কিন্তু মা প্রথমে কামনা বিলয় করিয়া, তারপর অহংনাশ করেন, ইহাই-মায়ের লীলা-রহস্য!

ঋষিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবী এইরূপ বলিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন এবং পাদদ্বারা আক্রমণ করতঃ তাহার কণ্ঠদেশে শূলাঘাত করিলেন।

ব্যাখ্যা। কামনার উপরে মাতৃ-অবস্থানই মহিষের উপর মায়ের আরোহণ। কামনা বলিতে এখানে কেহ পার্থিব ফল কামনামাত্র বুঝিও না; যাঁহাদের পুত্রবিত্তাদিবিষয়ক ফলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা এখনও চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার মত সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অধিকারী হইয়া অর্থাৎ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তবে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে যাহা সংঘটিত হয়, তাহাকে

সাধনা না বলিয়া মাতৃ-লীলাদর্শন বলিলেই ভাল হয়। এই লীলার প্রথমেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মবীজ বিনষ্ট হয়। তারপর সঞ্চিত কামনার মূল উৎপাটিত হয়। এস্থলে কামনা শব্দে ইচ্ছা বা আরম্ভ বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা যতবার কামনা বাসনা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার প্রায় সকলস্থানেই ঐ শব্দগুলি আরম্ভ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আসক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠানকেই কামনা বলা যায়। পঞ্চদশীকার এই ইচ্ছার ত্রিবিধ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মেচ্ছা, পরেচ্ছা এবং অনিচ্ছা। তন্মধ্যে আত্মেচ্ছায় কার্য্যের আরম্ভকেই কামনা বা মহিষ বলিয়া বুঝিবে। সাধারণ লোক যেরূপ প্রবৃত্তির তাড়নায়, ফলের লোভে কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এই চণ্ডীতত্ত্বের সাধকগণ সেরূপভাবে কার্য্য কখনই করেন না, বা করিতে পারেন না। কোনও বিশিষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তথাপি কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জাগে, ইহাই চণ্ডীর কামনারূপী মহিষ। সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে—ইহারাও বুঝি আমাদের মতন প্রবৃত্তির দাস, নতুবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন? বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা কার্য্য করেন মাত্র। কেন করেন, তাহার উত্তর হয়ত নিজেও দিতে পারেন না। তবে সমস্ত কার্য্যের মূলে একটা সিদ্ধান্ত তাঁহাদের স্থির আছে, তাহা মাতৃ-প্রীতি। নিত্যতৃপ্তা মায়ের প্রীতি-সাধন উদ্দেশ্যেই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবিষ্ট সাধকের কর্ম্মানুষ্ঠান। আহার নিদ্রা ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যবহারিক কর্ম্ম-গুলিও ঐ মাতৃ-প্রীতি-সাধন উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। গীতার সেই "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" মন্ত্রের ইহাই সিদ্ধাবস্থা। যে কোনও কার্য্যেরই আরম্ভ হউক না কেন, উহা মাতৃ-অর্পণময় হইয়াই আরম্ভ হয়। এই অবস্থাটীর নাম—মহিষের উপর মাতৃ-আরোহণ। এইরূপে মা যখন মহিষ-মর্দ্দিনীমূর্ত্তিতে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন, তখন তাহার সঞ্চিত কর্ম্মাশয় হইতে, যেরূপ কর্ম্মেরই স্ফুরণ হউক না কেন, উহার উপরিভাগে মায়ের পাদাক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্যের আরম্ভ-রূপ মহিষের অত্যাচার হইতেছে বটে, কিন্তু উহার উপরে মাতৃ-সত্তা বিদ্যমান। মা স্বয়ং কামনার উপরে অধিষ্ঠিতা। পদ দ্বারা মহিষ

বিশেষভাবে আক্রান্ত ; তথাপি অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয় না দেখিয়া মা উহার কণ্ঠে—শূলাঘাত করিলেন। শূল শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কণ্ঠ—বাক্যস্থান। যে দ্বার দিয়া সংস্কারগুলি ভাষার আকারে প্রকাশ পায়, সেই স্থানে সংহরণশক্তির প্রয়োগ করিলেন। ইহাই কণ্ঠদেশে শূলাঘাত শব্দের তাৎপর্য্য। যদি কোনওরূপে ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে আর সংস্কারগুলি আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া, স্থূলে আসিয়া জীবকে অত্যাচার-প্রপীড়িত করিতে পারিবে না। মনে রাখিও—মৌনী হইয়া থাকিলেই, ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ হয় না। ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান না পাইলে, যথার্থ মৌনী হওয়া যায় না। যদিও ভাষাই ভাবের শরীর, তথাপি ভাষাশূন্য ভাবও আছে ; উহা আয়ত্ত হইলেই জীব মুক্তির আস্বাদ পায়। যে চিন্তায়, যে স্মরণে, যে ধ্যানে কোনরূপ শব্দের সাহায্য নিতে হয় না, সেই স্বরূপে উপস্থিত হওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য। যাঁহারা ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা শব্দশূন্য চিন্তা বা ধ্যানের কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি—একদিন সকলেই—সাধক মাত্রেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। যাহা ভাবাতীত যাহা ত্রিগুণরহিত, যাহা হইতে বাক্য ফিরিয়া আসে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর জীব যেরূপ অনুভূতি লাভ করে, তাহাই শব্দশূন্য অবস্থা। তাহাকে ধ্যান, সমাধি বা স্মৃতি যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার। বাস্তবিক কিন্তু ইহার একটাও নহে। যেস্থান হইতে মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আসে, সেস্থানে শব্দ কিরূপে যাইবে ? যাহা হউক, যদি কোনরূপে ভাব-উদ্বোধক ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবেই কামনারূপী মহিষের শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে ; তাই মহিষ-মর্দ্দিনী মহিষের কণ্ঠদেশে শূলাঘাত করিলেন। এই অবস্থায় কামনাগুলি সম্যক্ মাতৃময় হওয়ায় আর কামনার উদ্দীপক ভাব বা ভাষা পর্য্যন্ত থাকে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই অপূর্ব্ব ফল। জগৎময় প্রত্যেক পদার্থে এবং অন্তরে প্রত্যেক চিন্তায়, প্রাণরূপিণী মাতৃ-দর্শনের অভ্যাসে, সাধকের অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। সে সর্ব্বত্র অখণ্ড প্রাণময়

সত্তার সন্ধান পায়। তাহার আর জাগতিক কাম্যবস্তু কিছুই থাকে না; সুতরাং সাধারণ জীবের মত বদ্ধভাবও থাকে না। তাহার কাম কাঞ্চনও মা; ধ্যান ধারণাও মা। মা ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পায় না। কারণ মা স্বয়ংই যে মহিষের উপর আরোহণ করিয়াছেন। খুলিয়া বলি—আত্মসমর্পণকারী সাধকের নিজস্ব চেষ্টা বলিয়া কিছু না থাকিলেও, কর্ত্তৃত্বাভিমান একেবারে বিদূরিত হয় না। সেই জীব-কর্ত্তৃত্ব নিয়া যতদিন সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভ্যাস করে, ততদিন একটু ত্রুটি থাকিয়া যায়—যথার্থ সত্যের ও প্রাণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সত্যবস্তুকে অনুষ্ঠান-সাধ্য বলিয়া মনে করে। তারপর মা দয়া করিয়া মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। অর্থাৎ রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের ছদ্মবেশে লুক্কায়িত প্রাণরূপিণী মা বিষয়ের ভিতর দিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। সাধক তখন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র মায়ের এইরূপ আবির্ভাব দেখিয়া ধন্য হয়। আরে! রূপরসাদি বিষয়গুলিই তো কামনা বা মহিষের মূর্ত্তি। ঐ গুলিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই কামনা বা মহিষ বিমর্দ্দিত হয়, অর্থাৎ জড়ত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়, চৈতন্যময় স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই মহিষের পৃষ্ঠে মায়ের আরোহণ বা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে মায়ের আবির্ভাব। এই অবস্থায় সাধক মহাপ্রাণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিতে চেষ্টা করে। প্রাণময়ী মা ব্যতীত সাধকের অন্য কোন ভাষাই থাকে না। ইহাই মহিষের কণ্ঠে দেবীর শূলাঘাত।

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই অসুরও দেবীর পদভরে আক্রান্ত হইয়া, স্বকীয় মুখ হইতে (মহিষমূর্ত্তির মুখ হইতে) অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেবীর অতিশয় বীর্য্যবশতঃ নিরুদ্ধ হইয়া রহিল। অর্থাৎ তাহার সমুদয় অবয়ব নির্গত হইতে পারিল না।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর যখন দেখিল এত করিয়া—এত বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হইয়াও জীবের আত্মাভিমুখী গতি কিছুতেই নিরুদ্ধ করিতে পারা গেল না, তখন অগত্যা স্বকীয় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল—মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অসুরমূর্ত্তি অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইল। মা যখন মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন, অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়গুলিও প্রাণময়—মাতৃময় হইয়া প্রকাশ পায়, রজোগুণের বহিরাগত স্থূল ভাবগুলি যখন দূরীভূত হয়, তখন স্বয়ং রজোগুণের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। কার্য্য-শক্তি বিনষ্ট হইলেই কারণ-শক্তির প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এতদিন মুল রজোগুণরূপী কারণ-শক্তির দিকে জীবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, শুধু তাহার অত্যাচার বা কার্য্যগুলি নিয়াই ব্যস্ত ছিল। এখন কামনাগুলি মাতৃময় হইয়াছে, মা মহিষ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, সুতরাং কার্য্য-শক্তি বা অত্যাচারও প্রশমিত হইয়াছে। এইবার সাধক অত্যাচারের যাহা মুল স্থান, তাহার সমীপস্থ হইয়া দেখিতে পাইল, একমাত্র রজোগুণই উহার মূল হেতু। উহাই মহিষাসুরের নিজমূর্ত্তি। এবার সেই মূর্ত্তি মহিষের কণ্ঠদেশ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই, মা স্বকীয় শক্তি প্রয়োগে উহার বহিরাগমন প্রয়াস ব্যর্থ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—আত্মেচ্ছায় কার্য্যের আরম্ভই কামনা। আরম্ভ গুলি মাতৃময় হইলেও উহার পাশে পাশে রজোগুণের উদ্বেলন-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যখন মাতৃ-স্নেহে এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, মাত্র দেহরক্ষার উপযোগী যতটুকু আরম্ভ আবশ্যক, তদতিরিক্ত আর কোন কার্য্যের আরম্ভই সহ্য করিতে পারে না, যখন আরম্ভ-গুলিকে অতীব কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইতে থাকে, তখন ঐ আরম্ভের মূলের প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তখন সে বুঝিতে পারে—বীজ বা কারণ থাকিলে, সে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেই। ইহাই প্রকৃতির শাশ্বতিক নিয়ম। সেখানে কারণ বিদ্যমানসত্ত্বেও কার্য্য উৎপত্তি হয় না, বুঝিতে হয়—সেখানে কোনও প্রবল প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক থাকিলেও কারণ তাহার

কার্য্যজনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে বিরত হয় না। যদি কখনও কারণের কার্য্যজনন-প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হয়, তখন আর তাহার কারণত্বই থাকে না। তাহাকেই কারণ বলে—যাহা সতত কার্য্যজনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট। মনে কর, একটা সুদীর্ঘ ইস্পাতকে (স্প্রীং) কৌশলে সঙ্কুচিত ও বর্ত্তুলাকার করিয়া, তাহার উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চাপা দিয়া রাখিলে, ইস্পাত তাহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তিপ্রভাবে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রসারিত হইয়া, পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু গুরুভার প্রস্তরের প্রতিবন্ধকতাহেতু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় না। ঠিক সেইরূপ মাতৃময় কামনা-গুলির চাপে পড়িয়া বিষয়কামনারূপে পরিণামযোগ্য রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির প্রতিবন্ধকতা ঘটে। বাহিরে কোনরূপ ক্রিয়াশক্তি না থাকিলেও, রজোগুণ ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠই থাকে। যদি কখনও প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়, তখনই উহার কার্য্যজনন-শক্তি বাহিরে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়, কামনা রূপে প্রকটিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রভৃতি অষ্টবিধ অত্যাচার করিতে থাকে। মায়ের কৃপায় এতদিনে জীবের দৃষ্টি, এই মূলীভূত দোষকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। যাহার অত্যাচারে পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, এতদিনে জীব তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়-সম্বল বিহীন করিয়া, একাকী পাইয়াছে। তাহাও সম্পূর্ণ নহে, অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত। অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত শব্দটি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রবল প্রতিবন্ধকবশতঃ কারণ-শক্তি পূর্ণ-ভাবে আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ কার্য্য-জনন-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। খুলিয়া বলি—পদার্থমাত্রের যাহা সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহারই নাম কারণ আর স্থূল বা প্রকাশ অবস্থার নাম কার্য্য। যেমন বটবীজ সূক্ষ্মরূপে বটবৃক্ষের কারণ। যতক্ষণ বীজ আকারে থাকে ততক্ষণ বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু ঐ সূক্ষ্মবীজের ভিতরেই যে সুবৃহৎ বটবৃক্ষটী লুক্কায়িত আছে, ইহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঠিক এইরূপ কামনার সূক্ষ্মবীজরূপী মহিষাসুর, পূর্ণভাবে

আত্ম-প্রকাশ করিতে না পারিয়া, অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইল অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের সংস্কারমাত্ররূপে প্রতীতিযোগ্য হইল। কিন্তু "দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ; মাতৃ-শক্তি প্রভাবে আর বাহিরে আসিতে পারিল না— অন্তরেই বীজাকারে রহিয়া গেল। সূক্ষ্ম বীজকে মা আর কার্য্যরূপে প্রকটিত হইতে দিলেন না।

এই অবস্থায় ভিতরে বাসনার বীজ থাকে, অথচ বাসনার আকারে কার্য্যরূপে উহা বাহিরে প্রকাশ পায় না। কারণ মাতৃস্নেহে মুগ্ধ সাধক অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে সতত মাতৃ-সত্তামাত্র দেখিতে অভ্যস্ত। এই যে অবস্থা, ইহারাই নাম "অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ"। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে মিথ্যাচার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কিন্তু সে অবস্থা নহে। সেখানে দেখিতে পাই—কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে বিষয়ের অনুচিন্তন করাই মিথ্যাচার। আর এখানে—কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, কি অন্তরেন্দ্রিয়, কোথাও বিষয়ের গ্রহণ বা অনুচিন্তন নাই। এখানে বিষয়গুলি প্রাণময়—মাতৃময় হইয়াছে; সুতরাং ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছুই নাই। এখানে বিষয় কামনাগুলি "দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ"; সর্ব্বাবস্থায়ই সাধক মহাপ্রাণের বিকাশ মাত্র দেখিতে অভ্যস্ত। কেবল কামনাগুলির ভবিষ্যৎ উদ্বেলনের আশঙ্কা বিদ্যমান। ইহা মিথ্যাচার নহে।

———

অৰ্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥ ৩৯॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর অর্দ্ধনিষ্কান্ত অবস্থায়ই যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু দেবীর মহা অসির আঘাতে বিচ্ছিন্নশির হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। যদিও কামনার সর্ব্বাবয়ব মাতৃময় হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার মূলীভূত রজোগুণের উদ্বেলন সহসা অব্যক্তে পরিণত

হইতে চায় না। সে প্রতিমুহূর্ত্তেই কার্য্যরূপে পরিণত হইতে চেষ্টা করে, আর সাধক জোর করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে। সঞ্চিত সংস্কারসমূহ যে মূহূর্ত্তে স্বকীয় বীজভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইবার জন্য উন্মুখ হয়, সেই মূহূর্ত্তেই সাধক উহাকে প্রাণ-রূপে দর্শন করে। সুতরাং কামনার আকারে আর বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ রজোগুণের উদ্বেলন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগে তাহার নিরোধ-ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাই অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত অসুরের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ বাহিরে দেখিবার নহে; অতি সূক্ষ্মতম ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, সাধকগণ এই যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত ইস্পাত এবং প্রস্তরের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর। সে স্থলেও ঐ শক্তিদ্বয় পরস্পর ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে। অথচ বাহিরে সে যুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কোন বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি বেশ দেখিতে পান যে, ইস্পাত ও প্রস্তরে পরস্পরের শক্তির অভিভবরূপ ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোক দেখিতে পায়—একখণ্ড প্রস্তর ইস্পাতের উপরে চাপা রহিয়াছে। ঠিক এইরূপ এই অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অসুরের যুদ্ধ কেবল বিজ্ঞানময়কোষস্থ সাধকগণই লক্ষ্য করিতে পারেন। এক একটা সংস্কার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, আর মাতৃ-সংস্কার আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে। সাধক! দেখিবে একবার সেই যুদ্ধ? তবে ক্ষণকাল স্থির ভাবে উপবিষ্ট হও। মা বলিয়া আত্মপ্রাণে প্রবেশ কর। তারপর উহাকেই বিশ্বপ্রাণ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। দেখিবে—অন্তর হইতে এক একটা বৈষয়িক সংস্কার উঁকি মারিতেছে, আর তোমার চিত্তকে সে মহাপ্রাণ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তুমি প্রাণময় মাতৃ-স্বরূপে মুগ্ধ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেছ না; সুতরাং সংস্কারগুলি বিফলমনোরথ হইয়া এক একবার অব্যক্তে মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এইরূপ যুদ্ধ কিছুদিন চলিলে সাধক উহাকেও একটা মহা উৎপীড়ন

বলিয়া মনে করিতে থাকে। তখন পরবৈরাগ্যই তাহার একমাত্র অভীষ্ট হইয়া পড়ে। তখন মা আমার সন্তানের আশা পূর্ণ করিবার জন্য, মহাখড়্গের আঘাতে এই অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত মাহাসুরের শিরচ্ছেদ করিয়া দেন অর্থাৎ কারণরূপী রজোগুণের কার্য্যজননশক্তি বিলোপ করিয়া দেন। শিরচ্ছেদ অর্থে—উত্তমাঙ্গ-কর্ত্তন। যে বস্তুর যে শক্তি, সেই শক্তিই তাহার উত্তমাঙ্গ। শক্তিনাশই উত্তমাঙ্গ-নাশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি—কারণের যখন কার্য্যজননশক্তি রহিত হয়, তখন আর তাহার কারণত্বই থাকে না। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে কার্য্যোৎপাদিকাশক্তিবিহীন হইয়া রজোগুণও এখন আর নিত্য নিত্য কামনার সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না। ইহাই মহিষাসুরবধ।

বেদান্ত বলেন—"পূর্ব্বোত্তরয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ। প্রারব্ধস্য তু ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"। জ্ঞানলাভ হইলে, পূর্ব্ব অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের হয় অশ্লেষ (ফলসংযোগের অভাব)। উত্তর অর্থাৎ ভবিষ্যৎকর্ম্মের হয় বিনাশ। বাকী থাকে প্রারব্ধ, উহার ভোগের দ্বারা হয় ক্ষয়। ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বিনাশপ্রসঙ্গ আমরা প্রথমখণ্ডে মধুকৈটভ-বধে পাইয়াছি।

এই মহিষাসুর-বধই পূর্ব্ব কর্ম্মের অশ্লেষ। "আর নূতন কিছু চাই না" এই জ্ঞান স্থির হইয়াছে—প্রথম চরিত্রে। "যাহা চাহিয়াছি, তাহারও ফল ভোগ করিব না," ইহা স্থির হয়—এই দ্বিতীয় চরিত্রে। এই গ্রন্থিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। নূতন কিছু চাহি না, সুতরাং কোন গোলযোগও নাই। প্রারব্ধ ত নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল বীজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, এখনও ফলোন্মুখ হয় নাই, তাহার ফলপ্রদান-ক্ষমতা বিনষ্ট করা বড়ই কঠোর; ইহাই বিষ্ণুগ্রন্থি।

বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে, মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্ব্বাদে এই দুরত্যয় বিষ্ণুগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। বিষ্ণু—স্থিতিশক্তি বা প্রাণ। সঞ্চিত সংস্কারসমূহই ব্যষ্টি প্রাণকে মহাপ্রাণরূপে প্রকাশিত হইতে দেয় না। জীবের বহুজন্মার্জ্জিত বাসনারাশিকে যিনি ধরিয়া রাখেন, সাধারণ কথায় যাহাকে মমতা বা "আমার আমার" ভাব বলে,

পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা বিষ্ণুমায়া নামে উক্ত হইয়াছে, তিনিই স্থিতিশক্তি বা ব্যষ্টিপ্রাণ, সুতরাং উনিই বিষ্ণু। প্রত্যেক জীবেই এই বিষ্ণুসত্তা বিদ্যমান। উহারই নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। আর যিনি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি সঙ্কল্পকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনি লীলাময় মহাবিষ্ণু। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-লীলা বিষ্ণুশক্তিতেই অবস্থিত। তিনি ঐ শক্তিতে মুগ্ধ বা অভিমানাবদ্ধ নহেন; তাই তাঁহার পক্ষে উহা গ্রন্থি বা অজ্ঞান নহে—লীলা, কিন্তু জীবের পক্ষে ঐ সঙ্কল্পই বন্ধন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু, কিংবা স্বপ্ন জাগরণ ও সুষুপ্তিরূপে প্রকাশ পায়। জীব উহাতে মুগ্ধ ও অভিমানাবদ্ধ; সুতরাং উহাই গ্রন্থি—অজ্ঞান বা বন্ধন। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবে যাহা বিষ্ণুগ্রন্থি, সমষ্টিভাবে তাহাই পরমেশ্বরে বিষ্ণুলীলা।

খুলিয়া বলিতেছি—সাধক! তোমার প্রাণ বলিলে যাহা বুঝিতে পার, ঐ প্রাণকে যতদিন বিশ্বপ্রাণরূপে দর্শন করিতে না পারিবে, ততদিন বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে না। তোমার যতকিছু জীবভাবীয় সংস্কার, সকলই ঐ প্রাণে অবস্থিত। উহাকে সংকীর্ণ করিয়া—ছোট করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই, উনি মহাপ্রাণরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন না। তাই তোমার প্রাণময় গ্রন্থির উদ্ভেদ হয় না। ওগো, পরমেশ্বরী মাকে আমার কাঙ্গালিনী সাজাইয়া রাখিয়াছ! জীবত্বের কালিমা মুখে মাখাইয়া, সংস্কারের ছিন্ন বসন পরাইয়া দেহরূপ জীর্ণ কুটিরে বসাইয়া রাখিয়াছ! আর তার উপর তোমার যাবতীয় অভাব অভিযোগের প্রতীকার হয় না দেখিয়া, কাঙ্গালিনী বলিয়া কতই বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! আরে, অমুক কত সুখে আছে, অমুক কেমন সাধনা করিতেছে, অমুক কেমন সিদ্ধি শক্তি লাভ করিয়াছে, অমুক কেমন প্রেম ভক্তি লাভ করিয়াছে, অমুক কেমন জ্ঞানী হইয়াছে, অমুক কেমন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, আর আমার কিছুই হইল না, এইরূপ যে কোন অভিযোগ লইয়া, যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর, ক্ষুব্ধ হও, তখন একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছ কি—তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ আরক্তিম মুখে কি মর্ম্মপীড়ার

প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। তিনি সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও, সেই মুহূর্ত্তেই সন্তানের অভাব অভিযোগ দূর করিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, মায়ের সে দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। মা এক একবার তোমাদের মুখের দিকে তাকান, আর একবার নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া আকুল প্রাণে যে ব্যথা সহ্য করেন, তাহা ভাবিতে গিয়া, এ পাষাণ বুকটার ভিতরও কেমন করিয়া উঠিতেছে। ভাবিয়া দেখ—যিনি একদিন রাজরাণী ছিলেন, তিনি যদি ভাগ্যদোষে ভিখারিণী হন, আর সেই দুর্দ্দিনে তার শিশুপুত্র, উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ না পাইয়া, মাকে লক্ষ্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, তবে সে দুঃখ বহন করা মায়ের পক্ষে কত কঠিন।

ওগো, যখন দেখিতে পাই—রোগে শোকে অনাহারে অভাবে চিন্তায় উৎপীড়িত হইয়া, মনুষ্যগণ হা হুতাশ করিতে থাকে, বিষাদের কালিমা মুখে মাখিয়া হতাশ প্রাণে দিন যাপন করিতে থাকে, তখনই যে আমার রাজরাজেশ্বরী মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্ত্তি চক্ষুর সন্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মা মা মা আমার, তুমিই ত দীনা মলিনা মূর্ত্তিতে জীবকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ! জীব তোমাকে ভিখারিণী করিয়াছে। জীবের উচ্ছৃঙ্খল কামনা পূর্ণ করিতে গিয়াই আজ তুমি ভিখারিণী। তোমার সর্ব্বস্ব দিয়া ফেলিয়াছ। মাগো! তোমার সেই করুণাশ্রুলিপ্ত মুখখানা দেখিলে বজ্রও বিদীর্ণ হইয়া যায়। আর আমাদিগকে এমন ধাতুতেই নির্ম্মিত করিয়াছ যে, তোমার সে দুঃখ অনুভব করা ত দূরের কথা, তার উপর তোমাকেই আবার কাঙ্গালিনী বলিয়া তিরস্কার করি! মাগো আমরা কবে মানুষ হইব? কবে আমরা মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিব? মা ক্ষমা কর! অকৃতজ্ঞ অধম শিশু পুত্রের এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর আর বলিবার কিছু নাই, ভাবিবার কিছু নাই, মা তুমি ক্ষমা কর।

শোনজীব! তোমাদের এই কল্পিত অভাব, কল্পিত দীনতা দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া তোমাদের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

আজ তিনি যে আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ নহে—বর, যে বর লইয়া কাঙ্গালের মত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, সেই বর গ্রহণ কর। জীব! তোমার সকল অভাব দূরীভূত হইবে। গীতায় শুনিয়াছ—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে অবস্থান করিলে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হইতে হয় না, ইহা সেই বস্তু, ইহা সেই বর। এস জীব! সাদরে গ্রহণ কর।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রাণকে মা বলিয়া আদর কর। প্রাণই যে পরমেশ্বরী, প্রাণেই যে সকল প্রতিষ্ঠিত, প্রাণই যে জগৎ আকারে আকারিত, ইহা বিশ্বাস কর, প্রত্যক্ষ কর, অনুভব কর! জগৎময় প্রত্যেক পদার্থকে আমারই প্রাণের মূর্ত্তি বলিয়া দেখ; প্রাণের ঘনীভূত অবস্থাই জড়াকারে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, তোমার প্রাণ বিশ্বপ্রাণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে; মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্ত্তি অপসৃত হইবে; তোমার সকল অভাব অভিযোগের কান্না থামিয়া যাইবে। মা আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণের আরাধ্যা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেন। তখন তুমি সত্য সত্যই আপনাকে ধন্য ও পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ইহাতে শাক্তবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ভেদ নাই। হিন্দুমুসলমানাদি জাতিভেদ নাই। সাকার নিরাকারাদির বিতর্ক নাই। সকলেই স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়োচিত আচার অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখিয়া, অভীষ্ট দেবতাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। ঐ প্রাণই বিশিষ্ট মুর্ত্তিতে দর্শন দিবেন। আবার উনিই অমুর্ত্ত অন্তর্বাহ্যব্যাপী অদ্বয় চিৎস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন। জীব! তোমার হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইবে। যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হইবে।

তবে একটি কথা এই প্রাণকে মা বলিয়া বুঝিতে হইলে—প্রাণ ঢালিতে হয়। প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে কোনও যায়গায় তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। সে জন্যও

মা-ই আমার ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে আসিয়া, একটু একটু করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। জীব! তোমার নবদ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ! কিছুতেই প্রাণ-ভিক্ষা দিতে চাও না? তাই ত একদিন মা আমার গোপাল মূর্ত্তিতে বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ হইয়া, ননী চুরি বা প্রাণ চুরি করিয়াছিলেন। আজ আবার ভিখারী হইয়া, "ওগো প্রাণ ভিক্ষা দাও" বলিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। দাও গো সন্তান! প্রাণ ভিক্ষা দাও—মহাপ্রাণ মিলিবে। অমৃতের সন্ধান পাইবে। নিত্যানন্দে অবস্থান করিবে। কত কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন—প্রাণ দাও! পুত্র! প্রাণ দাও। শুনিতে কি পাও না? প্রাণ দাও! সবটা প্রাণ দিতে না পার, একটুখানি দাও। ওগো! তোমার ঐ অতবড় প্রাণটার এক কোণে আমাকে একটু স্থান দাও, একটু ভালবাস। আমি তোমায় মহাপ্রাণের সন্ধান দিব। দেখ—ব্রহ্মা বিষ্ণুরও ধ্যানের অগম্যা মা আজ পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া, কাঙ্গালিনীর বেশে তোমার দ্বারে উপস্থিত, তুমি একবার মা বলিয়া ডাক! একটু প্রাণ ভিক্ষা দাও!

ভভো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥ ৪০॥

অনুবাদ। অনন্তর হতাবশিষ্ট দৈত্যসৈন্যগণ হাহাকার করিয়া অদৃশ্য হইল। দেবতাগণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

ব্যাখ্যা। বিক্ষেপ আবরণ প্রভৃতি প্রধান বৃত্তিনিচয়ের এবং তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণের বিলয়ে, তদঙ্গীভূত সংস্কাররাশি সুতরাং অদৃশ্য হয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ মহাপ্রাণের সম্ভোগে পরম প্রহর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে সাধক সর্ব্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শনে অভ্যস্ত হইলে, আসুরিকবৃত্তি-নিচয়ও প্রাণময় হইয়া উঠে। তখন বহুত্বের ছাঁচগুলি থাকিলেও ভেদজ্ঞান তিরোহিত

হয়। একই প্রাণ বা সচ্চিদানন্দ বস্তু, সংস্কারের ছাঁচে পড়িয়াই যে বিভিন্ন নামরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। চিনির পুতুলের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর। চিনির জ্ঞান হইলে, হাতী, ঘোড়া, মঠ, সকলই যে চিনিমাত্র, ইহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। তখন ঐ বিভিন্ন নাম ও রূপগুলি সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহার যথার্থ স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে না। ইহারই শাস্ত্রীয় পরিভাষা—দগ্ধবীজবৎ সংস্কার।

ভেদজ্ঞান পরিপুষ্ট থাকে বলিয়াই ত্যাগ ও গ্রহণ থাকে। ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে, তখন আর ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না। প্রাণময়গ্রন্থি খুলিয়া গেলে, সঞ্চিত সংস্কারসমূহ দগ্ধবীজবৎ হইয়া পড়ে। উহারা আর কখনও কর্ম্ম বা ফলভোগের হেতু হইবে না। এইরূপে সঞ্চিত সংস্কার গুলির ফল ভোগ না করিয়া, জীব মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিতে পারে। বিষ্ণু-গ্রন্থি ভেদের ইহাই বিশেষ ফল। এই অবস্থায় সাধক শুধু প্রারব্ধ ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে থাকে। সে রহস্য শুম্ভবধে ব্যাখ্যাত হইবে।

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধঃ।

অনুবাদ। তখন দেবতাগণ দিব্য মহর্ষিবৃন্দের সহিত একত্র হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

ইতি শ্রীমার্কেণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় উপাখ্যানে
দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে মহিষাসুরবধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নিহত হইল—রজোগুণজনিত সঞ্চিত সংস্কার সমূহের ফলোৎপাদন-শক্তি বিলুপ্ত হইল। সাধকের প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইল। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ জড়ত্বের উৎপীড়ন হইতে

পরিত্রাণ পাইল। যাঁহার কৃপায়, যাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে এই অঘটন সংঘটন সম্ভব হইল, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়। তাই দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ সমবেতকণ্ঠে মায়ের স্তুতিমঙ্গল কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তি-অধ্যায়ে এই স্তুতি ব্যাখ্যাত হইবে।

এতদিন সংস্কাররাশির কোলাহলে দিব্য অনাহত নাদ শ্রবণগোচর হয় নাই। এইবার সে কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে, তাই অনাহত হইতে নির্গত আকর্ষণময় প্রাণস্পর্শী মধুর প্রণবধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ইহাই গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত। এইরূপ অন্তরে সুমধুর অনাহতধ্বনি, মুখে মাতৃস্তুতিমঙ্গল কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, সাধকের স্থূল শরীরেও পুলক স্পন্দন বিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; ইহাই অপ্সরাগণের নৃত্য।

মায়ের আত্মহারা আলিঙ্গন। মায়ের অচিন্তনীয় বিভূতির উপলব্ধি। মায়ের অতুলনীয় মহত্ত্বের অনুভূতি। অফুরন্ত মাতৃস্নেহের সম্ভোগ। ওগো, কিরূপে বুঝাইব—তখন শরীর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়? ওগো সে সুখের তুলনা নাই, সে আনন্দের অবসান নাই। সে আনন্দরসে শরীরের প্রত্যেক পরমাণুগুলি যেন গলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। পায়ের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, এমন একটু স্থানও অবশিষ্ট থাকে না, যেখানটা সে সুখময় স্পর্শে আকুল হইয়া না পড়ে। তখন আর দেহকে জড় মাংস-পিণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। শুধু সুখময় অনুভূতি। শুধু সুখময় অনুভুতি। এই দেহটা তখন মধুময় অনুভূতি স্বরূপ হইয়া পড়ে। একটা ঘন আনন্দময় বোধ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। "আমি আনন্দভোগ করিতেছি" এরূপ বোধও থাকে না। ভোগ্য ভোক্তা এক হইয়া যায়। অথচ কেমন একটু ভেদ থাকে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সে অন্য কথা :—

অপ্সরাগণের নৃত্য বা এই অঙ্গবিক্ষেপসম্বন্ধে একটু কথা আছে। যোগশাস্ত্র উহাকে চিত্তবিক্ষেপের সহভাবি সমাধির অন্তরায় স্বরূপ

বলিয়াছেন যৌগিক ভাষায় উহার নাম—অঙ্গমেজয়ত্ব। স্থূলদেহে বিক্ষেপ দেখিলেই বুঝিতে হয়—মনোময় দেহেও বিক্ষেপ চলিতেছে ; সুতরাং উহার নিরোধই যে সর্ব্বোত্তম অবস্থা, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু এই অপ্সরাগণের নৃত্যরূপ অঙ্গবিক্ষেপ দেবভাবের সূচক। সাধক। প্রথমে ঐ দেবভাবগুলিই প্রকাশ পাউক, তার-পর ভাবাতীত স্বরূপে—সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ অবস্থায় প্রবেশ করিবে।

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় মহিষাসুরবধ।

দ্বিতীয় খণ্ড—বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ।

—ঃ*ঃ—

শক্রাদিস্তুতিঃ।

ঋষিরুবাচ।

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টু বুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ॥ ১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবী কর্ত্তৃক সেই অতি বলশালী দুরাত্মা মহিষাসুর এবং তদীয় সৈন্যগণ নিহত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ—গ্রীবা এবং অংসদ্বয় অবনমন করতঃ প্রণামপূর্ব্বক, বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আনন্দবশতঃ পুলকোদ্গম হওয়ায়, তৎকালে দেবতাগণের দেহ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে দেবতাগণের স্তুতি বর্ণিত হইবে। মহিষাসুর—দুরাত্মা—অসৎপ্রকৃতি। প্রকৃতি যতদিন অসৎপ্রিয়, পরিচ্ছিন্নতায় মুগ্ধ, খণ্ডজ্ঞানে পরিতৃপ্ত থাকে, ততক্ষণই উহাকে অসৎস্বভাব বা দুরাত্মা বলা যায়। অমিতবীর্য্য অসৎস্বভাব মহিষাসুর সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। বহির্মুখ-বৃত্তিপ্রবাহ-সমন্বিত রজোগুণ উপশান্ত হইয়াছে। সুতরাং সাত্ত্বিক প্রকাশস্বরূপ দেবতাবৃন্দ, এইবার স্থিরভাবে মাতৃস্বরূপ দর্শন—উপলব্ধি করিতেছেন। মায়ের সেই বিশ্ববিমোহন রূপ প্রত্যক্ষ হইলে, কেহই নির্ব্বাক্ থাকিতে পারে না। বহির্লক্ষণে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম তিনটিই যুগপৎ প্রকাশ পাইতে থাকে। তাই ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ আনন্দে মাতৃ-মহত্ত্ব কীর্ত্তনরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

এই স্তবে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ, (২) চারুদেহাঃ, (৩) এবং বাগ্‌ভিঃ। কায়িক, মানসিক, এবং বাচনিক এই ত্রিবিধ স্তুতিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমে উহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। দেবতাবৃন্দ এরূপভাবে প্রণত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শিরোধরা (গ্রীবা) এবং অংসদ্বয় (স্কন্ধ—বাহুমূল) সম্যক্ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বাহুমূল এবং গ্রীবা নত হইলে সমুদয় দেহটিই অবনত হইয়া পড়ে। ইহাই কায়িক স্তুতি বা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি। মাকে স্মরণ করিবামাত্রই তাঁহার চরণে সার্ব্বাবয়ব এইরূপ নত হওয়া আবশ্যক। যিনি মা, যিনি অনন্ত জন্ম-মরণের একমাত্র সারথি, যাঁহাকে একটিবার দেখিব বলিয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুর অসহনীয় পেষণ সহ্য করিয়া অসিয়াছি, আজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; তাঁহার স্নেহ, তাঁহার বিরাট কর্ত্তৃত্ব, তাঁহার মহতী শক্তির কথা স্মরণ হইলে সন্তানের দেহ নিশ্চয়ই অবনত হইয়া পড়িবে, আনন্দে দেহে পুলকোদ্গম হইবে। অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। ইহাই মানসিক স্তুতির লক্ষণ। এই দুইটির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যদ্বারা মায়ের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে হয়। উহাই বাক্যের শুদ্ধি। মা তুমি অনির্ব্বচনীয়া—তুমি মন ও বাক্যের অগোচরা; তথাপি আমরা বাক্যের দ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছি। ইহার ফলে—আমাদের বাক্ বিশুদ্ধা হইবে, রসনার জড়তা দূর হইবে, নিয়ত অসদ্‌ভাষণ-জনিত এই বিদুষ্ট রসনার অপবিত্রতা বিদূরিত হইবে।

উচ্চৈঃস্বরে জপ এবং মনে মনে স্তব, উভয়ই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। মনে মনে স্তুতিপাঠ করিলে উহা প্রায়ই নিষ্ফল হয়। তাই "বাগ্‌ভিঃ তুষ্টুবুঃ"। সাধক! তুমিও যখন মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, (সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে, এইরূপ উপস্থিতি একান্ত সুলভ) তখন এই তিনটির দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্তবের আরম্ভেই মাতৃ-চরণে স্থূলদেহটি সম্যক্ অবনত করিয়া ফেলিবে, মাতৃ-চরণস্পর্শে দেহ পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিবে, এবং উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে

থাকিবে। উচ্চৈঃস্বরে স্তবাদি পাঠকালে বহিরাগত শব্দসকল কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারে না। চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হইলে, তোমার উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থের দিকেই লক্ষ্য থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থানুগত ভাব বা অনুভূতি, চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকিবে। সংক্ষেপে ইহাকেই মন্ত্র-চৈতন্য বলা যায়। (মন্ত্র-চৈতন্য প্রথম খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। মন্ত্রসমূহ চৈতন্যময় করিয়া পাঠ করিতে, যে সকল বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে "পুলকোদ্গমচারুদেহাঃ" পদটিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। কেবল স্তোত্র কেন, যে কোন মন্ত্রসাধ্যকার্য্য, যথা—জপ পূজা হোম প্রভৃতি কার্য্য করিবার সময়ও, ইহার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। চৈতন্যময় মন্ত্রযুক্ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রসাদ—চিত্তপ্রসন্নতা ধন,—মাতৃ-মহত্ত্বের অনুভূতি, এবং ভোজন—পঞ্চ কোষের পুষ্টিবিধান, অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১)

শ্রীমদ্ভাগবতকারও বলিয়াছেন—রসিক এবং ভাবুক না হইলে, ভাগবদ্ধর্ম্মে অধিকার হয় না। তাই বলি, সাধক! যখন যাহা করিবে, সাধ্যানুসারে তখন তদ্ভাবে ভাবুক ও রসিক হইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিতে পারিলেই কর্ম্মসকল সফল হয়। আরে! উপাসনা ত ভাবেরই হয়। ভাবাতীত স্বরূপের কি উপাসনা আছে? না হয়! আগে জগদ্ভাবগুলিকে—বিষয়রসগুলিকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত ও রসময় করিয়া লইতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহারই কৃপায় ভাবাতীত স্বরূপে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি আচার্যগণও সামাদি বেদ পাঠ করিতেন: অগ্নি জল বায়ু আকাশ সূর্য্য পর্ব্বত নদী প্রভৃতির স্তুতি গান করিতেন। উহা তাঁহাদের সকল প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। উহাতে কোনরূপ কপটতা ছিল না। সর্ব্বত্র প্রাণময় সত্তা দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা

---

(১) প্রসাদ ধন ও ভোজন কি, তাহা প্রথম খণ্ডে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাদের জড়ত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল ; তাই যাবতীয় জড় পদার্থের সহিত তাঁহারা চৈতন্যবৎ ব্যবহার করিতেন। এ দেশের লোক এখনও তুলসীপত্র চয়ন করিতে গিয়া সরল প্রাণে বলিয়া থাকে—"হে তুলসি! তুমি অমর! তুমি কেশবের প্রিয়, কেশবের পূজার জন্যই তোমার পত্র চয়ন করিতেছি। তুমি কিছু মনে করিও না। আমায় ক্ষমা কর।" কেবল তুলসীপত্র চয়ন কেন, হিন্দুর গৃহে এখনও দৈনন্দিন অধিকাংশ কার্য্যেই—সাধারণের চক্ষুতে যাহা জড়, তাহার সহিত চেতনবৎ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধন্য সে দেশের লোক, যাহারা স্নানকালে গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিতে করিতে "মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্" বলিতে পারে, যাহারা অশ্বত্থ বৃক্ষে জল দিয়া "অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ" বলিতে পারে, যাহারা শিলাখণ্ডকে প্রত্যক্ষ ভগবান্‌রূপে দেখিতে পারে। কিন্তু সে অন্য কথা ঃ—

স্তবাদিসম্বন্ধে আর একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি—আধুনিক কোন লোকের কৃত স্তোত্রাদি অপেক্ষা ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত মন্ত্র কিংবা স্তবের শক্তি অনেক বেশী। বহুকাল যাবৎ গুরুপরম্পরাক্রমে সাধু মহাপুরুষগণ যে সকল মন্ত্র কিংবা স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া আসিতেছেন, উহাদের সামর্থ্য যে অনেক বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য আধুনিক লোকের কৃত স্তব বা সঙ্গীত যে, ভাব বা রসের উদ্দীপনা করিতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে না। তবে ঋষি-প্রবর্ত্তিত শব্দগুলির শক্তি যেন আরও বেশী, ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াও দেখা গিয়াছে। একটু তত্ত্বের আস্বাদ পাইলে, তখন আর উপরের ভাসা ভাসা রসযুক্ত সঙ্গীত, কিংবা আধুনিক স্তুতিগুলির বড় একটা সৌন্দর্য্য থাকে না। বৈদিক শব্দগুলি যেন প্রাণ দিয়া গঠিত। উহার উচ্চারণে শরীরের প্রত্যেক অনুপরমাণুতে একটা পবিত্রতার, সাত্ত্বিকতার স্পন্দন অনুভূত হয়। সে যাহা হউক, স্তব পাঠ করিতে হইলে, স্তব পাঠ কেন, মন্ত্রসাধ্য যে কোনও অনুষ্ঠান করিতে হইলে, সকলেরই পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

কায় মন এবং বাক্য, তিনিই যেন এক সুরে বাজিয়া উঠে। বৈধ কর্ম্মগুলি যেন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। অর্থহীন ভাবহীন মন্ত্রের উচ্চারণ, কিংবা কোনও বহুদূরস্থ সত্তার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, প্রায়ই নিষ্ফল হয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধকগণের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন ঐ প্রণতি পুলক এবং পাঠ, এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলেই, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মের যুগপৎ অনুশীলন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—জ্ঞান মানে তাঁকে জানা, ভক্তি মানে তাঁকে ভালবাসা, এবং কর্ম্ম মানে তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু করা। যাঁহাকে জানিনা, তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু কর্ম্মও করা হয় না। সাধক! মায়ের স্বরূপ যত জানিবে, মায়ের মহত্ত্ব যত উপলব্ধি করিবে, ততই তোমার জীবভাব অবনত হইয়া পড়িবে। ইহাই জ্ঞানের ফল। উহারই বহির্লক্ষণ—প্রণতি। আর পরম প্রেমময়ী মায়ের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, প্রাণে স্বতঃই একটা ভালবাসার ভাব সঞ্চিত হইবে। উহাই ভক্তি, এবং উহারই বহির্লক্ষণ পুলক অশ্রু কম্প ইত্যাদি। তারপর যে পরিমাণে ভক্তিভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহার উদ্দেশ্যে—তাঁহার প্রীতি সাধনের জন্য বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উহাই বাহিরে জপ পূজা স্তোত্র পরোপকার কিংবা বিশ্বহিত প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়।

—০—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ২॥

অনুবাদ। সমগ্র দেবশক্তি-সম্ভবা যে দেবী, আত্মশক্তি দ্বারা এই সমুদয় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; দেব এবং মহর্ষিগণের

পূজনীয়া সেই মাতা অম্বিকাদেবীকে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। তিনি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

ব্যাখ্যা। মা তুমি দেবী,—দ্যোতনশীলা, নিত্য প্রকাশময়ী। জগতের সকল বস্তু প্রকাশ করিবার জন্য অপর কোন প্রকাশক বস্তুর প্রয়োজন হয়; কিন্তু তুমি স্বপ্রকাশ স্বরূপা—তোমার প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা বলেন, "অজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান প্রকাশ পায় অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া নামক প্রকাশ্য বস্তু আছে বলিয়াই, ব্রহ্ম ও জ্ঞান প্রকাশময়। প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে, প্রকাশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যেরূপ এই পৃথিবী না থাকিলে, সূর্য্যের প্রকাশস্বরূপ থাকিয়াও নাই, ইহা বলা যায়; সেইরূপ প্রকাশ্য বস্তু বা অজ্ঞান পার্শ্বদেশে অবস্থান না করিলে, জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপত্বের উপলব্ধি হয় না।" মা গো! এত যুক্তির দ্বারা যাহারা তোমার স্বপ্রকাশ স্বরূপকে নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা প্রমাণের দড়ি কোমরে বান্ধিয়া প্রমাণাতীতা তোমাকে স্পর্শ করিতে চায়। যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে তোমাকে যে ধরা যায় না, যাবতীয় প্রকাশ্য বস্তুকে সম্যক্‌রূপে সংহরণ করিয়া একমাত্র তুমিই যে স্বপ্রকাশ স্বরূপ নিত্য বিরাজমান থাক, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অথবা তুমি তাহাদিগের মধ্যে ঐ পর্য্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছ, তাই প্রমাণাতীতা, তোমাকে ধরিতে পারে না। আবার একদিন মা তুমিই যখন গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া, তোমারই ঐ শিষ্যমূর্ত্তির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিবে, তখন তাহারাও বলিবে—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

"ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা"—মা তুমি আত্মশক্তি দ্বারা এই জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। আত্মা তুমি যখন শক্তিরূপে প্রকাশিত হও, তখনই ত এ জগৎ ফুটিয়া উঠে। মা! তোমার এই আত্মশক্তি শব্দটা নিয়া জগতে কতই না মতভেদ চলিতেছে। আত্মা এবং শক্তি, আত্মার শক্তি, আত্মার সহিত শক্তি, যেই আত্মা সেই শক্তি ইত্যাদি

কত বিভিন্ন মত, বিভিন্ন বাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পরমত-খণ্ডন ও স্ব-মত প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে কতই না যুক্তি তর্কের অবতারণা আছে। যতক্ষণ তোমাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, যতক্ষণ তোমাকে অনেক দূরে রাখিয়া দেওয়া হয়, ততক্ষণই আত্মা এবং শক্তি নিয়া বাদ, বিতণ্ডা ও বিচার চলে। মা ধন্য তোমার লীলা! আপনাকে ব্যক্ত করিতে গিয়া, আপনার অজ্ঞানতার ভাণ আপনি দূর করিতে গিয়া, কত লীলাই করিতেছ! এখানে আবার আর এক লীলা আরম্ভ করিয়াছ। ইহারই বা পরিণাম কি? তাহা তুমিই জান। সে যাহা হউক, একবার তোমার দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়—আত্মা এবং শক্তি, শব্দমাত্র ভেদ—বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।

মা! তুমি আত্মা, একমাত্র তুমিই ত যথার্থ আমির স্বরূপ। ঐ একটি আমিই ত প্রতি জীবে প্রতি পরমাণুতে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত। ঐ এক আমিই ত জীবরূপী বহু আধারের মধ্য দিয়া বহু আমির ভাণ করিতেছে; ঐ এক আমির নাম আত্মা এবং বহুর ভিতর দিয়া প্রকাশ হওয়াটাই শক্তি, এই যে আত্মা এবং শক্তি, ইহাকে এক, দুই বা বিশিষ্ট এক, যাহাই বলা হউক না কেন, বস্তুতঃ তাহাতে তোমার স্বরূপের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ঐরূপ বিচার করিতে করিতেই একদিন তোমার যথার্থ স্বরূপ জীবের উপলব্ধিযোগ্য হইবে। বহুজন্মসঞ্চিত অজ্ঞান-অন্ধকার পলায়ন করিবে।

আচ্ছা, একবার তোমার এই আত্মশক্তি শব্দটার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? "আমি দেখিতেছি" ইহাতে দুইটি বস্তু পাইলাম; আমি এবং দর্শন-শক্তি। ইহা এক কি দুই তাহার মীমাংসা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে প্রত্যেকেই করিয়া লইতে পারেন। তবে একটা কথা এই যে, ব্রহ্ম মায়া, পুরুষ প্রকৃতি, শিব দুর্গা, কৃষ্ণ রাধা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শক্তি ও শক্তিমান্‌গত (বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও) ভেদের উপচার করা হয়। যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ দেহ আছে, যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ উহা অদ্বৈত হইলেও দ্বৈতরূপেই প্রতীত হয়। ভাষার মধ্য দিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, দ্বৈত ভাবটিই ফুটিয়া

উঠে। যতক্ষণ ভাষা চিন্তা বা সাধনা আছে, ততক্ষণ ঐ শুকসারীর বিবাদ চলিবেই। শুক বলে—"আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল"। সারী বলে—"আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নইলে পারবে কেন"। মা আমার লীলাময়ী, যতক্ষণ লীলা করিবেন, ততক্ষণ অভেদে ভেদোপচার কল্পিত হইবেই।

সে যাহা হউক, মা! তুমি আত্মশক্তিদ্বারাই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। "ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা"। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই—একটি আমি, ও তাহার নানা ভাবে প্রকাশ। প্রত্যেক জীবে প্রত্যেক জীবাণুতে ঐ আত্মশক্তি—ঐ হর-গৌরী মূর্ত্তি! ঐ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি! ইহাই তোমার জগদ্ব্যাপিনী আত্মশক্তি। মা! তোমার এই বহু মূর্ত্তিকে—জীব সন্তানগণকে বলিয়া দাও—হে জীব! তোমাদের মধ্যে যে আমিটার বিদ্যমানতা অনুভব কর; উহাই ঐ অনুভবটিই আত্মা—মা, আর ঐ আমির যতরকম কার্য্য বা প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহাই শক্তি। এইরূপ একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখতে আরম্ভ করিলেই জন্ম জীবন সার্থক হইবে, ভয় মৃত্যু বিষাদ চিরতরে পলায়ন করিবে।

"নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা" —মা! আত্মশক্তিরূপে তুমি জগৎময় পরিব্যাক্ত রহিয়াছ, ইহা তোমার সাধারণ মূর্ত্তি; এমূর্ত্তি আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না। তাই তুমি সন্তান স্নেহে বিহ্বলা হইয়া, মধ্যে মধ্যে অসাধারণ মূর্ত্তিতে—স্ব স্ব ইষ্টমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে বাধ্য হও। উহা সমগ্র দেবগণের শক্তিসমষ্টি দ্বারা বিরচিত। মহিষাসুর-নিধন উদ্দেশ্যে এইরূপ বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ।

মাগো যতক্ষণ জীবশক্তি-বোধ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞান। তারপর দেবশক্তি-বোধ হয়, উহার নাম জ্ঞান। আর যখন আত্মশক্তি-বোধ উদ্ভাসিত হয়, তখন উহা জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত অনির্ব্বচনীয়। বোধ—এই তিন স্তরেই বিচরণ করে। প্রথমে জীবেরই শক্তি বোধ হয়। অর্জ্জন রক্ষণ ব্যয় ভোগ পাপ পুণ্য খ্যাতি প্রতিষ্ঠা, এ সকলই যেন "আমি করি" এইরূপ জীবভাবীয় অভিমান যাবতীয় শক্তিকে

আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পায়। তারপর পুনঃ পুনঃ দৈব প্রতিকূলতা দ্বারা সে অহঙ্কার বা অজ্ঞান চূর্ণ হইতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে দেবশক্তির উপর বিশ্বাস আরম্ভ হয়। ক্রমে বুঝিতে পারে—শক্তি মাত্রেই দেবতা। ইহার নাম জ্ঞান। ইহাই বোধের দ্বিতীয় স্তর। অবশেষে ঐ দেবশক্তি যখন সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়া অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়, তখন জীব উহাতে পূর্ণভাবে আত্মদর্শন করিয়া, আত্মশক্তির সন্ধান পায়। ওঃ সে কি আনন্দ! কি পরিতৃপ্তি! মায়ে আত্মহারা হইলে, সাধক দেখিতে পায়—জগদ্রূপে আমিই অভিব্যক্ত। ঐ চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, প্রতিনিয়ত আমারই আরতি করিতেছে। আমারই ভয়ে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া অনাদিকাল হইতে বিচরণ করিতেছে। এই বায়ু আমারই ভয়ে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। এই স্রোতস্বিনী প্রতিদিন আমারই অঙ্গ প্রক্ষালিত করিতেছে। এই কুসুমরাশি আমারই পূজার জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কত বলিব! সবই যে আমি গো! আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই! সকলই আত্মা! সকলই শক্তি! সকলই মা!

সেই যে আমার আমি—অখিল দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া মা! সেই যে আমার তুমি, সেই যে আমার সে, তাঁহাকে তোমাকে "আমাকে ভক্ত্যা নতাঃ স্মঃ"। ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি! ভক্তি কোথায় পাব মা! সেও ত তুমি। তোমাকে আত্মা বলিয়া বুঝিতে না পারিলে, আত্মদান না করিলে, প্রাণরূপে আদর না করিলে যে তুমি ভক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ কর না মা! যাঁহারা "ভক্ত্যা নতাঃ" হইতে পারেন, তাঁহারা ত বলপূর্ব্বক তোর অঙ্কে আরোহণ করিবেন। কিন্তু আমরা যে মা "অভক্ত্যা নতাঃ"। ভক্তি যে কাহাকে বলে তাহাই জানিনা, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার চরণে আপনার প্রাণটা ঢালিয়া দিতে হয়, তাহাই জানিনা মা; আমাদিগকে কি কোলে তুলিয়া নিবি না মা! আশা আমাদের। ভরসা আমাদের! শুধু তোর মুখের দিকে তাকাইয়া কত জন্মমৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছি। মাগো, কতদিনে তুই

ভক্তিরূপে এ পাষাণবুকে ফুটিয়া উঠিবি, আমরাও "ভক্ত্যা নতাঃ স্ম" বলিয়া জীবত্বের পরপারে চলিয়া যাইব। প্রভু, পিতা, মাতা সখা, সুহৃদ, বন্ধু, স্বামী গুরু, সকলই তুমি। একাধারে আমার সকল ভালবাসা সকল আকর্ষণ অপহরণ করিয়া তুমিই বসিয়া আছ। জগতে আত্মীয়গণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তবে আমাকে ভালবাসে। আমি যদি তাহাদের অভিপ্রায় অনুসরণ করিতে পারি, তবেই জগতের আত্মীয়গণের ভালবাসার অধিকারী হই। কিন্তু তুমি তোমারই প্রাণের টানে আমায় ভালবাস। তুমি যে আত্মা! তুমি যে প্রাণ! তোমার সে অলৌকিক ভালবাসা কবে বুঝিতে পারিব? কবে আমরা ভক্তিরূপিণী তোমার আবির্ভাব দেখিয়া ধন্য হইব?

মাগো, ভক্তি নাই! তথাপি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। "অভক্ত্যা নতাঃ স্ম—নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব"। নাও মা, ভক্তিহীন কাঙ্গাল সন্তানের প্রণাম নাও!

"বিদধাতু শুভানি সা নঃ"—আমাদের মঙ্গল বিধান কর। আমার একার নহে আমাদের সকলের—এই বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গল বিধান কর মা। বিশ্বময় সকলেই তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করুক, বিশ্বের অমঙ্গল দূরীভূত হউক! বিশ্বপ্রসবিনী মা আমার, দাও আশীর্ব্বাদ, দাও বর, তোমার সন্তানগণ সকলেই সত্য-ও প্রেমরূপ যথার্থ মঙ্গল লাভ করিয়া, অমঙ্গলের হাত হইতে চির-পরিত্রাণ লাভ করুক! মা মা মা আমার!

———

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব ও বলের বিষয় বর্ণনা করিতে ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর পর্য্যন্ত অসমর্থ; সেই দেবী

চণ্ডিকা অখিল জগৎপরিপালন এবং অশুভভয় বিনাশের জন্য মতি করুন।

ব্যাখ্যা। মা! সহস্রশীর্ষ অনন্তদেব চতুরানন ব্রহ্মা এবং পঞ্চানন হর, ইহারাও তোমার অতুলনীয় প্রভাব এবং বলের বিষয়, বাক্যদ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। যদিও ইঁহারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তথাপি তোমার প্রভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ কেন? মাগো তোমার প্রভাব ও বলের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইলে তোমাতেই মিলাইয়া যাইতে হয়। তোমাতে যতক্ষণ পূর্ণভাবে মিলাইয়া যাইতে না পারা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার মহত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। আবার বাক্য ও মন থাকিতে তোমাতে মিলিত হওয়া যায় না অথবা তোমাতে মিলিত হইলে—বাক্যের সহিত মন নিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। তারপর যখন পুনরায় বাক্য ও মনের রাজ্যে ফিরিয়া আসে তখন তোমার অতুলনীয় মহত্ত্ব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতে হয় সুতরাং কেহই তোমার প্রভাব অবগত হইতে পারে না, তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। মা! তুমি যে মনোবাণীর অগোচর।

মাগো! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা তোর প্রভাব, তোর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্য পাত্র। তাই তাঁহারা তোর অচিন্তনীয় মহত্ত্ব অনুভব করিয়া বর্ণনা করিতে বিমুখ হইয়াছেন, মৌন হইয়াছেন। কিন্তু আমরা নিতান্ত অর্ব্বাচীন, তোর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তোর মহত্ত্বের যতটুকু প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, বুঝি বা না বুঝি, তাহা নির্ব্বিচারে লোকের কাছে গাহিয়া বেড়াইব। শিশু পুত্র মায়ের মহত্ত্ব কিছুই জানে না; তবু সকলের কাছে আপন মায়ের গৌরবকাহিনী বলিয়া বেড়ায়। আমরাও মা তেমনি তোমার প্রভাব-কাহিনী ঘাটে পথে নির্বিচারে বলিয়া বেড়াইব। আর কিছু না হউক —অসদ্‌বাক্য উচ্চারণজনিত এ বিদুষ্ট রসনা পবিত্র হইবেই।

শুন সাধক, আমার মায়ের প্রভাব। এই যে সূর্য্যটি দেখিতে পাইতেছ, উহা আমাদের বাসভূমি বসুন্ধরা অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দলক্ষ গুণ বৃহৎ এই পৃথিবীর ন্যায় ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও

কতকগুলি গ্রহ (মঙ্গল বুধ শুক্র প্রভৃতি) ঐ সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, উহার চারিদিকে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক গ্রহের আবার কতকগুলি করিয়া উপগ্রহ আছে। এই সমুদয় গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত সূর্য্যের নাম সৌরজগৎ। আবার রাত্রিকালে আকাশে যে অগণিত নক্ষত্র দেখিতে পাও, উহার এক একটি নক্ষত্রই এক একটি সুবৃহৎ সৌরজগৎ। এই অসংখ্য সৌরজগৎ কোন্ অনাদি কাল হইতে কোন্ অলক্ষ্য কেন্দ্রলক্ষ্যে অনবরত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। সেই যে মহাশূন্য, যেখানে এই অসংখ্য সৌরজগতের অবিশ্রান্ত দ্রুতগতি নিষ্পন্ন হইয়া, আরও কত অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না— সেই যে মহাশূন্য, যে এতবড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটাকে বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই যে আমাদের মা গো! আমাদের মায়ের বক্ষে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনাদি কাল হইতে অনবরত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। দেখ সাধক, আমার মাকে একবার দেখ।

আবার এইরূপ অচিন্তনীয় অতুলনীয় প্রভাবসমন্বিতা হইয়াও কোন্ ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কিরূপ ভাবে সুবিন্যস্ত হইলে, অতি সত্বর মায়ের অঙ্গে চিরতরে মিলিত হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় কোন্ ক্ষুদ্রতম কীটাণুর হৃদয়ে একটু মাতৃ-সম্বেদন ফুটিয়া উঠিল, কোথায় কোন্ কীটাণুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিপতিত হইল, এই সকল যিনি স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন এবং অতিশয় তৎপরতার সহিত স্বয়ং তাহার যথাকর্ত্তব্য বিধান করিতেছেন, তিনি—সেই তিনি আমাদের মা গো!

আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, এত বড় অচিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রজালের মত কোথায়—কোন্ অব্যক্তক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার চক্ষুর নিমেষে নিষ্পন্ন হয়, সেই যে আমাদের মা গো! ইহা ছাড়া মায়ের আরও একটি অচিন্তনীয় প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়—আজ যে দুরাচার মূঢ়, কিছুদিন পরেই সে পুণ্যবান্ জ্ঞানী। ইহা যিনি

করিতে পারেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ নয় কি ?

সে যাহা হউক,"সা চণ্ডিকা"—সেই চণ্ডিকা মা তুমি! যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব শিবত্ব পর্যন্ত নিমেষমধ্যে প্রলয়ের অতল গহ্বরে লুক্কায়িত হয়, সেই চণ্ডিকা তুমি মা। একবার "অখিলজগৎ পরিপালনায় অশুভভয়স্য নাশায় চ মতিং করোতু"। এই অখিল জগতকে পরিপালন এবং অশুভভয় বিনাশের উপযোগিনী বুদ্ধির অনুপ্রেরণা কর। অখিল জগৎ পরিপালন করিতে হইলে, অশুভভয়ের বিনাশ করিতে হয়। অশুভ শব্দের অর্থ মৃত্যু, তজ্জন্য যে ভয় তাহাকেই অশুভভয় কহে। মাগো! চাহিয়া দেখ—এই জগৎ সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত। দেখ মা, প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে মৃত্যুভয় কিরূপ আধিপত্য করিতেছে। মৃত্যুভয়রূপ মহাপিশাচ, জীবের বুকের রক্ত প্রতি পলে কিরূপ শোষণ করিতেছে। জগৎময় যত কোলাহল শুনিতে পাও, উহা ঐ মহাপিশাচের তীব্র চীৎকার যাহাতে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়, তাহারই জন্য। অর্জ্জন রক্ষণ আহার নিদ্রা ভোগ বিলাস যত কিছু, সকলই ঐ মৃত্যুভয়কে চাপা দিয়া ক্ষণিক কাষ্ঠ হাসির আয়োজন মাত্র। মা! জগৎময় এই যে মৃত্যুর করাল ছায়া নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অপসারিত করিবার মত বুদ্ধির অনুপেরণা কর। অভয়া মা আমার! জগতের মৃত্যুভয় বিদূরিত কর। অমৃতময়ী মা আমার! জগতের মৃত্যুভয় দূর কর। মা! তুমিই ত অভয় অমৃত সত্য পরমাত্মা! মৃত্যু এবং অমৃত, দুইটিই ত তোমার হাতের ক্রীড়া যন্ত্র! তাই তুমি সত্য, তাই তুমি অভয়! মা! জগতে একবার এই অভয় সত্য মূর্ত্তিতে দাঁড়াও! জগৎ পরিপালন কর। অমৃতধারায় মৃত্যুভয় দূর হইয়া যাউক। জীবজগৎ তোমার সত্যমূর্ত্তি দেখিয়া অভয় হউক। জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমর হউক। ওগো—মৃত্যু-ভয় নামে যে একটা কিছু আছে, এ কথাটা জগৎশুদ্ধ লোক ভুলিয়া যাউক। তুমি সকলের প্রাণে প্রাণে বলিয়া দাও "মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। জীব! তোমরা অমৃতের সন্তান। অমৃতময় মাতৃ-বক্ষে

তোমাদের অবস্থান। তোমাদের ঐ মৃত্যুবোধটা অজ্ঞানকল্পিত, মিথ্যা। আমি তোমাদের অভয়া মা, তোমরাও নিত্যনির্ভয় স্বাধীন সন্তান"। মাগো, প্রতি জীবের মর্ম্মে মর্ম্মে এই বাণী ধ্বনিত করিয়া দাও। সকলেই বুঝিয়া লউক—আমরা অভয়, আমরা অমৃত! আর এ জগতের শোক দুঃখের হাহাকার কাতর চীৎকার শোনা যায় না মা।

আমাদের বুদ্ধি প্রতিনিয়ত বহুত্ব দ্বারা স্পন্দিত, তাই আমরা চিরদিন মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত, শোকে দুঃখে উৎপীড়িত। আমাদের বুদ্ধিতে নানাত্ব দর্শন আছে বলিয়াই আমরা কেবল মৃত্যু হইতে মৃত্যুর কবলে আত্মহুতি দেই। বুদ্ধিতে যে একমাত্র অমৃতস্বরূপিণী তুমিই প্রতিবিম্বিতা রহিয়াছ, ইহা না বুঝিয়া আমরা তোমার দিকে না চাহিয়া, বহুত্বের পশ্চাৎ ধাবিত হই, তাই বার বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করি। কিন্তু এবার আমাদের মতি যেন তোমাতেই নিয়ত মুগ্ধ থাকে।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৪॥

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং সুকৃতিশালী জনগণের ভবনে শ্রী, পাপাত্মাদিগের ভবনে অলক্ষ্মী, বিবেকিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনগণের অন্তরে শ্রদ্ধা, এবং সৎকুলসম্ভূত জনগণের হৃদয়ে লজ্জারূপে বিরাজমানা, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি এই বিশ্ব পরিপালন কর।

ব্যাখ্যা। যাঁহারা সুকৃতিশালী, তাঁহাদিগের ভবনে তুমি শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যরূপে বিরাজিতা। কেবল ধনরত্নাদিকেই ঐশ্বর্য্য বলে না,

ইচ্ছার অনভিঘাতই যথার্থ ঐশ্বর্য্য। ইহা বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মলতার বহির্লক্ষণ। এ দেশে তান্ত্রিক পূজাদিতে ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য বৈরাগ্য অবৈরাগ্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই আটটি পীঠদেবতা পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আটটি বুদ্ধির ধর্ম্ম! বুদ্ধিই যথার্থ মায়ের পীঠ। বুদ্ধিতত্ত্বেই মায়ের অধিষ্ঠান। পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা যাহা কিছু সকলই এই বুদ্ধি পর্য্যন্ত। তাই পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে "মতিং করোতু"। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই জীব সুকৃতিশালী হয়, সুকৃতিশালী হইলে শ্রী বা ঐশ্বর্য্য লাভ হয়—অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হয়। তাহার ফলে বৈরাগ্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হয়, জীব মোক্ষপদবী লাভ করে। মা! এইরূপে তোমার শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ সুকৃতিশালী জনগণের ভবনেই পরিলক্ষিত হয়।

মা! আবার যাহারা পাপাত্মা—পাপবুদ্ধি, তাহাদের ভবনে তুমিই আবার অলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। অলক্ষ্মী—অনৈশ্বর্য্য, অর্থাৎ ইচ্ছার অভিঘাত। যতদিন জীবের বাসনা অপূর্ণ থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে—বুদ্ধিতে পাপ আছে। পাপ শব্দের অর্থ সঙ্কোচ। বুদ্ধি যতদিন কেবল রূপরসাদি বিষয় প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ থাকে, ততদিন উহা রজস্তমঃ কর্তৃক মলিনীকৃত, তাই সঙ্কুচিত, তাই পাপ। বুদ্ধি মলিন থাকিলেই অলক্ষ্মী অনৈশ্বর্য্যের রাজত্ব। অনৈশ্বর্য্য হইতেই অধর্ম্ম অবৈরাগ্য এবং অজ্ঞান আসে।

পাপ পুণ্য এই বুদ্ধি পর্য্যন্তই। ইহার উপরে আর পাপ পুণ্য নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্য ভোগ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সকলই এই বুদ্ধি পর্য্যন্ত। জগতে যাহা পাপ পুণ্য নামে পরিচিত, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই পুণ্য। এক অবস্থায় যাহা পাপ, অন্য অবস্থায় হয়ত তাহাই পুণ্য। সুতরাং জাগতিক পাপ পুণ্যের বিচারে স্বাস্থ্য ও সমাজস্থিতির দিকেই প্রধান ভাবে লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। আধ্যাত্মিক পথের কণ্টকসমূহ উন্মুক্ত করাই পাপপুণ্য-বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এইরূপ বিচার করিতে করিতে একদিন জীব বুদ্ধিসত্ত্বে উপনীত হয়। তখন পাপপুণ্য

সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, উহা আপেক্ষিক নহে—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রযুজ্য।

বুদ্ধিতে দ্বিবিধ প্রকাশ বিদ্যমান। এক ইন্দ্রিয়কর্তৃক আহৃত বিষয়ের প্রকাশ, অন্য পরমাত্মার প্রকাশ। ইহার প্রথমটী পাপ, দ্বিতীয়টী পুণ্য। বৈষয়িক প্রকাশে বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়, কিন্তু পরমাত্মার প্রকাশে উহার প্রসার হয়। তাই বলিয়াছিলাম, পাপ—সঙ্কোচ, পুণ্য—প্রসার। ফুল বলিয়া ফুলটি গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়। কিন্তু উহাকে মা বলিয়া প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির প্রসার হয়। ব্যবহারিক পাপ পুণ্যও এই বুদ্ধির সঙ্কোচ প্রসারের উপরই অধিকাংশ ব্যবস্থাপিত। বুদ্ধির সঙ্কোচের নামই অজ্ঞান ; অজ্ঞান হইতে অনৈশ্বর্য্য হয়—কামনা অপূর্ণ থাকে। কামনা পূর্ণ না হইলে, বৈরাগ্য আসিতে পারে না। সুতরাং দেখিতে পাই—বুদ্ধির একদিকে শ্রী, অন্যদিকে অলক্ষ্মী। একদিকে জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য, অন্যদিকে অজ্ঞান অধর্ম্ম অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য।

মা! এই উভয়রূপেই যে তুমি বিরাজিতা, ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারাই "কৃতধী" হয়। তাই তুমি "কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ" তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হইবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মাগো, বুদ্ধিতে পৌঁছিতে পারিলেই যে জীবের সব লাভ হয়, সকল অভাব চিরতরে দূরীভূত হয় ; তাই ত সমগ্র জীব-জাগতের বুদ্ধিসত্ত্ব উন্মেষের জন্য তোর রাতুল চরণে এই প্রার্থনা—"ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"।

"শ্রদ্ধা সতাং"—যাঁহারা সৎএর সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে—গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপে, তুমিই মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। যাঁহারা এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিনশ্বর বহু বস্তুর মধ্যেও এক অখণ্ড অপরিণামী নিত্য সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সজ্জন। পূর্ব্বোক্তরূপ কৃতধী হইলেই জীব সৎএর সন্ধান পায়। যে উপায়ে উহা হয়, তাহা শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে

ইচ্ছার অনভিঘাতই যথার্থ ঐশ্বর্য্য। ইহা বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মলতার বহির্লক্ষণ। এ দেশে তান্ত্রিক পূজাদিতে ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য বৈরাগ্য অবৈরাগ্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই আটটি পীঠদেবতা পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আটটি বুদ্ধির ধর্ম্ম! বুদ্ধিই যথার্থ মায়ের পীঠ। বুদ্ধিতত্ত্বেই মায়ের অধিষ্ঠান। পূজা অর্চ্চনা আরাধনা উপাসনা যাহা কিছু সকলই এই বুদ্ধি পর্য্যন্ত। তাই পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে "মতিং করোতু"। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই জীব সুকৃতিশালী হয়, সুকৃতিশালী হইলে শ্রী বা ঐশ্বর্য্য লাভ হয়—অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হয়। তাহার ফলে বৈরাগ্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হয়, জীব মোক্ষপদবী লাভ করে। মা! এইরূপে তোমার শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ সুকৃতিশালী জনগণের ভবনেই পরিলক্ষিত হয়।

মা! আবার যাহারা পাপাত্মা—পাপবুদ্ধি, তাহাদের ভবনে তুমিই আবার অলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। অলক্ষ্মী—অনৈশ্বর্য্য, অর্থাৎ ইচ্ছার অভিঘাত। যতদিন জীবের বাসনা অপূর্ণ থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে—বুদ্ধিতে পাপ আছে। পাপ শব্দের অর্থ সঙ্কোচ। বুদ্ধি যতদিন কেবল রূপরসাদি বিষয় প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ থাকে, ততদিন উহা রজস্তমঃ কর্ত্তৃক মলিনীকৃত, তাই সঙ্কুচিত, তাই পাপ। বুদ্ধি মলিন থাকিলেই অলক্ষ্মী অনৈশ্বর্য্যের রাজত্ব। অনৈশ্বর্য্য হইতেই অধর্ম্ম অবৈরাগ্য এবং অজ্ঞান আসে।

পাপ পুণ্য এই বুদ্ধি পর্য্যন্তই। ইহার উপরে আর পাপ পুণ্য নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্য ভোগ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সকলই এই বুদ্ধি পর্য্যন্ত। জগতে যাহা পাপ পুণ্য নামে পরিচিত, তাহা আপেক্ষিক মাত্র। একের পক্ষে যাহা পাপ, অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই পুণ্য। এক অবস্থায় যাহা পাপ, অন্য অবস্থায় হয়ত তাহাই পুণ্য। সুতরাং জাগতিক পাপ পুণ্যের বিচারে স্বাস্থ্য ও সমাজস্থিতির দিকেই প্রধান ভাবে লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। আধ্যাত্মিক পথের কণ্টকসমূহ উন্মুক্ত করাই পাপপুণ্য-বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এইরূপ বিচার করিতে করিতে একদিন জীব বুদ্ধিসত্ত্বে উপনীত হয়। তখন পাপপুণ্য

সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, উহা আপেক্ষিক নহে—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রযুজ্য।

বুদ্ধিতে দ্বিবিধ প্রকাশ বিদ্যমান। এক ইন্দ্রিয়কর্তৃক আহৃত বিষয়ের প্রকাশ, অন্য পরমাত্মার প্রকাশ। ইহার প্রথমটী পাপ, দ্বিতীয়টী পুণ্য। বৈষয়িক প্রকাশে বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়, কিন্তু পরমাত্মার প্রকাশে উহার প্রসার হয়। তাই বলিয়াছিলাম, পাপ—সঙ্কোচ, পুণ্য—প্রসার। ফুল বলিয়া ফুলটি গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির সঙ্কোচ হয়। কিন্তু উহাকে মা বলিয়া প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির প্রসার হয়। ব্যবহারিক পাপ পুণ্যও এই বুদ্ধির সঙ্কোচ প্রসারের উপরই অধিকাংশ ব্যবস্থাপিত। বুদ্ধির সঙ্কোচের নামই অজ্ঞান ; অজ্ঞান হইতে অনৈশ্বর্য্য হয়—কামনা অপূর্ণ থাকে। কামনা পূর্ণ না হইলে, বৈরাগ্য আসিতে পারে না। সুতরাং দেখিতে পাই—বুদ্ধির একদিকে শ্রী, অন্যদিকে অলক্ষ্মী। একদিকে জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য, অন্যদিকে অজ্ঞান অধর্ম্ম অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য।

মা! এই উভয়রূপেই যে তুমি বিরাজিতা, ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারই "কৃতধী" হয়। তাই তুমি "কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ" তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হইবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মাগো, বুদ্ধিতে পৌঁছিতে পারিলেই যে জীবের সব লাভ হয়, সকল অভাব চিরতরে দূরীভূত হয় ; তাই ত সমগ্র জীব-জাগতের বুদ্ধিসত্ত্ব উন্মেষের জন্য তোর রাতুল চরণে এই প্রার্থনা—"ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ"।

"শ্রদ্ধা সতাং"—যাঁহারা সৎএর সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে—গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপে, তুমিই মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। যাঁহারা এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিনশ্বর বহু বস্তুর মধ্যেও এক অখণ্ড অপরিণামী নিত্য সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সজ্জন। পূর্ব্বোক্তরূপ কৃতধী হইলেই জীব সৎএর সন্ধান পায়। যে উপায়ে উহা হয়, তাহা শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে

শাস্ত্রবাক্যে পর্ব্বতের মত অটল বিশ্বাস। মাগো, যাহাদিগকে তুমি সৎ কর, তাহাদিগের হৃদয়ে তুমিই শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করিয়া, অসতের পরপারে লইয়া যাও। ইহাই তোমার মাতৃত্ব।

"কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা"—সৎকুলসম্ভূত জনগণের হৃদয়ে মা তুমি লজ্জারূপে অবস্থিতা। অকার্য্যবৈমুখ্যই লজ্জা। এই জগতে সজ্জনগণ যে নিন্দিত কর্ম্ম করিতে লজ্জা বোধ করেন, সেই লজ্জারূপে তাঁহাদের হৃদয়ে তুমিই মা নিত্য অধিষ্ঠিতা। আবার পক্ষান্তরে যাঁহারা সৎএর সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা বিষয়রূপ কূলে বিচরণ করিয়াও অকূলের সন্ধান পাইয়াছেন, একমাত্র অখণ্ড সত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে যাবতীয় কর্ম্মের অতীত বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাই সর্ব্বতঃ নির্লিপ্তা তোমাতে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন। ইহাই তাঁহাদের অকার্য্যবৈমুখ্যরূপ লজ্জা।

"তাং ত্বাং নতাঃ স্ম"—সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। মা! তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রী অলক্ষ্মী বুদ্ধি ও লজ্জারূপে প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। তুমি অদৃশ্যা অগ্রাহ্যা অস্পৃশ্যা হইয়াও ঐ সকল রূপে নিয়তই আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাক। মাগো! তোমার চরণে আমরা প্রণত হইতেছি। শুধু মুখে নয়, কায়মনেও তোমার চরণে সর্ব্বতোভাবে অবনত হইতেছি।

"পরিপালয় দেবি বিশ্বম্"—তুমি এই বিশ্বকে পরিপালন কর। মাগো! তুমি যে এই বিশ্বকে যথার্থই পরিপালন করিতেছ, বিশ্ববাসী জীবমাত্রেই যে তোমার স্নেহময় অঙ্কে অবস্থিত, এই বিশ্বাস, এই ধ্রুবজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে—প্রতি জীবহৃদয়ে উদ্দীপিত কর। তোমার স্নেহের সন্তানগণ যে ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরীভূত। দুর্ভিক্ষ মহামারী অকালমৃত্যুর কঠোর সম্পেষণে ছিন্নমর্ম্ম! ওগো, তাহারা যে নিত্যানন্দময়ীর অঙ্কে পালিত হইয়াও, বিষাদে ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইহা বিদূরিত কর। তুমি গুরুরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া দাও, বহুদিনের অজ্ঞান-কল্পিত দুঃখের পেষণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করুক। ইহাই ত

তোমার যথার্থ জগৎপরিপালন। নতুবা জগৎ পরিপালন করিতে বলার অন্য সার্থকতা কি? তুমিই জগদাকারে আকারিতা, আবার তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী; সুতরাং তুমি যে জগৎ পরিপালন করিতেছ ও করিবে, ইহা বালাই বাহুল্য।

মা! সত্যই যে আমরা নিরাশ্রয় নহি, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা যে দুঃখে ভয়ে প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, আপনাদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় মনে করিয়া, একান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি, আমাদের এই ভাবটা দূর কর মা! সত্যই যে তুমি বিশ্বপালনকর্ত্রিরূপে নিয়ত আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছ, ইহা আমাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দাও।

—০—

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতঃ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৫॥

অনুবাদ। হে দেবি! তোমার অচিন্তনীয় রূপের বিষয় কি বর্ণনা করিব? অগণিত অসুরক্ষয়কারী তোমার প্রভূত বীর্য্য, রণক্ষেত্রে প্রকটিত তোমার অলৌকিক চরিত্র, এ সকলই অসুরগণকে ও দেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। মা তোমার রূপ অবর্ণনীয় এবং অচিন্তনীয়। যথার্থই তোমার রূপকে আমরা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিতে, অথবা মন দ্বারা ধারণা করিতে পারি না। দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেরই একটা রূপ আছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু ঐ রূপ বস্তুটি যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, মনে মনে চিন্তাও করিতে পারি না। আমরা যাহাকে রূপ বলি বা বুঝি, তাহা ত বাস্তবিক রূপ নহে—আকৃতিমাত্র। গোলাকার চতুষ্কোণ ত্রিকোণ লাল নীল শুভ্র কঠিন কোমল তরল

উচ্চনিম্ন ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ দ্বারা আমরা রূপবস্তুটিকে বুঝিতে বা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাই বটে ; বাস্তবিক উহাতে রূপের কিছুই ব্যক্ত হয় না, আকার বা গঠনের কিয়ৎ অংশ মাত্র ব্যক্ত হয়। রূপ শব্দটি বুঝিতে গিয়া, আমরা যে সুন্দর ও কুৎসিৎ এই দুইটি শব্দ প্রয়োগ করি, ঐ দুইটি শব্দও আকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়। বাস্তবিক রূপ রূপই। উহাতে সুন্দর কুৎসিৎ কিছুই নাই। রূপ এক ব্যতীত দুই নাই। এই বিশ্ব রূপসাগরেই ভাসিতেছে। এ রূপের স্বরূপ যে কি, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহা চিন্তারও অতীত। অথচ রূপ নাই, ইহা বলিবার উপায় নাই। মনে হয়—আমরা সর্ব্বদা রূপই দেখিতেছি। যাহা দেখি, তাহা কিন্তু রূপ নহে—আকার। এক অখণ্ড রূপসাগরে কতকগুলি নাম ও আকার ফুটিয়া রহিয়াছে। আকারগুলি যে রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা যেন বুঝিয়াও বুঝি না। এই আকারগুলিই বেদান্তপ্রতিপাদ্য নাম ও রূপ। বাস্তবিকই যখন আমরা রূপের দিকে লক্ষ্য করি, তখনই সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য একটা মহাসত্যক্ষেত্রে উপনীত হই। সে যে কি, তাহা যথার্থই বাক্য ও চিন্তার অতীত।

মা! পক্ষান্তরে যদি ধরিয়া লই যে, আমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বলিয়া বুঝি, উহাই তোমার রূপ ; তাহা হইলেও উহা চিন্তার অতীত হইয়া পড়ে। চন্দ্রে পদ্মে কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে, অর্দ্ধস্ফূটবাক্ পুত্র কন্যার মুখে যে সৌন্দর্য্যবিন্দু দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, যে সৌন্দর্য্য-সিন্ধুর একবিন্দু এত মুগ্ধকর, না জানি সেই রূপের সিন্ধু তুমি কত প্রাণারাম—কত মুগ্ধকরী। মাগো এই ব্যষ্টিরূপ, এই বিনশ্বররূপ, ইহাই যদি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারে—তোমার দিকে তাকাইতে না দিতে পারে, তবে সমষ্টি রূপময়ী তোমাতে যাহারা মুগ্ধ, তাহারা যে জগতের রূপকে অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মাগো তুমিই ত "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।" যাহারা তোমার এই অপরূপ রূপসাগরে ডুব দিতে পারিয়াছে, আত্মহারা হইতে পরিয়াছে, তাহারা জানে—কুৎসিৎ বলিয়া কিছু

নাই, নিন্দিত বলিয়া কিছুই নাই, সবই রূপময়, সবই সুন্দর ; মা মা ! সে কি লোভনীয় অবস্থা।

মাগো, কিরূপে তোমার সেই রূপাতীত রূপসাগরে অবগাহন করা যাইতে পারে, এস্থলে তাহারও আভাস দেওয়া যাইতেছে। রূপের পাঁচটি অবস্থা। প্রথমতঃ স্থূলরূপ অর্থাৎ আকার। দ্বিতীয়তঃ চক্ষু অর্থাৎ দৃক্‌শক্তি। চক্ষুতেই রূপজগতের সূক্ষ্মপ্রকাশ। তৃতীয় রূপতন্মাত্র ইহা রূপের সূক্ষ্মতর প্রকাশ। চতুর্থ অস্মিতা অর্থাৎ রূপের বোধস্বরূপ। ইহা রূপের সূক্ষ্মতম প্রকাশ। এইস্থানে উপনীত হইলে, রূপ যে একপ্রকার বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহার উপলব্ধি হয়। এতব্যতীত রূপের আরও একটি অবস্থা আছে, উহা পুরুষার্থ। পুরুষের অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মার ভোগ সম্পাদন করে বলিয়াই ইহার নাম পুরুষার্থ। উহাই রূপের পঞ্চম অবস্থা বা অতি সূক্ষ্মতম স্বরূপ।

প্রথমে সত্যবোধে স্থূলরূপকে অর্থাৎ যে কোন পদার্থের আকৃতিকে মা বলিয়া ধরিলেই, রূপের দ্বিতীয় স্বরূপ দৃকশক্তি উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বময় একটা দৃক্ বা দর্শন শক্তিই যে যথার্থ রূপের স্বরূপ, তাহা বোধ হইতে থাকে। তারপর উহাতে আবার সত্যবোধ করিয়া মা মা বলিয়া কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেই রূপতন্মাত্রে উপনীত হওয়া যায়। উহা অতি সূক্ষ্ম—জ্ঞানময় রূপ আকাশীয়ভাব, অথচ অতি লোভনীয়, অতিশয় প্রাণারাম। তারপর আরও মা মা বলিয়া অগ্রসর হইলে মা এমন স্থানে উপনীত করেন, যেখানে আমার আমিটাই রূপময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আমিত্ব যে রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ উপলব্ধি যখন আসিতে থাকে, তখন আমি যে কি হইয়া যায়, তাহা ভাষায় কিরূপে ব্যক্ত হইবে! সে যে অরূপের রূপময় স্বরূপ। সেখান হইতে আবার মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, তবে এই রূপময় আমির যিনি যথার্থ দ্রষ্টা, যাঁহার করুণ ঈক্ষণে আমিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, চকিতের ন্যায় সেই স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। তারপর পুনরায় স্থূলরূপে নামিয়া আসিয়া সাধকের কি হয় ? তাহার রূপের পিপাসা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আর

"রূপং দেহি" বলিয়া মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা করিতে হয় না। 'রূপং দেহি' মন্ত্রের ইহাই সিদ্ধাবস্থা।

মাগো! তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে বলিয়া দাও যে, শুধু "রূপং দেহি" বলিয়া স্থূলরূপ হইতে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলে, কত সহজে অনায়াসে রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রূপাতীত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।*

"কিঞ্চাতিবীর্য্যং"—মাগো, অগণিত অসুরবীর্য্য-ক্ষয়কারী তোমার অতুলনীয় বীর্য্যও আমাদের চিন্তার অতীত। মা! অসুরবীর্য্যরূপেও তুমি, আবার অসুরবীর্য্যক্ষয়কারী বীর্য্যরূপেও তুমি। ক্ষয় শব্দের দুইটি অর্থ—বিনাশ এবং নিবাস। 'ক্ষি'ধাতুর নিবাস অর্থেও প্রয়োগ হয়। সুতরাং অসুরক্ষয়কারী বীর্য্য বলিলে দুইই বুঝায়। যে বীর্য্য অসুররূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাও তুমি! আবার যাহা সেই অসুর বীর্য্য বিনাশ করে, তাহাও তুমি। একাধারে এরূপ পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধভাব তোমাতেই সম্ভব। অসুর এবং সুর উভয়এই তোমার তুল্য প্রকাশ। কোথাও ন্যূনাতিরেক নাই। তাই মন্ত্রেও দেখিতে পাই "অসুরদেবগণাদিকেষু"।

মাগো, তোমার ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্বরূপ মহাবীর্য্য প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই ত আমাদিগের নিকট এই অসুরবীর্য্য প্রকাশ পায়, আমরা তোমার এই অতুলনীয় বীর্য্য দেখিয়াই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই। যখন দেখিতে পাই—তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি অসুর রূপে প্রকাশিত হও, তখন নিষ্কাম অক্রোধ নির্লোভ প্রভৃতি দেববীর্য্য কত নির্জ্জিত হইয়া পড়ে। আবার যখন দেববীর্য্য প্রবল হয়, তখন অসুরবীর্য্য কত নির্জ্জিত হইয়া পড়ে। এইরূপে মা, স্বকীয় হৃদয়ক্ষেত্রে অহর্নিশ তোমারই বীর্য্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার

---

* প্রথম খণ্ডে অর্গলাব্যাখ্যায় রূপ শব্দের পরমাত্মা পর্য্যন্ত অর্থ করা হইয়াছে, এবং রূপের যে সকল স্তর ভেদ করিয়া পরমাত্মস্বরূপে আসিতে হয়, তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ পরস্পর-একান্ত-বিরুদ্ধবীর্য্য প্রকাশকালে যে আহব উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে তোমার কি অভূতপূর্ব্ব লোকোত্তর বীর্য্য প্রকাশ পায়! মাগো, যখন অসুরবীর্য্যের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন চিত্তক্ষেত্রে কি লোকবিগর্হিত লীলার অভিনয় হইতে থাকে! আবার হয়ত পরমুহূর্ত্তেই অসুরবীর্য্য হৃতপরাক্রম ও সুরবীর্য্য প্রবল হইয়া চিত্রক্ষেত্রে স্বর্গীয় শান্তির বিমল প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দেয়।

এতদ্‌ভিন্ন মা তোমার আর একটি বীর্য্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যাহা সুরাসুর উভয়েরই অতীত। ওগো, যেখানে সকল বীর্য্য পরাভূত উহা সেই অভয় অমৃতময় বীর্য্য। যাঁহার ভয়ে সূর্য্যের উদয়, যাঁহার ভয়ে বায়ুর প্রবাহ, যাঁহার ভয়ে পর্জ্জন্যের বর্ষণ, যাঁহার ভয়ে মৃত্যুরও ভীতি উপস্থিত হয়, ইহা সেই বীর্য্য। সেই সর্ব্ববীর্য্যাতীত বীর্য্যময়ী মা আমার তোমার চরণে কোটি প্রণিপাত, মা কোটি প্রণিপাত।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। তুমি সমস্ত জগতের হেতু। ত্রিগুণ-স্বরূপা হইয়াও দোষ নিবন্ধন তুমি অজ্ঞেয়া, সুতরাং হরিহরাদিরও ধ্যানের অগম্যা। তুমি সর্ব্বাশ্রয়া। এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ মাত্র। তুমিই অব্যাকৃতা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

ব্যাখ্যা। হে মা, একমাত্র তুমিই সমস্ত জগতের হেতু। শুধু যে জগতে আমরা বাস করি, এই একটি জগৎ নহে ; সমস্ত জগৎ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—এই অনাদি সৃষ্টিচক্রের যেখানে যত কিছু পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ আছে, সে সমস্তেরই একমাত্র তুমিই হেতু ; হেতু দ্বিবিধ—নিমিত্ত এবং উপাদান। এই উভয় হেতুই তুমি। আমরা স্বপ্নের দৃষ্টান্তে উহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলির নিমিত্ত

অর্থাৎ কর্ত্তা এবং উপাদান উভয়ই যেরূপ মন ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; সেইরূপ এই জাগ্রত অবস্থায় পরিদৃশ্যমান কিংবা অনুভূয়মান জগৎ-প্রপঞ্চের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই তুমি। আত্মা মা আমার, তুমিই আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছ।

মা! হয়ত তোমার কোনও জ্ঞানবৃদ্ধ সন্তান বলিবেন—না, আত্মা জগৎ-কারণ নহে, আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তাহাতে কোনরূপ কারণতা থাকিতে পারে না। জগতের উপাদান কারণ—জড় প্রকৃতি। চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ এ জড় প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহাই এই জগৎ। আবার নিমিত্ত কারণতাও আত্মায় নাই ; কারণ প্রকৃতির জগৎরূপে যে পরিণাম হয়, ইহা দর্শন করাও আত্মার ধর্ম্ম নহে। তাহাতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই। স্বপ্রকাশ-স্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যধর্ম্ম অবভাসিত হয়, এবং তাহার পরিণাম এই জগৎ। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তও সত্যজ্ঞানে স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু মা, তুমি ত আমাদের নিকট কেবল এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ কর নাই। গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছ —ঐ যে জড়া প্রকৃতি, উহাও তুমি—আত্মা মা আমার? তাই মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "ত্রিগুণা"। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদানও তুমিই, অন্য কেহ নহে।

পরমাত্মা মা আমার! তুমি চৈতন্যস্বরূপে, আর তোমার প্রকৃতি জড় অচেতন, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব! চেতন আত্মার প্রকৃতি অচেতন হইতে পারে না। বরং অচেতনাকারে চেতনের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। যদি দেখিতাম যে—ত্রিগুণা প্রকৃতি আত্মা ব্যতীত অন্য কোথায়ও অবস্থান করিতে পারে, তবে না হয় জড়সত্তা মানিয়া লইতাম। যখন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রকৃতি ও আত্মার একান্ত অবিনাভাব, তখন আর উহাকে জড় কিরূপে বলি। ওগো, যতক্ষণ তোমার অলোচনা, যতক্ষণ আমি, ততক্ষণই তুমি ত্রিগুণা প্রকৃতি।

মুখে বলি—"আমার প্রকৃতি।" বস্তুতঃ কিন্তু "আমিই প্রকৃতি"। যেরূপ "রাহুর শির" বলিলে, রাহু হইতে শিরকে যেন পৃথকরূপে বুঝিয়া লই, ইহাও ঠিক সেইরূপ ; পুরুষ প্রকৃতি, ব্রহ্ম মায়া, আত্মা শক্তি ইত্যাদি যুগ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেও বাস্তবিক উহারা সম্পূর্ণ অভিন্ন। আত্মা যখন প্রকৃতিরূপে মায়ারূপে বা শক্তিরূপে প্রকাশিত হন, তখনই তিনি প্রকৃতি মায়া বা শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

আশঙ্কা হইতে পারে—বিশুদ্ধবোধ বা 'জ্ঞ' স্বরূপ আত্মা কিরূপে জড় প্রকৃতিরূপে অর্থাৎ ত্রিগুণাকারে আকারিত হইতে পারে ? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—ঐ যে 'জ্ঞ' বস্তু, উহাতেই জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপ বিশিষ্ট ভাবত্রয় প্রকাশ পায়। নির্গুণ অবস্থায় উহা অব্যক্ত থাকে, এই জন্যই প্রকৃতির অন্য নাম অব্যক্ত। 'জ্ঞ' হইতেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। উহাই ত্রিগুণ। জ্ঞান—সত্ত্বগুণ, জ্ঞাতা রাজগুণ এবং জ্ঞেয়—তমোগুণ, এই তিনটী বস্তু অন্যত্র হইতে আসে না। ঐ 'জ্ঞ' বস্তু হইতেই প্রকাশ পায়। তাই দেখিতে পাই—জীব ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম তিন অবস্থায়ই 'জ্ঞ' বা আত্মবস্তু অক্ষত থাকে। এবং ঐআত্মাতেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া, নামরূপাত্মক জগৎ প্রতিভাত হয়। তাই ত মা যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই তোমার বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। তাইত মা যেখানেই মা বলিয়া ডাকি, সেইখানেই তোমার সাড়া পাই, তোমার স্নেহাদরের গর্ব্ব অনুভব করি। তাইত মা দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া "হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণা" বলিয়া প্রকৃতিরূপিণী তোমারই রক্ত-চরণে অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

মা গো! তুমি ত্রিগুণা মূর্ত্তিতে জগৎরূপে প্রতিভাত, ইহা যদি এত সত্য, তবে দেবতাগণের মত আমরাও জগৎ দেখিয়া তোমাকে দেখি না কেন ? ঘট সরার দর্শনের সঙ্গেই যেরূপ মৃত্তিকা দর্শন হয়, কুণ্ডল দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ সুবর্ণ দর্শন হয়, সেইরূপ জগৎ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন মা তোমার দর্শন লাভ হয় না ? চিন্ময়ী!

তুমিই যদি জগৎ, তুমিই যদি নামরূপ, তবে কেন তোমাকে দেখিতে পাই না?

"দোষৈর্ন জ্ঞায়সে"—দোষবশতঃ তুমি পরিজ্ঞাত হও না। দোষ কি? প্রথম দোষ—দেখিতে চাই না। দ্বিতীয় দোষ—সংশয় ও অবিশ্বাস। আমরা যে মাত্র নামরূপই দেখতে চাই। আমরা যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জড়জগৎরূপেই ইহাকে দেখিবার অভিলাষী। তাই তোমাকে দেখিতে পাই না। তারপর যদি কখনও বিদ্যুৎ-রেখার মত ক্ষণস্থায়ী মাতৃ-দর্শনেচ্ছার ক্ষীণ রেখা জাগে, অমনি সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপনেত্ররূপে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। উহারা বলিয়া দেয়—"তাও কি হয়, এই জড় মাটী কি আর "মা" টি হয় গা? এই জড় জল কি আর চিন্ময়ী মা হইতে পারে?" এইরূপ সর্ব্বত্র উহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করে। উহারাইত তোমার এই প্রকট বিশ্বমূর্ত্তিতে জড়ত্বের দুরপনেয় আবরণ ফুটাইয়া তোলে, আর তাহারই ফলে সেই ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষার রেখাটী চকিতে মিলাইয়া যায়।

হায় মা! কতদিন আর এইরূপ ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে প্রতারিত করিবে? তুমিই ত মা দোষের সৃষ্টিকর্ত্রী। তুমিই ত নিজের অবয়ব দোষ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছ। তাই তুমি ধরা দিতেছ না। আমাদের চক্ষু তোমার দোষময়ী মূর্ত্তি দেখিতে যে বহুদিন হইতেই অভ্যস্ত, তাই গুণময়ী তোমাকে দেখিতে পাই না। যদি দোষকেও মা বলিয়া বুঝিয়া লইতে পারিতাম, যদি মায়াকেই মা বলিয়া স্বীকার করিতাম, যদি প্রকৃতিকেই পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতাম, যদি মনকেই প্রাণ বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতাম, যদি বিষয়কেই ভোক্তারূপে ভোগ করিতাম, যদি দৃশ্যমাত্রকেই দ্রষ্টার স্বরূপে দর্শন করিতাম, যদি জড়কেই চেতনরূপে উপলব্ধি করিতাম, তবে নিশ্চয়ই মা তোমার দোষাবরণ অপসারিত হইত। ওগো, তুমি ছাড়া আর যত কিছু সবই যে দোষ। চেতন ছাড়া, আত্মা ছাড়া, যা কিছু সবই যে দোষ। সর্ব্বরূপেই যে এক তুমি, ইহা বুঝিতে পারিলে, আর দোষ কোথায়? যতদিন দোষ বলিয়া তোমা হইতে পৃথক্ একটা কিছু থাকিবে, ততদিনই

তুমি "ন জ্ঞায়সে"। যাঁহারা এই দোষকে মিথ্যা ভ্রান্তি অধ্যাস অকিঞ্চিৎকর বা কল্পনামাত্র বলিয়া শুধু তোমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদেরও একটু না একটু দোষলেশ থাকিয়া যায়। মিথ্যাই বলুন, আর ভ্রান্তিই বলুন, দোষের দর্শন ত হইতেছে! তাই বলি—যতক্ষণ দোষকে তোমা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তোমার আবরণ রূপে দৃষ্ট হয়, ততক্ষণই তুমি "ন জ্ঞায়সে"। ততক্ষণই তুমি আবৃতা।

মাগো, গীতায় তুমিই ত বলিয়াছ—যেরূপ ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত হয়, যেরূপ মলের দ্বারা দর্পণ আবৃত থাকে, যেরূপ উল্ব অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম দ্বারা ভ্রূণ আবৃত থাকে, ঠিক সেইরূপেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। অজ্ঞানই দোষ। অজ্ঞান থাকিতে জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ইহা সত্য। কিন্তু ধূম যেরূপ বহ্নির সহজাত দোষ, মল যেরূপ আদর্শের অবশ্যম্ভাবী আগন্তুক দোষ, উল্ব যেরূপ ভ্রূণের সংরক্ষণী সহজাত চর্ম্মাবরণ দোষ, ঠিক সেইরূপই অজ্ঞান জ্ঞানের সহজাত অবশ্যম্ভাবী দোষ। অজ্ঞানও যে জ্ঞানমাত্র, ইহা বুঝিলেই, দোষ বিদূরিত হয়, জ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর তুমি "ন জ্ঞায়সে" নও; "জ্ঞায়সে"। অথবা তখন তুমি জ্ঞানরূপেই আত্মপ্রকাশ কর।

"হরিহরাদিভিরপ্যারা"—মা! আমরা কি করিয়া তোমায় জানব? তুমি যে কেবল আমাদেরই অজ্ঞেয়া তাহা নহে, হরি হর বিরিঞ্চিরও ধ্যানের অগম্যা। যতক্ষণ ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয় থাকে, ততক্ষণ ত তোমার যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না, যতক্ষণ হরিহরাদি বিশিষ্টবোধ থাকে, ততক্ষণ কিরূপে তোমার পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশ পাইবে! ওগো, আমি থাকতে তুমি আসিবে না, আমি গেলে তবে তুমি আসিবে। অপার চিৎসমুদ্রে যতক্ষণ বিশিষ্ট আমিটিকে একেবারে ডুবাইয়া দেওয়া না যায়, ততক্ষণ কিছুতেই তুমি আত্মারূপে প্রকটিত হও না। তাই তুমি "হরিহরাদিভিরপ্যপারা।"

সর্ব্বাশ্রয়া মাগো, এত দুজ্ঞে্র্য়া হইলেও আমাদের হতাশ হইবার হেতু নাই; কেননা—তুমি সর্ব্বাশ্রয়া। তুমি সকলের আশ্রয়। আমরা তোমার আশ্রিত। সহজ কথায় বলিতে হয়—তুমি আমাদিগকে

কোলে করিয়া রাখিয়াছ। তোমায় জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আমরা সর্ব্বতোভাবে তোমারই আশ্রিত—তোমারই অঙ্কস্থিত, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পর্য্যাপ্ত লাভ হয়। আমরা নিরাশ্রয় অনাথ নহি, আমরা যে তোমাতেই আছি। জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ অভাব উৎপীড়ন, যাহাই আসুক না কেন, অবস্থার বিপর্য্যয় যত রকমই উপস্থিত হউক না কেন, সর্ব্বাশ্রয়া মা তুমি, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছ। আমরা মুহূর্ত্তের তরেও তোমা ছাড়া নই। ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের বাণী আর কি থাকিতে পারে? মাগো ধন্য আমারা তোমার সন্তান। তোমার বক্ষোলগ্ন নগ্ন শিশু। মা মা মা।

"অখিলমিদং জগদংশভূতম্"—তুমি যে সর্ব্বাশ্রয়া তাহা কিরূপে বুঝিব! এই অখিল জগৎ যে তোমারই অংশভূত। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিজে যেমন সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে, অবয়বী যেরূপ অবয়বের আশ্রয়, বৃক্ষ যেরূপ ফলের আশ্রয়, অগ্নি যেরূপ ধূমের আশ্রয়, ঠিক সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ তোমারই অংশভূত বলিয়া তুমি সর্ব্বাশ্রয়া। তোমারই এক অংশ জগৎ-আকারে অভিব্যক্ত। শ্রুতিও বলেন—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"। মা! তোমার একপাদ এই জগৎ, অপর তিন পাদ স্বপ্রকাশ—সেখানে জগৎ নাই। কল্যাণী শ্রুতি আমাদের মত অল্পবুদ্ধি জীবের সহজবোধ্য করিবার জন্যই অপরিচ্ছিন্ন অনংশ পূর্ণস্বরূপ তোমার অংশ কল্পনা করিয়াছেন। তোমাকে সর্ব্বাশ্রয়া বলিলে—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় দিতে যতটা পরিমাণ আবশ্যক, তোমার সীমা বুঝি ততটুকু মাত্র; সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অতি অল্প অংশেই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। অপর অধিকাংশই স্বয়ংপ্রকাশ—নিত্যপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" এই জগৎ যখন তোমার অংশ, তখন অংশী তুমি যে ইহার একান্ত আশ্রয় ইহা বলাই বাহুল্য। তাই তুমি সর্ব্বাশ্রয়া।

"অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা"—পরিদৃশ্যমান জগতের চঞ্চলতা ও নিয়ত পরিণাম দেখিয়া, আমাদের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই জগৎ অংশে তুমিও বুঝি চঞ্চলা এবং পরিণামিনী ; তাই দেবতাগণ স্তুতি করিতে গিয়া, তোমাকে অব্যাকৃতা পরমা আদ্যাপ্রকৃতি বলিলেন। মাগো! তুমি এত বহু নামে, বহু রূপে ব্যাকৃত (বিশেষরূপে আকার প্রাপ্ত) হইয়াও অব্যাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ। তুষারখণ্ডরূপে প্রকটিত হইতে গিয়া জলীয় পরমাণুর কোনই ব্যত্যয় হয় না। বস্ত্ররূপে ব্যাকৃত হইয়াও তুলাত্ব অব্যাকৃতই থাকে। বহ্নিরেখারূপে প্রতীয়মান হইলেও অলাতচক্রস্থিত বহ্নিবিন্দুর কোনও বিকার ঘটে না। বোধ-বস্তুও যতই ব্যাকৃত হউক না কেন, কোন অবস্থায়ই তাহার বোধত্বের বিন্দুমাত্র বিকার সংঘটিত হয় না। তাই তুমি জগৎরূপে ব্যাকৃত হইয়াও স্বরূপতঃ অব্যাকৃতই রহিয়াছ। সুতরাং তুমি নির্ব্বিকার নিত্যস্থির। কোনরূপ চঞ্চলতা কিংবা পরিণাম তোমাতে নাই। "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে" প্রভৃতি ষড়্ ভাববিকার তোমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তুমি চির অব্যাকৃতা। একমাত্র চিতিশক্তিরূপিণী, বলিয়াই এই একান্ত বিরুদ্ধ ঘটনা তোমাতে সম্ভবে তাই তুমি পরমা আদ্যা প্রকৃতি! সাংখ্য যাঁহাকে পুরুষ বলেন, বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, উপনিষদ্ যাঁহাকে আত্মা বলেন, ভক্তিশাস্ত্র যাঁহাকে ভগবান বলেন, তাহা এই আদ্যা পরমাপ্রকৃতি। আর ত্রিগুণাত্মিক যে প্রকৃতি জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা অনাদ্যা। মাগো! বিশুদ্ধ বোধস্বরূপা পরমা, প্রকৃতি তুমি যখন জ্ঞাতাজ্ঞেয়জ্ঞানরূপা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা অনাদ্যা প্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হও, তখনও স্বরূপতঃ তুমি অব্যাকৃতই থাকিয়া যাও। সুতরাং তোমার প্রভাব যথার্থই অচিন্তনীয়। যথার্থই তুমি অঘটনঘটনপটীয়সী চিন্ময়ী জননী।

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মুখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে দেবি। সর্ব্ববিধ যজ্ঞে দেবতাগণ যাহার উচ্চারণে তৃপ্তি লাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্র তুমি। আবার পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য তুমিই স্বধামন্ত্ররূপে লোক কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাক। (১)

ব্যাখ্যা। মাগো, জগতে যাহারা যথাশাস্ত্র দৈব ও পৈত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা এই দুঃখসুলভ সংসার-অরণ্যে বাস করিয়াও সুখে শান্তিতে কালাতিপাত পূর্ব্বক পরমশ্রেয়োলাভ করিতে পারে। তাই গীতায় তুমি বলিয়াছ—"হে জীব, তোমরা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতা-বৃন্দের পুষ্টি বিধান করিবে এবং দেবতাগণও অন্নাদিরূপে তোমাদের পুষ্টিবিধান করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া, তোমরা পরম শ্রেয় লাভের যোগ্য হইবে। যাহারা দেবতা-দিগকে যজ্ঞভাগ অর্পণ না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, তাহারা চোর, তাহারা পাপান্নভোজী ইত্যাদি।" সত্যই মা, আমাদের ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আহৃত রূপরসাদি বিষয়সম্ভার যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপী দেবতা-বৃন্দের উদ্দেশে অর্পিত না হয়, তবে হবির অভাবে অর্থাৎ যথাযথ অনুশীলন অভাবে দেবতাগণ শীর্ণ হইয়া পড়েন—তত্তৎ বিশিষ্ট চৈতন্যের বিকাশ-শক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়; এবং তাহারই ফলে রোগ শোক অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত হইতে থাকে। আরও বিশেষ কথা—অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হয় না। দৈব ও পৈত্র্য কার্য্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যে এত গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণও স্বীকার করিতেছেন। এই যে মা তোমার মহত্ত্বের এত আলোচনা করিয়াও তোমাকে ধারণা করিতে পারি না, ইহারও হেতু ঐ দেবতা-

(১) প্রথম খণ্ডে "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

বৃন্দের শক্তিহীনতা। আমরা প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয় আহরণ করি, অন্তঃকরণের সাহায্যে বিষয় ভোগ করি ; যে দেবশক্তির সাহায্যে এই ভোগ নিষ্পন্ন হইতেছে, কই তাঁহার উদ্দেশে একবারও ত বিষয়-রূপ হবিঃ অর্পণ করি না। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি শিথিল, মন বুদ্ধি চিত্তাদির সামর্থ্য অতি অল্প। একটু সূক্ষ্মবিষয় চিন্তা কিংবা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। একটুখানি অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধারণা করিতে গেলেই, আমাদের চিত্ত কিংবা বুদ্ধি অক্ষমতা প্রকাশ করে। ইহার একমাত্র হেতু, আমরা উহাদিগকে যথাযথরূপে পরিপুষ্ট করি নাই।

স্বাহা অর্থাৎ দেবকার্য্য দ্বারা এবং স্বধা অর্থাৎ পিতৃকার্য্য—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পরিপুষ্ট ও প্রসন্ন হন এবং তাহারই ফলে দুর্ব্বিজ্ঞেয়া মা তুমিও বিজ্ঞাত—প্রকাশিত হইয়া থাক। এতদ্‌ভিন্ন আরও একটি তত্ত্ব আছে—প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তৃপ্তি বিধানের চেষ্টা না করিয়া, যদি কেবল, প্রাণরূপিণী মা তোমার উদ্দেশ্যে যাবতীয় স্বাহা-স্বধা অর্পণ করা যায়, ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়রূপ হবিঃসম্ভার যদি মহাপ্রাণরূপিণী মাতৃ-অনলে আহুতি দেওয়া যায়, তবে দেবতাগণের অপরিসীম পরিতৃপ্তি হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চেতনবর্গ পরিপুষ্ট হয়। বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, সেই রসপ্রবাহ দ্বারা শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল সকলই পরিপুষ্ট হয়। উত্তমাঙ্গে সুস্নিগ্ধ জলধারা বর্ষণ করিলে, সকল অবয়বই স্নিগ্ধ হয়। মাগো! তোমার তৃপ্তি হইলে যে সকলের তৃপ্তি নিষ্পন্ন হয়! "তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" তোমার তৃপ্তি হইলেই ত্রিজগৎ—দেবলোক, পিতৃলোক সকলই পরিতৃপ্ত হয়।

মা! তুমি নিত্যতৃপ্তা, তোমার আবার তৃপ্তিবিধান কি? আমরা নিয়ত একটা অতৃপ্তি ভোগ করি বলিয়াই তোমাতেও তৃপ্তির অভাব কল্পনা করিয়া, নিত্যতৃপ্তা তোমার তৃপ্তি বিধান করিতে অগ্রসর হই। আর তুমিও ত মা অতৃপ্তার মত আমাদের দ্বারে আসিয়া প্রতিনিয়ত

বলিয়া থাক—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ"। যেন তুমি আমাদের দেওয়া ফল ফুল পাতার ভিখারিণী। ঐটী না হইলে যেন তোমার তৃপ্তি হয় না। তাই তুমি বলিয়া থাক—"ওরে মুগ্ধ সন্তান! দে, অর্পণ কর, যাহা পারিস্—অন্ততঃ একটুকু জল, তাই দে, আমি উহাই আদরে আহার করিয়া থাকি। জিনিষের দিকে, পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিস না, শুধু ভক্তিপূর্ব্বক দিতে চেষ্টা কর, তাতেই আমার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইবে।" ওগো ভাবিতেও বুকটা কাঁপিয়া উঠে—একদিন তুমি তদ্গত-প্রাণা দ্রৌপদীর নিকট এক কণা শাকান্ন ভিক্ষা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলে। এত দয়া তোর প্রাণে মা! আমার বুকভরা অতৃপ্তি দূর করিবার জন্য তোমাকেও অতৃপ্তা হইতে হয়! অন্নপূর্ণা নিত্যতৃপ্তা মা আমার! তুমি আমাদের অতৃপ্তি দূর করিবার জন্য স্বয়ং অতৃপ্ত মুত্তিতে প্রকটিতা হও, জীবের দ্বারে দ্বারে ভক্তি ভিক্ষা কর! ধন্য জীব।

মানুষকে বৈধকার্য্যে—দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে তুমিই নিযুক্ত করাও। উদ্দেশ্য—কিছুদিন এইরূপ স্বাহা স্বধার অনুষ্ঠানে তোমার তৃপ্তিবিধান করিতে প্রায়স পাইলেই, মানুষ একদিন শুভমুহূর্ত্তে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিবে। তখন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে—তুমি নিত্যতৃপ্তা নিত্যস্থিরা নির্ব্বিকল্পা মা! তখন ধীরে ধীরে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অধিকার আসিবে। জীব নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিবে। ইহাই ত মা তোমার দেব ও পিতৃকার্য্যের স্বরূপ।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত, যাহারা একমাত্র পরম তত্ত্বকেই সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, যাঁহাদের যাবতীয় দোষ বিদূরিত

হইয়াছে, এরূপ মোক্ষার্থী মুনিগণ মুক্তিহেতুভূতা অচিন্তনীয়া মহাব্রত-স্বরূপা যাঁহাকে অভ্যাস অর্থাৎ ধ্যান করিয়া থাকেন ; হে দেবী ! সেই ভগবতী পরমা বিদ্যারূপিণী তুমি।

ব্যাখ্যা। মা ! পূর্ব্বোক্তরূপ দৈব পৈত্র্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন আত্মতৃপ্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মাতৃ-তৃপ্তির সন্ধান পায়, তখন জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত হয়—আর বিষয়ের লোভে প্রধাবিত হয় না। সে অবস্থায় একমাত্র আত্মাই যে পরমতত্ত্ব ইহা বোধ হইতে থাকে ; সুতরাং জীব আত্মলাভের বা মুক্তির আশায় উদ্বুদ্ধ হয়। ইহার নাম মুমুক্ষু অবস্থা। তখন একমাত্র আত্মার দিকেই লক্ষ্য স্থির থাকে বলিয়া বাগ্‌যন্ত্র নিরুদ্ধ হয়—মৌনাবলম্বন করে—মুনি হয়। এরূপ মুনি হইলেই মল বিক্ষেপ ও আবরণাদি দোষরাশি প্রক্ষীণ হইতে থাকে। তখন সেই মননশীল মুনিগণ যাঁহাকে অভ্যাস অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করেন, সেই তুমি গো, সেই তুমি।

এই অভ্যাসের স্বরূপ কি ? "অভি অস্যসে।" অসু-নিক্ষেপে। অস্ ধাতুর অর্থ নিক্ষেপ। উপনিষদ্ বলেন—"প্রণবধনুতে জীবাত্ম-বোধরূপ শর যুক্ত করিয়া ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে অপ্রমত্তভাবে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতে হয়।" ইহাই "অভ্যস্যসে" কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্য। কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। এস্থলেও ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ আত্মশর নিক্ষেপকেই "অভ্যাস" বলা হইয়াছে। ইহাকে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান বলিলেও কিছু ক্ষতি হয় না।

মাগো ! জীব যখন এইরূপ অভ্যাসতৎপর হয়, তখনই তুমি অচিন্তনীয় মহাব্রত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ কর। কারণ "অভ্যাস" রূপ মহাব্রত যথার্থই অচিন্তনীয়। জীব যখন বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত অবাঙ্মনোগোচর পরমাত্মস্বরূপের আভাস পাইতে থাকে, তখনই তদুদ্দেশে জীবাত্মবোধরূপ শর নিক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং এ ব্রতের স্বরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলেও, উহা বাস্তবিক অচিন্তনীয়। লিখিয়া, বলিয়া কিংবা ভাবিয়া উহার যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। কারণ যদুদ্দেশে শরনিক্ষেপ, তাহা "ভাবাতীতং

নিরঞ্জনম্”। কিঞ্চ, এইরূপ অভ্যাসব্রতই যে মহাব্রত, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত। যেহেতু এই ব্রতের অনুষ্ঠানই চরম অনুষ্ঠান, ইহার পরে আর ব্রত বলিয়া, অনুষ্ঠান বলিয়া কিছু থাকিবে না। ইহাই মুক্তির হেতু।

মা! এই মুক্তিহেতুভূতা অচিন্ত্য মহাব্রতস্বরূপা তোমার আর একটি নাম আছে—বিদ্যা। “বিদ্যা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে”। যাহা দ্বারা অক্ষয় পরমাত্মস্বরূপটি অধিগত হয়, তাহাই বিদ্যা। যাবতীয় কর্ম্ম, যাবতীয় অনুষ্ঠানই গৌণভাবে পরমাত্মলাভের হেতু হয়, তাই উহাকে অবিদ্যা ও বিদ্যার স্বল্প প্রকাশ বলা হয়। কিন্তু এই অভ্যাসরূপ যে মহাব্রত, ইহা সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু বলিয়া, ইহাকে পরমা বিদ্যা বলা যায়। হে দেবি! হে মা! তুমিই ত ভগবতী—ভগবৎশক্তি স্বরূপা পরমা বিদ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, জীবের অজ্ঞানকল্পিত বন্ধনও চিরদিনের তরে বিদূরিত করিয়া থাক। মা! বিদ্যাও তুমি অবিদ্যাও তুমি। বন্ধনও তুমি, মুক্তিও তুমি। আবার বন্ধন মুক্তির অতীতও তুমি।

মাগো! কতদিনে এ দীন সন্তানগণের হৃদয়ে, এইরূপ ভগবতী বিদ্যা স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া, অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবি? কতদিনে মা তুই বিদ্যামূর্ত্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া অবিশ্রান্ত জ্ঞানামৃত-ধারা পান করাইবি? আমরা আর কতদিন তোর অবিদ্যা মূর্ত্তির অঙ্কে অবস্থান করিয়া, তোকে না দেখিয়া বিষয়ের দিকেই চাহিয়া থাকিব? আমরা তোর অবিদ্যা মূর্ত্তির অঙ্কে রহিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সুসংযত নহে, তাইত তোর এই মহাব্রতস্বরূপা মূর্ত্তির আভাসও পাইনা। মা! কতদিনে আমাদের কাতর আহ্বান তোর কর্ণে পৌঁছিবে মা?

———

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্‌।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। মা! তুমি শব্দরূপা। সুতরাং তুমিই সুবিমল ঋক্‌, যজুঃ এবং উচ্চৈঃস্বরে গীয়মান রমণীয়পদপাঠসমন্বিত সামবেদের একমাত্র নিধান। এই সংসারের স্থিতি রক্ষণের জন্য তুমিই দেবী ভগবতী ত্রয়ীমূর্ত্তিতে বিরাজিতা ; আবার বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা রূপেও তুমিই সমস্ত জগতের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাক। তাই মা তুমিই পরমা—শ্রেষ্ঠা

ব্যাখ্যা। মা! দেবতাবৃন্দ তোমার স্তব করিতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে তোমাকে মুক্তির হেতুভূতা পরাবিদ্যারূপে দর্শন করিয়াছেন। এইবার সেই পরাবিদ্যার সাধনভূতা অপরাবিদ্যাও যে একমাত্র তুমি, অর্থাৎ ঋক্‌ যজুঃ প্রভৃতি বেদবিদ্যারূপেও যে তুমিই প্রকটিতা, তাহা পরিব্যক্ত করিতে গিয়া, প্রথমেই বললেন—"শব্দাত্মিকা"। মা তুমি—শব্দস্বরূপা। পরা পশ্যন্তি মধ্যমা ও বৈখরী বাণীরূপে তুমিই প্রতিজীবে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ। প্রণবই আদিম বাণী বা মূল নাদ। বিভিন্ন দেশ কাল ও পাত্র সংযোগে ঐ একই নাদ বহুধা বিভিন্নরূপে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বেদসমূহ ঐ প্রণবেরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্ত মাত্র। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—"তোষামৃক্‌ যত্রার্থবশনে পাদব্যবস্থিতিঃ। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃ শব্দ ইতি" ॥ যাহাতে সহজে অর্থবোধ হয়, এরূপ সুবিন্যস্তভাবে যে মন্ত্রগুলির পাদব্যবস্থা আছে, তাহার নাম—ঋক্‌। যাহা সঙ্গীতরূপে রমণীয় সুরতানসহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যায়, তাহার নাম—উদ্‌গীথ সাম। এতদ্‌ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট—যাহাতে গান কিংবা, পাদব্যবস্থা নাই, অর্থাৎ যাহা প্রায় গদ্যের মত উচ্চারিত হয়, তাহাকে যজুঃ কহে। ইহাই মা তোমার ত্রয়ীমূর্ত্তি। অথর্ব্ববেদ এবং শিক্ষাকল্প

ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহ ঐ ত্রয়ীরই অন্তর্গত। বেদসমুহ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উহার নাম ত্রয়ী। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ভাবের প্রকাশক বলিয়া অপরা বিদ্যাকে ত্রয়ী বলা যায়। ভগবানও বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ"। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তে যদিও গুণাতীত স্বরূপের উপদেশ আছে, তথাপি উহাও ত্রয়ীরই অন্তর্গত; যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, আত্মার মহত্ত্ব বর্ণনা, আত্মার স্বরূপ নির্ণয়, এ সকল যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণও উহা ত্রিগুণের অন্তর্গত।

সে যাহা হউক, "ভবভাবনায়" অর্থাৎ লোকস্থিতির জন্যই মা তোমার এই ত্রয়ী মূর্ত্তির বিকাশ। জীবগণ যাহাতে উন্মার্গগামী না হয়, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বন না করিয়া সংযত থাকে, তজ্জন্য সকল দেশেই তুমি শাস্ত্রোপদেশরূপে, বেদবিধিরূপে, ত্রয়ীমূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছ। মা! তোমার মহিমাও অচিন্তনীয়। তোমার এ ত্রয়ীমূর্ত্তিতেও ভগবতী—অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী। যে ঈশ্বরশক্তি শুধু শাস্ত্রাদেশরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে তাহাকে দেবী ভগবতী ব্যতীত কি বলিতে পারা যায়?

আবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়—যতক্ষণ কোনও মন্ত্রের (শব্দের) সাহায্যে আত্মানুভূতি লাভ করিতে হয়, ততক্ষণ উহার নাম ঋক্। শ্রুতিও "বাক্‌কেই" ঋক্ বলিয়াছেন। ক্রমে ঐ অনুভূতি যখন একটু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, সর্ব্বশরীর ব্যাপী একটা আনন্দময় বোধের উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তখন ঐ ঋক্‌ই যজুঃ রূপে পরিণত হয়। সে অবস্থায় আর মন্ত্রাদির ছন্দোবদ্ধরূপে উচ্চারণ হয় না, অর্থাৎ ছন্দঃ যতি প্রভৃতি বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। সুর-হীন তান-হীন কতকগুলি শব্দ মাত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। এই অবস্থার নাম যজুঃ। ক্রমে যখন ভাবরাজ্য আয়ত্তীভূত হইয়া যায়, উচ্ছ্বাসটা কমিয়া যায়, প্রশান্ত ভাবে অনুভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন ধীরে শান্তভাবে, সুরতান সহকারে শব্দসমূহ উচ্চারিত হইতে থাকে। ইহার নাম সাম। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে, দৈনন্দিন উপাসনার মধ্যেও এই ত্রয়ী মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে

পাওয়া যায়। কীর্ত্তনাদিতেও অনেক স্থলে ঐ ত্রয়ীর বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেবল কীর্ত্তন কেন, সকল দেশের এবং সকল সম্প্রদায়ের উপাসনার ভিতরই, নাদময়ী মহতীশক্তির এই ত্রয়ী মূর্ত্তির অভূতপূর্ব্ব বিকাশ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয়।

ঋক্ যজুঃ সাম, ইহারা বেদ। বেদন বা অনুভূতিরই নাম বেদ। অন্তরে যে আত্মানুভূতি লাভ হয়, সেই অনুভূতি যখন শব্দের আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে বেদ বলা হয়। উহা সত্য স্বরূপ আত্মসম্বেদন হইতে আসে বলিয়াই, উহার নাম বেদ। উহা কোনও মানুষের মস্তিষ্কধর্ম্মপ্রসূত কতকগুলি শব্দবিন্যাস নহে। ইহা সত্যানুভূতি বা অভ্রান্ত বেদন হইতে আবির্ভূত; এই জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। এই বেদ সকলদেশেই অল্প বিস্তর আছে।

মাগো! কেবল ত্রয়ী মূর্ত্তিতে—কেবল শাস্ত্রবিধানরূপে—জ্ঞান বিজ্ঞানরূপেই যে তুমি সংসারস্থিতি রক্ষা করিতেছ, তাহা নহে; বার্ত্তারূপেও জগতের আর্ত্তি—যাবতীয় দুঃখ দূর করিতেছ। বার্ত্তা—জীবিকা। স্থূলদেহ রক্ষার উপযোগী জীবিকারূপে—আহাররূপে সর্ব্বজীবে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তুমিই বিরাজিতা। মা! তুমিই যে আমাদের বার্ত্তা, তুমিই যে আমাদের জীবিকা, এই সত্যজ্ঞান হইতে বিচ্যুত বলিয়াই ত, আজ আমাদের এই জীবনসঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, এই চিন্তায় দেশবাসী আজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। মাগো! যাহারা জীবিকারূপেও তোমারই অব্যয় মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পায়, তাহারা যে কখনও জীবিকার অভাবে কষ্ট পায় না, এ কথাটা কবে এ দেশের লোক আবার মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবে? কবে এ দেশের লোক জীবিকার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরপদলেহন প্রভৃতি হীনকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবিকারূপিণী তোমাকে মা বলিয়া আদর করিবে ও অন্নচিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইবে? কিন্তু সে অন্য কথা:—

মহাভারতে বার্ত্তা শব্দের অর্থ অন্যরূপ দেখিতে পাই—একদিন ছদ্মবেশী ধর্ম্ম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বার্ত্তা

কি ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"মাসার্ত্তু দর্ব্বী-পরিবর্ত্তনেন, সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে, ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা"। মাস ঋতু অর্থাৎ কালের কল্পিত পরিচ্ছেদ-সমূহরূপ দর্ব্বী (হাতা) পরিবর্ত্তন করিয়া, সূর্য্যরূপ অগ্নি দ্বারা, দিবারাত্রিরূপ ইন্ধন সহযোগে, এই মহা মোহময় সংসাররূপ কটাহে, ভূতবর্গকে স্বয়ং কাল পাক করিতেছেন। ইহাই বার্ত্তা। মা তুমি কালরূপে প্রতিনিয়ত এই ভূতসংঘকে পাক করিতেছ। জন্ম স্থিতি লয়, অর্থাৎ "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে" প্রভৃতি ষড়্ভাব পরিনামের আকারে প্রতি জীবে তুমিই বার্ত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ। জীবিকা উক্ত ষড়্ভাব বিকারেরই অন্তর্ভুক্ত। মাগো। যাহারা তোমার এই প্রতিনিয়ত প্রকাশমান বার্ত্তামূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারা কখনও তোমার এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয় না। তখন তাহাদের জীবিকার জন্য আর কোন চিন্তাই থাকে না। তুমি তখন স্বয়ং যোগক্ষেমবহনকারিণী স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া, তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়া থাক। তখন তাহাদের দৃষ্টি প্রধানভাবে তোমার সেই পরম স্নেহময় এক অখণ্ড সত্তার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী যাবতীয় পরিবর্ত্তন, তাহাদের উপর দিয়া প্রায় অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যায়।

মাগো ! ধন্য তোর স্নেহ ! যতদিন আমরা সংসারস্থিতিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিব, ততদিন তুমি তোমার সেই অব্যয় স্বরূপটী অপ্রকট রাখিয়া আমাদের নিকট বার্ত্তারূপেই আত্মপ্রকাশ করিবে। আমরাও ততদিন জীবিকার জন্য বিষয়ের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় উপস্থিত হইব। আবার যখন এই সংসারস্থিতিকেই যথার্থ কষ্টকর বলিয়া বুঝিতে পারিব, বার্ত্তারূপেও যে তুমি ভিন্ন আর কেহ নয়, ইহা যখন উপলব্ধিযোগ্য হইবে, তখনই আমাদের জীবিকার চিন্তা সম্যক্ দূরীভূত হইবে ; আর তখন তুমিও মা, সর্ব্বনাশী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, আমাদের সর্ব্বভাবকে বিনষ্ট করিয়া, একা অদ্বিতীয়া

মূর্ত্তিতে—আর্ত্তিহরাস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। মাগো! তখনই তোমার "পরমা" নাম সার্থক হইবে। তুমি যে যথার্থই শ্রেষ্ঠা, তুমি যে যথার্থই পরের অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও 'মা' তখনই তাহা বুঝিতে পারিব। মাগো! যতদিন না তুমি এইরূপ আর্ত্তীহন্ত্রী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবে, ততদিন আমরা কিছুতেই এই আর্ত্তীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব না। তাই মা সকাতরে প্রার্থনা করি,—একবার দুঃখহন্ত্রী মূর্ত্তীতে সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হও! এই দুঃখসন্তপ্তবক্ষ শীতল হউক। ওগো তুমি যে মা! তুমি যে আর্ত্তিহন্ত্রী পরমা, তুমি যে পরমার্ত্তিহন্ত্রী পরমদুঃখনাশিনী মা!

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে দেবী! তুমি অখিল শাস্ত্রার্থ ধারণাবতী মেধা। তুমি দুর্গা, তুমিই দুস্তর ভবসাগরে অসঙ্গা তরণী। কৈটভারির হৃদয়-বিহারিণী কমলা, এবং চন্দ্রশেখরের অঙ্কবিহারিণী গৌরীও তুমি!

ব্যাখ্যা। মা! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বেদরূপিণী তুমি। এখন দেখিতে পাইতেছি—সেই বেদার্থধারণাবতী ধী বা মেধারূপেও তুমি। তুমিই মেধারূপিণী হইয়া যাবতীয় শাস্ত্রার্থজ্ঞান ধরিয়া রাখ, তাই আশা আছে—একদিন না একদিন আমরা তোমাকে নিশ্চয়ই পাইব—বুঝিতে পারিব। আমরা যাহা কিছু শিখি, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু গ্রহণ করি, যদি এক একটা মৃত্যুর সঙ্গে সে সকলই ভুলিয়া যাইতাম, তবে আর কখনও আমাদের এ বন্ধন দূরীভূত হইত না। কিন্তু মা, তুমি মেধারূপে আমাদের সেই বিন্দু বিন্দু জ্ঞান ধরিয়া রাখ; তাই প্রতি জন্মেই আমাদের জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়। একজীবনে আমরা যে জ্ঞান

সঞ্চয় করি, পরজীবনে আবার ঠিক সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে হয় না। যে শক্তিপ্রভাবে আমাদের এই বহুজন্ম-সঞ্চিত জ্ঞানরাশি পরিধৃত থাকে, তাহাই—মেধা।

এই মেধার চরম অবস্থা বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ স্মৃতি। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাহমস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধা"। একদিন আমাদের বুকে এই মেধারূপে তুমি ফুটিয়া উঠিবে, আমরা আমি ব্রহ্ম" এই স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইব। তুমি মেধারূপে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াইত, আমরা তোমাকে বা আমাকে চিনিতে পারি। ইহাই অখিল শাস্ত্রের সার, যাবতীয় শাস্ত্রের সারমর্ম্ম—আত্মস্বরূপাবগতি। আমি কে? তাহা বুঝিতে পারিলেই যাবতীয় শাস্ত্রের প্রয়োজন অবসিত হয়। মা! উহাই তোমার বিদিতা-স্বরূপ। যখন জীব আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখনই তুমি "বিদিতা" মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও। তোমার এই বিদিতা স্বরূপটিকে লক্ষ্য করিয়াই, সমস্ত শাস্ত্রার্থ রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রবাক্যসমূহ পরস্পর-বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু মা, যখন তুমি বিদিতা স্বরূপে জীব-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ কর, তখন আর শাস্ত্রবাক্যসমূহের এই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধভাব থাকে না। সকল শাস্ত্র যে সেই একেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে, ইহা খুব স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" যদিও এই শ্লোকটী শাস্ত্রভেদ ও মতভেদের পক্ষে পরিপোষক প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি আমরা উহার যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম "ন" কারটী প্রথম পাদের সহিত অন্বয় করিলে উহার অর্থ অন্যরূপ

হইয়া পড়ে। যথা—বেদসমূহ বিভিন্ন নহে, স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ সকলেই একার্থ লক্ষ্যে অভিব্যক্ত। তিনিই যথার্থ মুনি যাহার মত ভিন্ন নহে। অর্থাৎ যিনি ভেদদর্শী নহেন, তিনিই মুনিপদবাচ্য। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায়—হৃদয়ে নিহিত আছে। (উপনিষদ্ অনেক স্থানে গুহা শব্দে হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।) মহাজনগণ—সাধু মহাপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন—যে হৃদয়গুহা পথে গমন করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, "স পন্থাঃ" তাহাই যথার্থ পথ। ঐ পথে গমন করিতে পারিলেই, ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

সে যাহা হউক, বলিতেছিলাম—মা। তোমার ঐ "বিদিতা" স্বরূপটীই অখিল শাস্ত্রের সার। তোমাকে জানিবার জন্যই অখিল শাস্ত্রের অবতারণা। কিন্তু মা যতদিন তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ং বিদিতারূপে প্রকাশিত না হও, ততদিন কোন শাস্ত্রই তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না, আবার যখন তুমি স্বয়ং বিদিতা হও, তখন ধান্যার্থী ব্যক্তির পলালের ন্যায়, সাধকের শাস্ত্ররাশিও বিগত-প্রয়োজন হইয়া পড়ে! মা! তুমি ঐ বিদিতা স্বরূপে—বোধস্বরূপে প্রতি জীবেই সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছ, অথচ কেহই তোমাকে জানিতে—বুঝিতে পারে না; তাই তুমি দুর্গা—দুর্জ্ঞেয়া—দুরধিগম্যা।

আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিতে পাই—তুমি মেধারূপে আমাদের অনেক জন্ম সঞ্চিত জ্ঞানরাশি ধরিয়া রাখ বলিয়াই এই দুর্গম ভবসাগরে তুমিই একমাত্র তরণী। জীবগণ মেধারূপ নৌকায় অরোহণ করিয়াই "ব্রহ্মাহমস্মি" বলিয়া অনায়াসে এই দুর্গম ভবজলধি উত্তীর্ণ হইয়া যায়। পার্থিব তরণীতে কর্ণধার প্রয়োজন। কর্ণধার না থাকিলে, এ জগতের তরী চলে না; কিন্তু মা তুমি আমাদের অসঙ্গা তরণী। তরণীও তুমি, আবার পরিচালকও তুমি। মেধারূপিণী মা আমার, যথার্থই তুমি অসঙ্গা—দ্বিতীয় কাহারও সহায়তা আবশ্যক হয় না। সঙ্গরহিতা—নির্লিপ্তা। যদিও আমাদের বিন্দু বিন্দু জ্ঞানরাশি মেধারূপে ধরিয়া রাখিয়াছ, যদিও পরিচ্ছন্ন মলিন জ্ঞানরাশিকে অনাদিকাল হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, যদিও সৎ অসৎ

যাবতীয় সংস্কারই মেধারূপিণী তোমার অঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে, তাথপি তাহার সংস্পর্শে আসিয়া, তুমি পরিচ্ছিন্না বা মলিনা হও নাই। তুমি যেমন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপা অসঙ্গা মা আমার, ঠিক তেমনই রহিয়াছ। এত বহুভাব বক্ষে ধারণ করিয়াও তোমাকে বহুত্বের সংলেপ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই; তাই দেবতাগণ তোমায় "দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা" বলিয়া স্তুতি করিতেছে।

মা! তুমি কৈটভারি—বহুত্ববিনাশকারী বিষ্ণুর হৃদয়বিহারিণী শ্রী। আবার শশিমৌলি চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী গৌরী। বিষ্ণুত্ব এবং শিবত্ব তোমারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই দেখিতে পাই—এক দিকে তুমি বিষ্ণু ও শিবের প্রসূতি হইয়াও অন্যদিকে বৈষ্ণবী ও শিবানী-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। এই যে জগদ্‌ভাব, এই যে বহুত্ব, এই যে আমাদের জীবত্ব, ইহা যে শক্তিতে —যে মেধায় পরিধৃত থাকে, তাহাই বৈষ্ণবীশক্তি বা শ্রী। আবার এই শক্তি, এই মেধাই যখন অসঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ করে—আর কোনও ভাবের ধারণকর্ত্রীরূপে প্রকটিত হয় না তখনই সর্ব্বভাবের সংহারক শক্তিরূপে পরিচিত হইয়া থাকে; সুতরাং তোমার মেধা ও বিদিতা স্বরূপই মা আমাদের নিকট শ্রী ও গৌরী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকে।

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্‌ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। মাগো! তোমার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় মুখখনি দেখিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধের বশীভূত হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছিল, ইহা বাস্তবিকই অতি অদ্ভুত।

ব্যাখ্যা। যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলের কান্তিতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ হয়, তাঁহার সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যে রজগুণের বহির্মুখী চাঞ্চল্য থাকে—আবার অতিশয় অকিঞ্চিৎকর রূপরসাদি পরিগ্রহের বাসনা থাকে, ইহাই আশ্চর্য্য। ওগো, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যাঁহাকে লাভ করিলে আর কিছুরই লাভের ইচ্ছা জাগে না, তাঁহাকে দেখিয়া—প্রত্যক্ষ করিয়া, আবার চিত্ত কিরূপে যে বিষয়লোলুপ হয়, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না যথার্থই ইহা অতিশয় অদ্ভুত নহে কি ?

মাগো! জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য একিভূত হইলেও, তোমার সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দু পরিমাণও হয় না। তথাপি আমরা তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, জগতের দুঃখমিশ্রিত বিষয়ের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হই। তোমার সে অলৌকিক সুষমার কথা ভুলিয়া যাই। ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যভোগের লালসা দিয়া, তোমার সুষমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখি। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে মা ?

সাধক! আত্মস্বরূপ এক একবার যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধিযোগ্য হইলেও রাজোগুণের ক্রিয়াশীলতা সম্যক তিরোহিত হয় না। তাই বারংবার সেই অনুপম সুষমাময় পরমাত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া বিষয়বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ইহাই মায়ের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়াও মাতৃ-অঙ্গে মহিষাসুরের অস্ত্রপ্রহার। যেরূপ চঞ্চল জলরাশির অভ্যন্তরস্থ চন্দ্রবিম্ব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, যেরূপ বায়ু-প্রবাহ-পরিচালিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার অন্তরালস্থিত সূর্য্যবিম্ব সুস্পষ্ট নেত্রগোচর হয় না, ঠিক সেইরূপ—রজোগুণের বিক্ষোভজনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য মায়ের সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সম্ভোগের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া থাকে। এই অন্তরায়ের নামই মহিষাসুরের প্রহার।

মাগো। যে বৈষয়িক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তোমার এই লোকাতীত সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করি, সেই বিষয়সুষমারূপেও যে তুমিই নিত্য সুপ্রতিভাত রহিয়াছ, এ কথাটা কতদিনে আমরা

মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিব? মা! এ জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার সৌন্দর্য্যে আচ্ছাদিত, তোমারই রূপ প্রত্যেক পদার্থের প্রতি অবয়বে উদ্ভাসিত, এই সত্যজ্ঞানে এই সরল উপলব্ধিতে যতদিন আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ না হইবে, ততদিন আমরা কি যথার্থ ই তোমার সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইব?

দৃষ্ট্বা তু দেবী! কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! ক্রোধবশতঃ ভ্রুকুটীভীষণ, অথচ উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, তোমার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া, মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অতীব বিচিত্র। কুপিত অন্তককে দেখিয়া কে জীবিত থাকে?

ব্যাখ্যা। মা! তোমার ভ্রুকুটীকরাল কুপিত মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই, ইহাই আশ্চর্য। তোমার যখন কোপপ্রকাশ হয়—যখন তুমি প্রলয়ঙ্করী মুর্ত্তিতে দাঁড়াও, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যান; আর মহিষাসুর ত অতি তুচ্ছ। মাগো! দেবতাগণ তোমার ভ্রুকুটী-করাল কুপিত মুখের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—"উদ্যৎ-শশাঙ্ক-সদৃশচ্ছবি"। যখন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়, তখন রজনীর অন্ধকাররাশি যেরূপ অদৃশ্য হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপই মা তোমার প্রলয়করাল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিলে, অজ্ঞান-অন্ধকার ও দ্বৈতভাব-সমূহ সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই অবাধিত নিয়ম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা পরদৃষ্ট হইতেছে—মহিষাসুর তোমার করাল মুখচ্ছবি দেখিয়াও জীবিত রহিল, তোমার সহিত যুদ্ধ করিল, সিংহ, গজ,

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত পুরুষ, প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে তোমায় আক্রমণ করিতে লাগিল, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। কেন এরূপ হইল?

মা তুমি যে অম্বিকামূর্ত্তিতে কোপপ্রকাশ করিয়াছিলে—"কোপং চক্রে ভভোঽম্বিকা।" অম্বিকামূর্ত্তি—মাতৃ-মূর্ত্তি। মায়ের ভ্রুকুটি-করালমুখ সন্তানকে ভীত সন্ত্রস্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। মা, তুমি নিজেই ত মধুপান করিবার জন্য মহিষাসুরকে গর্জ্জনের অবসর দিয়াছিলে। তাই সে তৎক্ষণাৎ মরে নাই, যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে। মাগো! আমরা যাহাকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে করি, অঘটনঘটনপটীয়সী তোমার ইচ্ছায়, তাহা অতি সহজ ভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা আমরা একটু অনুধাবন করিলে দৈনন্দিন জীবনেই লক্ষ্য করিতে পারি। তথাপি তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তার সর্ব্বময় অক্ষুন্ন কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারি না, অহংকর্ত্তৃত্বের মিথ্যা অভিমানকে তোমার চরণতলে অর্পণ করিয়া যাবতীয় চিন্তার ভার হইতে পরিত্রাণ পাই না, ইহাই ত আমাদের দুর্ভাগ্য।

মা! মহিষাসুর নিধন ব্যাপারে তোমার এই স্বভাবিক নিয়মের অন্যথা দর্শন করিয়া দেবতাগণ বলিলেন—"কৈ র্জীব্যতে হি কুপিতান্তক-দর্শনেন" প্রকুপিত অন্তককে দর্শন করিলে, কে জীবিত থাকিতে পারে? সত্যই মা কুপিত অন্তকে দেখিলে কেহই বাঁচে না, কিন্তু কুপিতা মাকে দেখিলে সন্তান কেন বাঁচিবেনা? যতক্ষণ তুমি স্বয়ং অন্তকারিণীরূপে সম্যক্ আত্মপ্রকাশ না কর, ততক্ষণ তোমার ভ্রুকুটীকরালকুপিতমুখমণ্ডলের মধ্য দিয়াও মাতৃত্বের গৌরবময় স্নেহপূর্ণ করুণ বীক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, উদ্যৎ-শশাঙ্ক-সদৃশ মুখ-কান্তির বিকাশ হয়; তাই ত মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া, যুদ্ধ করিয়া তোমায় মধু পানের সুযোগ দিয়াছিল। ধন্য মা তোমার অনির্ব্বচনীয় লীলা। যখন—তুমি আমাদের মুখের মা ডাকটী শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাক, যখন দেখি—আমাদের মুখের মা ডাক্ শুনিয়া তোর বুকটা সত্য সত্যই মাতৃত্বের গৌরবে

ফুলিয়া উঠে, তখন আমাদের এই দুঃখদীর্ণ বুকটাও পুত্রত্বের অপূর্ব্ব গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। মা তুমি আমাদিগকে এ গৌরব অনুভবের সুযোগ প্রদান কর।

দেবি! প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। দেবি। প্রসন্ন হও। তুমি শ্রেষ্ঠা—পূজনীয়া। তুমি প্রসন্না হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়। তুমি কুপিতা হইলে সমস্ত কুল সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম; যেহেতু মহিষাসুরের এই বিপুল বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা। মা? তুমি পরমা শ্রেষ্ঠা। তুমি পরের অর্থাৎ পরমেশ্বরেরও মা। যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর নামে অভিহিত হন, তাঁহারাও তোমা হইতেই জাত, তোমাতেই স্থিত, তাই তুমি পরমা। তুমি প্রসন্না হও, তবেই আমরা ভব অর্থাৎ মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। অথবা অন্য দিক্ দিয়া দেখিতে পাই—তোমার প্রসন্নতা এবং ক্রোধ, উভয়ই জীবের পক্ষে পরম হিতকর। তুমি প্রসন্না হইলে—জীব ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। আর কুপিতা হইলে—জীবের সমস্ত কুল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাও জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল। কুল বিনষ্ট না হইলে যে অকুলের সন্ধান পাওয়া যায় না। মাগো! কত জন্ম জন্মান্তর হইতে কুলে কুলে বিচরণ করিয়া—রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিয়াই, এ জীব জীবন অতিবাহিত হইতেছে। আমরা কিছুতেই কুল পরিত্যাগ করিতে পারি না। এক কুল ছাড়ি, আবার অন্য কুল ধরি। একদিন দুইদিন নয়, কোন্ অনাদিকাল হইতে এইরূপ

কুলে কুলে বিচরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? মা, তুমি কুপিতা হইলে আমাদের সেই কুলসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। তখন আমরা অকূল সমুদ্রে অবগাহন করিয়া, আপনাকে অকূলে হারাইয়া ফেলি। এই দুঃখমিশ্রিত পরিচ্ছন্ন সুখের হাত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করি। আমাদের কুলে কুলে বিচরণ চিরদিনের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম—মা! তোমার প্রসন্নতা এবং ক্রোধ, উভয়ই আমাদের মঙ্গলদায়ক।

মাগো! যাহারা কেবল তোমার প্রসন্নতাই প্রার্থনা করে, যাহারা কেবল তোমার হাস্যময়ী মুখশ্রী দেখিতে চায়, বুঝিতে হইবে—এখনও তাহারা তোমাকে মা বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যাহারা বুঝিয়াছে—তুমি মা, আমরা সন্তান, তাহারা তোমার ভ্রুকুটী-করাল কুপিত মুখশ্রী দেখিয়াও বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। যাহারা সন্তান, তাহারা মায়ের কোপে এবং প্রসন্নতায়, তুল্যভাবে মাতৃ-স্নেহই দেখিতে পায়। মাতৃ-স্নেহে যাহারা মুগ্ধ হইতে পারিয়াছে, তাহারা মায়ের ক্রোধময়ী মূর্ত্তিতে—সংসারের শত বিঘ্ন বিপত্তিতে, সহস্র অমঙ্গলেও বিন্দুমাত্র অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পায় না। তাই তাহারা নির্ভীক পুরুষের ন্যায়—একান্ত নগ্ন শিশুর ন্যায় তোমার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে মা বলিয়া তোমারই অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

যদি বুঝিতাম—তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনও আশ্রয় আছে, তাহা হইলে বরং তোমার ক্রোধময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, ভীতচিত্তে তোমাকে ছাড়িয়া অন্য আশ্রয়ের দিকে ছুটিতাম; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিয়াছি—আশ্রয় একমাত্র তুমিই; জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-প্রসন্নতা যাহাই আসুক না কেন, সর্ব্বাবস্থায় যখন একমাত্র তুমিই আমাদের একান্ত আশ্রয়, তখন আর তোমার ক্রোধময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কেন ভীত পশ্চাৎপদ হইব? জানি—তুমি কুপিতা হইলে, আমাদিগকে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়—রোগ শোক অপমান অত্যাচার অভাব উৎপীড়ন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে থাকে; তথাপি উহারব মধ্যে যখন তোমার স্নেহকরুণামাখা মুখখানা মনে পড়িয়া যায়,

তখন ওগো চণ্ডি! মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের সকল দুর্ভাগ্য অপসারিত হয়। তখন আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া ধন্যই হই।

মা! তুমি এইরূপ কুপিতা মূর্ত্তিতে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরের বিপুলবাহিনী বিনাশ করিয়া দাও—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অকিঞ্চিৎকর রূপরসাদি বিষয়রূপ কুলকে উন্মূলিত করিয়া দাও। আমরা বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া, ওগো অকুলের তরণী মা আমার, এস, তোমার স্নেহময় অঙ্কে সর্ব্বতোভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ি। একদিন তুমি যমুনাতটে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া মোহন মুরলীধ্বনিতে গোপিকাগণকে কুল ছাড়াইয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণ নাম সার্থক করিয়াছিলে। আবার—একবার সেইরূপ এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া—তোমার সেই মধুময় সত্যের মহা আকর্ষণধ্বনিতে আমাদিগের ভুল ভাঙ্গিয়া দাও, কুল ছাড়াইয়া দাও, আমরাও অকুলে ভাসি। ওগো বহুদিন—বহুদিন কুলে কুলে থাকিয়া, কত তরঙ্গের আঘাত সহিয়াছি, কত আঘাতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কত আঘাতে মর্ম্মস্থল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর যে পারি না মা! এখন একবার এই গতিশক্তিহীন সন্তানকে তোমার অকুল স্নেহময় বক্ষে স্থান দাও।

———

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্তএব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৪॥

অনুবাদ। মা! তুমি প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে সর্ব্বদা অভ্যুদয় দান কর, তাহারা জনপদমধ্যে সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন যশ এবং ধর্ম্মবর্গ অবসন্ন হয় না, তাহাদের পুত্র ভৃত্য ও পত্নী বিনীত ও সুস্থ হয়; সুতরাং জগতে তাহারাই ধন্য।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তিতে যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া থাক, অর্থাৎ যাহারা তোমাকে নিত্যতৃপ্তা নিত্যপ্রসন্নময়ী জননী বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহারা জগতে দেবোচিত সম্মান লাভ করে। যদিও তাহারা জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি ভোগ ঐশ্বর্য্য সম্মান ও যশকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিয়া লয়, তথাপি মা তাহাদের নিকট ঐরূপ অভ্যুদয়দায়িনী মূর্ত্তিতেই তুমি আবির্ভূত হইয়া থাক। যাহারা সর্ব্বভাবে তোমায় দেখিতে অভ্যস্ত নহে, পার্থিব অভ্যুদয়রূপেও তুমিই যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক, ইহা যাহারা বিশ্বাস করে না—মানে না, তাহারা বিপদে পড়িয়া তোমার ক্রোধময়ী মূর্ত্তিরই আভাস পায়। তোমার সৌম্যা প্রসন্না মূর্ত্তি যে কি, তাহা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং পার্থিব অভ্যুদয় লাভ করিয়াও এ সকল লোক কখনও যথার্থ সুখী হইতে পারে না।

আর যাহারা সুখ দুঃখ, অভুদয় অধঃপতন, সর্ব্বাবস্থায়ই আপনাদিগকে মাতৃ-অঙ্কস্থিত পুত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাদের "ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ"—ধর্ম্মবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ কখনও অবসন্ন হয় না। তাহারা এই জগতে থাকিয়াই যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকে। মাগো, যাহারা তোমার ধর্ম্মময়ী মূর্ত্তির সেবা না করিয়া, কেবল অর্থকামের সেবা করে, তাহারাই দুঃখতাপে পুনঃ পুনঃ জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে। মা! দেখ —তোমার বড় সাধের মানব সন্তানগণের অধিকাংশই অধুনা ধর্ম্মহীন হইয়া, কেবলমাত্র অর্থকামের সেবা করিতে করিতে, কি শোচনীয় দুর্দ্দশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে অভাবের দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ মহামারী অকালমৃত্যু রোগ শোক প্রভৃতি দ্বারা এত উৎপীড়িত হইতেছে যে, শান্তি বা আনন্দ বলিয়া যে একটা জিনিষ এ জগতে আছে, এ কথাটাই যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ত্রিবিধ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া—আনন্দময় জগৎকে দুঃখময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

মাগো! তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও—তুমি তাহাদের মর্ম্মে

মর্ম্মে বুঝাইয়া দাও—ধর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হয় না। এ জগৎ যে আনন্দঘন, ইহা বুঝিতে হইলে—সেই আনন্দ ভোগ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়। জীব যে পরিমাণে ধর্ম্মপরায়ণ হয়, সেই পরিমাণে চিত্তপ্রসাদ লাভ করে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই অভাববোধ তিরোহিত হয়। অভাববোধ না-থাকিলে, অর্থেরও অভাব হয় না ; সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত কামনা পূরণের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কামনা পূর্ণ হইলেই জীব নিষ্কাম হয়। তখন তুমি মোক্ষরূপিণী মা স্বয়ং আসিয়া কল্পিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, জীবসন্তানকে অমৃতের আস্বাদ ভোগ করাও।

এরূপ সহজ সরল উদার পন্থা বিদ্যমান সত্ত্বেও, অধিকাংশ জীব পথভ্রান্ত হইয়া কেন যে উচ্ছৃঙ্খল গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে, তাহা ওগো ভ্রান্তিরূপিণী মা, তুমিই জান! মা! একবার ভ্রান্তিহরা মূর্ত্তিতে দাঁড়াও, আমাদের অনাদিকালের এ ভ্রান্তি বিদূরিত হউক। ভ্রান্তিরূপেও যে তোমারই প্রকাশ, ইহা বুঝিয়া আমরা ভ্রান্তির পরপারে চলিয়া যাই।

মা তুমি অভ্যুদয়দায়িনী মূর্ত্তিতে যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখ, তাহাদের ভৃত্য পুত্র পত্নী পরিজনবর্গ, সকলেই অনুগত শিষ্ট সুস্থ সাধুচরিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মলাভের আশায় কিংবা মুক্তিলাভের আশায়, তাহাদিগকে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জন গিরিকন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাহারা ইহলোক ও পরলোক, উভয়ই জয় করিতে সমর্থ হয়। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"। যাঁহাদের চিত্ত সমত্বে অবস্থিত, অর্থাৎ সর্ব্বত্রাবস্থিত সম-স্বরূপ মাতৃ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা এই জগতে থাকিয়াই, স্বর্গলোককেও জয় করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই ধন্য। তাই দেবতাগণও মা তোমার স্তব করিতে করিতে "ধন্যাস্তএব" বলিয়া, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

আধ্যাত্মিক পক্ষে আত্মজ, ভৃত্য এবং দারা শব্দের, যথাক্রমে

বিবেক, বিজিত ইন্দ্রিয় এবং আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিরূপ অর্থ করিলেই এ মন্ত্রের রহস্য সহজবোধ্য হইবে।

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥ ১৫॥

অনুবাদ। দেবি! তোমারই প্রসাদে সুকৃতিশালী জনগণ প্রতিদিন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত, যাবতীয় কর্ম্মকে ধর্ম্মময় করিয়া সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবং তাহারই ফলে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। অতএব হে দেবি! এইরূপে তুমি তিন লোকেই ফলদায়িনী।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ"। একমাত্র ধর্ম্মের সেবা করিলেই যথাক্রমে অর্থ কাম ও মোক্ষ ফলের অধিকারী হওয়া যায়। কিরূপে সেই ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। "প্রতিদিনং সকলানি কর্ম্মাণি অত্যাদৃতঃ ধর্ম্ম্যাণি করোতি এবঞ্চ সুকৃতী ভবতি।" প্রতিদিন সকল কর্ম্মই অতিশয় আদরের সহিত ধর্ম্মময়রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং এইরূপ করিতে পারিলেই মানুষ সুকৃতিশালী হয়, তাহারই ফলে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়। বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা—কর্ম্ম তিন প্রকার। কতকগুলি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম, যথা—সন্ধ্যাবন্দনা ব্রত নিয়ম উপবাস ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। কতকগুলি অধর্ম্ম কর্ম্ম, যথা—হিংসা দ্বেষ মিথ্যাভাষণ, পরস্বহরণ ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম্ম। আর কতকগুলি সাধারণ কর্ম্ম, যথা আহার নিদ্রা ভ্রমণ অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি। উহাতে ধর্ম্মও নাই অধর্ম্মও

নাই। কর্ম্মের এরূপ শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও আমরা কিন্তু দেখতে পাই—কর্ম্ম একপ্রকার মাত্র। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই কর্ম্ম হয়। গীতায় কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে কর্ম্মের যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাও একমাত্র বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগরূপ কর্ম্মেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই মন্ত্রে যে ঐ মূলীভূত কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা মন্ত্রস্থ "সকলানি" শব্দটীর দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সকল কর্ম্মেরই ধর্ম্মরূপে শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠাম করিতে হইবে; অশ্রদ্ধায় করিলে হইবে না। "অত্যাদৃতঃ" অতিশয় আদরের সহিত করিতে হইবে। কি হইলে সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম্য হইতে পারে? মাতৃ-কর্ত্তৃত্বের দর্শনে। মাতৃ-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানের নামই ধর্ম্ম্য কর্ম্ম। ইহা গীতার সেই "তৎ কুরুষ মদর্পণম্" মন্ত্রের সাধনময় অবস্থা। অহংবুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তারপর ঈশ্বরার্পণ করা কনিষ্ঠাধিকারের কার্য্য। অনুষ্ঠানকালেই কর্ম্মগুলিকে যথাসম্ভব মাতৃ যুক্ত ভাবে করিতে হইবে। তাই মন্ত্রে "করোতি" এই বর্ত্তমানকালবোধক ক্রিয়া পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রারম্ভ-পরিসমাপ্তির নাম বর্ত্তমান। যে কোন কার্য্যের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দর্শনই যথার্থ ধর্ম্ম কর্ম্ম্য।

বিশ্বময় একটা বিরাট কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তি আমাদের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের ভিতর দিয়া সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে। কিছুদিন এইরূপ জ্ঞানের অনুশীলন করিলেই, উহা প্রকৃতিগত হইয়া যায়। তখন আর চেষ্টা করিয়া প্রতিকার্য্যের ভিতর দিয়া মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। এইরূপ সর্ব্বত্র মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দর্শনে সিদ্ধ সাধকেরই যাবতীয় কর্ম্ম ধর্ম্মময় হয়। পক্ষান্তরে মাতৃ-যোগশূন্য—মাতৃ-কর্ত্তৃত্বদর্শনশূন্য, ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি কর্ম্মগুলি বাহিরে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, উহা বাস্তবিক ধর্ম্ম্য কর্ম্ম নহে। আর তাহার বিহারাদি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্ম্মগুলিও, যদি মাতৃ-যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহাও ধর্ম্ম্য স্মর্করূপে পরিণত হয়। যাঁহারা প্রতিদিন সকল কর্ম্ম এইরূপ

ধর্ম্মময়রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সুকৃতি। তাহাদের কৃতি মাত্রেই সু, অর্থাৎ শুভ ফলদায়ক হয়।

পক্ষান্তরে স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায় যাহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পরলোকে স্বর্গ অর্থাৎ সুখময় ক্ষেত্রে প্রয়াণ করে। আর যাহারা নিষ্কামভাবে—মাত্র মাতৃ-প্রীতি উদ্দেশে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মুক্তিলাভ করে। এ সকলই "ভবতীপ্রসাদাৎ," মা! তোমার প্রসাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তুমিই জীবকে ইহলোকে "সুকৃতি" কর, তুমিই জীবকে পরলোকে স্বর্গভোগের অধিকারী কর, আবার তুমিই ইহপরলোকের অতীত মোক্ষফল প্রদান করিয়া, জীবকে ধন্য করিয়া দাও। সুতরাং হে দেবি! তুমি "লোকত্রয়েঽপি ফলদা"। তিনলোকে ত্রিবিধভাবে কর্ম্মফল তুমিই বিধান করিয়া থাক।

"ফলদা" শব্দটীর আর একটী গূঢ় অর্থ আছে। খণ্ডনার্থক 'দো' ধাতুর প্রয়োগেও ফলদা শব্দটী নিষ্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে উহার অর্থ হয় "ফলনাশিনী"। অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্মফল যিনি খণ্ডন করিতে সমর্থা, তিনিই ফলদা।

মা! একদিকে যেমন সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু স্বর্গ নরকরূপ ফল দান কর বলিয়া, তুমি "ফলদা", অন্যদিকে তেমনই আবার জীবের যাবতীয় কর্ম্মফলগুলি জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে সমূলে ভস্মীভূত করিয়া দাও বলিয়াও তুমিই ফলদা। মাগো, এইরূপে তুমি ফলদায়িনী হইয়াও ফলনাশিনী। এই ফলনাশিনী মূর্ত্তিতে তোমার প্রকাশ হয় বলিয়াইত, আমাদের আশা আছে—একদিন তোমার অমৃতময় বক্ষে স্থান পাইব। সমস্ত কর্ম্মকলের পরপারে চলিয়া যাইব।

যতদিন জীব অহংবুদ্ধিতে সাধারণভাবে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, ততদিনই তুমি ফলদায়িনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জীবের সুখ দুঃখাদি ফলদান করিয়া থাক। আর যখন জীব অহংবোধকে তোমার রাতুল চরণে অর্পণ করিয়া, বিশ্বময় বিরাট কর্ত্তৃত্বময়ী মহাশক্তিরূপিণী তোমার কর্ম্ম যন্ত্ররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যায়, তখন

তুমি "ফলনাশিনী" মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, যাবতীয় কর্ম্মফল অবখণ্ডিত করিয়া, জীবকে মোক্ষফলের অধিকারী কর।

———

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। মা! দুর্গমে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি সকল প্রাণীরই ভয় হরণ করিয়া থাক। আর স্বস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে তুমি অতীব শুভা মতি প্রদান করিয়া থাক। হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! সর্ব্বজীবের এরূপ উপকারকারিণী সর্ব্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কে আছে?

ব্যাখ্যা। মা। তোর প্রিয় সন্তান জীব যখন দুর্গমে নিপতিত হয়, দুঃখ সঙ্কটে পড়িয়া যখন তাহা হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় দেখিতে পায় না, সর্ববিধ পুরুষকারপ্রয়োগ যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, বিপদের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা যখন চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া জীবের দৃষ্টিশক্তি নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে, ভয়ে সন্ত্রাসে জীব যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন—সেই অবস্থায়—সেই বড় দুঃখের দিনে, জীব একবার কোনও অজ্ঞেয় মহতী শক্তির দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে যে বড় দুঃসময়, তখন আর এমন কেহ নাই যে, একবিন্দু সাহায্য করিতে প্রস্তুত বা সমর্থ। সেই দুর্গমে জীব তোমার শরণ লইতে বাধ্য হয়—তোমাকে স্মরণ করে। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দুর্গে স্মৃতা।"

জগতের চক্ষুতে তাহা দুঃসময় হউক, জীবের পক্ষে কিন্তু উহাই যথার্থ সুসময়! বহু পুণ্যফলে জীব তোমায় স্মরণ করিবার

শুভ অবসর প্রাপ্ত হয়। তোমাকে স্মরণ করিলে—যথার্থ স্মরণ করিতে পারিলে, অচিরেই বিপদ্ দূরীভূত হয়। ওগো, পুত্র যখন মা বলিয়া সকাতরে ডাকে, তখন তুমি কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পার? পুত্রের কাতর আহ্বান যখন তোমার নিকট পৌঁছায় তখন তুমি যে মা উন্মাদিনীর মত সত্যলোক হইতে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হও! ও মা! তোমার সে মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াও বিহ্বল হইতে হয়। সেই আলুলায়িতকুন্তলা, সেই স্খলিতবসনা, সেই উচ্ছৃঙ্খলগমনা, সেই পাগলিনী মা আমার, সেই বক্ষে ধরিয়া তেমনি করিয়া স্নেহাদর—মা মা মা!

যাহা হউক, জীব বিপদে পড়িয়াই তোমায় ডাকিতে অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসের ফলে স্বস্থ অবস্থায়ও তোমায় ডাকিতে পারে। ক্রমে তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হয়। "সর্ব্বাবস্থায়ই আমার মঙ্গলবিধায়িনী স্নেহময়ী মা সতত আমার দিকে স্থিরলক্ষ্যে তাকাইয়া আছেন" এইরূপ বিশ্বাসে হৃদয় যখন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর মাতৃ-অস্তিত্বে বিন্দুমাত্র সংশয় প্রাণে জাগে না, তখনই জীব স্বস্থ হয়। তখন আর বিপদ্ বলিয়া কিছু থাকে না। দুঃখ সঙ্কট বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাই মনে করিতে পারে না। যতদিন জীব মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ না হইতে পারে, ততদিন কিছুতেই স্বস্থ হইতে পারে না। স্বস্থ না হইলে অস্বস্তি ভোগ করিতেই হইবে। আরে, স্ব-এর সন্ধান না পাইলে কি স্বস্থ হওয়া যায়? স্ব যে মা!

মাগো! জীব বিপদে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতে শিক্ষা করে, ক্রমে ডাকা অভ্যস্ত হয়। বিপদ্ দূর হইয়া যায়, তোমার সত্তায় বিশ্বাসবান্ হয়—স্বস্থ হয়। সে অবস্থায়ও কিন্তু ডাকটী থাকিয়া যায়। বিপদ নাই, অন্য কোনও কামনা বাসনা নাই, তবু ডাকে! তবু প্রাণের তাড়নায় তোমাকে স্মরণ করে। তখন তুমি কি কর?

"স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতীমতীব শুভাং দদাসি।" স্বস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি অতীব শুভা মতি প্রদান কর। বুদ্ধিসত্ত্বের নির্ম্মলতাই শুভা মতি। আমরা সচরাচর যে বুদ্ধি লইয়া জগতে

বিচরণ করি, ব্যবহারিক জীবন যাপন করি, উহা রজস্তমোগুণ কর্ত্তৃক মলিনীকৃত বুদ্ধি, সুতরাং অবিশুদ্ধা বা অশুভা মতি। কিন্তু মা, কামনাহীন সন্তান যখন তোমায় বারংবার ডাকিতে থাকে, বারংবার স্মরণ করিতে থাকে, তখন তোমারই কৃপায় তাহার বুদ্ধির সেই মলিনতা বিদূরিত হয়—বুদ্ধিসত্ত্ব নির্ম্মল হয়। এইরূপে অতীব শুভা মতি লাভ হইলে, তাহাতে চিদানন্দময়ী মা, তোমার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে। জীব তখন তোমার স্বরূপের আভাস পাইয়া ধন্য হয়। জন্ম মরণ মোহ চিরদিনের তরে বিদূরিত হয়। এইরূপ সর্ব্বাবস্থায় সন্তানের প্রতি সর্ব্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা তুমি ব্যতীত আর কে আছে মা? তুমিইত আমাদের দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী মা। এমনই করিয়া প্রতিজীবে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া, অসীম দয়ার পরিচয় দিয়া থাক! জীবের দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য দূরীভূত করিয়া দাও।

"দরিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী" কথাটা আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অভাববোধের নাম দারিদ্র্য। অভাববোধ থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ হইতেই ভয় আপতিত হয়। সুতরাং দারিদ্র্য, এবং ভয় এই তিনটী যেন পরস্পর সহচররূপে অবস্থিত। এই দারিদ্র্য জিনিষটা চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্ত সর্ব্বদা একটা না একটা অভাব ধরিয়াই আছে। এই অভাববোধ বা দারিদ্র্য দূর করিবার জন্যই জগৎময় এই কোলাহল, এই ছুটাছুটি। যতই সঞ্চয় কিংবা ভোগ করা যাউক না কেন, চিত্তক্ষেত্রে নিত্য নূতন অভাববোধ জাগিবেই। এই দারিদ্র্য দূর না হইলে, দুঃখ ও ভয়, কখনও দূরীভূত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে দেশময় যে একটা ভয়ানক দরিদ্রতার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার হেতু—এই অভাববোধ। অভাববোধটা যত বাড়িয়াছে, সামগ্রী সঞ্চয়ের কিম্বা ভোগের অভাব ততটা হয় নাই। কোন্ বস্তুটী পাইলে যে এই দারিদ্র্য দূরিভূত হইতে পারে, তাহা বলিয়া দিবে—সেই বুদ্ধি যতদিন অশুভ থাকে—মলিন থাকে ততদিন সর্ব্ববিধ অভাবনাশক বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, সুতরাং

অভাববোধ কিছুতেই অপনীত হয় না। এই জন্যই শুভা মতির প্রয়োজন।

যাহাকে লাভ করিলে, আর কোন লাভই অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে অবস্থান করিলে, দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই যে পরমানন্দময় নিত্যবস্তু, যাহা পাইলে দারিদ্র দুঃখ এবং ভয় চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহার সন্ধান দিবে কে? ঐ শুভা মতি—ঐ নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্ব উপনিষদের ভাষায় ইহাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হইলেই জীব পরমাত্মারূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তখন যাবতীয় অভাব দুঃখ এবং ভয় দূর হইয়া যায়। এস সাধক, এস আমারও দেবতাগণের সুরে সুর মিলাইয়া ভক্তিবিনম্র চিত্তে বলিতে চেষ্টা করি—"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ, স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা, সর্ব্বোপকার-করণায় সদার্দ্রচিত্তা"। মাগো! সকল জীবের সকল রকমের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা স্নেহবিগলিতহৃদয়া তুমি ছাড়া আর কে আছে? তুমি যে আমাদের সর্ব্বভাবেই দয়াময়ী মা; দয়ায় স্নেহে মাতৃত্বে তোমার বুকখানা নিয়তই বিগলিত। কিন্তু মা আমরা কতদিনে তোমার এই অতুলনীয় মাতৃত্ব অনুভব করিয়া যথার্থ পুত্রত্ব লাভে ধন্য হইব?

এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান বিনিহংসি দেবি॥ ১৭॥

অনুবাদ। হে দেবি! এই অসুরগণ নিহত হইলেই জগৎ যথার্থ সুখ লাভ করিতে পারে, অসুরগণও আর চিরকাল নরকজনক পাপানুষ্ঠান করিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত

হইয়া স্বর্গ লাভ করিবে, এই সকল মনে করিয়াই তুমি অসুরদিগকে নিহত করিয়াছ।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি যদি সকলেরই উপকার কর, সকলের জন্যই যদি তোমার চিত্ত দয়ার্দ্র হয়, শত্রু মিত্র পাপী পুণ্যবান্ জ্ঞানী অজ্ঞান এসকল বিচার যদি তোমার নাই থাকে; তবে এই অসুরকুলকে নিহত করিলে কেন? এ বিষয় তোমার বলিবার তিনটী কথা আছে। প্রথমতঃ ইহারা নিহত হইলে জগৎ শান্তি লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ অসুরগণও আর দীর্ঘকাল পাপাচরণ করিয়া নরকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ সম্মুখ-সংগ্রামে নিহত হইয়া, ইহারা স্বর্গে গমন করিবে। এই তিনটী উদ্দেশ্য লইয়াই তুমি অসুরকুলের বিনাশ সাধন করিয়া থাক।

যদি যথার্থ নিধন বলিয়া কিছু থাকিত, যদি যথার্থ অনুপকার বলিতে কিছু থাকিত, যদি যথার্থ নিষ্ঠুরতা বলিতে কিছু থাকিত, তবে তোমাতে উপকার অনুপকার, দয়া ও নিষ্ঠুরতারূপ দুইটী ধর্ম্ম দেখিতে পাইতাম। যখন তোমার প্রত্যেক ইচ্ছাই মঙ্গলপ্রসূ, প্রত্যেক কর্য্যেই মঙ্গলময়, তখন অমঙ্গল বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এ কথাটা যতদিন আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, ততদিনই জগতের চক্ষু দিয়া তোমাতেও উপকার অনুপকার, দয়া ও নিষ্ঠুরতারূপ দুইটী জিনিস দেখিতে পাই। স্থূলদর্শি-ভেদজ্ঞান-সম্পন্ন চক্ষুতে ঐরূপ দ্বৈতদর্শন হইবেই; কিন্তু মা, তুমি দয়া করিয়া যাহাদের ভেদজ্ঞান দূরীভূত করিয়া দাও, যাহারা বুঝিতে পারে—একমাত্র তুমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই, যাহারা বুঝিতে পারে—ধ্বংস এবং সৃষ্টি উভয়ই তোমার তুল্য আনন্দলীলা, তাহারা কি করিয়া বলিবে—তুমি কাহারও প্রতি দয়া আবার কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া থাক।

কিঞ্চ যদি ভেদদর্শন লইয়াও তোমাকে দেখা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাই—জীব তোমার সন্তান, তুমি জীবের জননী। জননী কখনও সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হইতে পারেন না তবে যাহাকে

আমরা নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করি—রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য মৃত্যু প্রভৃতি, যেগুলিকে আমরা যথার্থ অনুপকার বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া বুঝি, উহাও যে বস্তুতঃ মাতৃ-স্নেহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা বুঝিতে হইলে—ঐ সকলের ভিতরও তোমার পূর্ব্বোক্ত তিনটী অভিসন্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয়।

প্রথম উদ্দেশ্য—"জগৎত্বুপৈতি সুখম"—অসুরগণ নিহত হইলে, জগৎ শান্তিলাভ করে। স্থূলভাবে অসুরকুল নিহত হইলে, জগতের যাবতীয় অত্যাচার যে উপশান্ত হয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্মভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়—বাসনাগুলিকে বৃদ্ধির অবসর না দিয়া, প্রলয়াভিমুখী করিতে পারিলেই জীব যথার্থ শান্তির সন্ধান পায়। কারণ কামনার চরিতার্থতায় যে সুখলাভ হয়, কামনার উদ্বেলনশূন্যতা তদপেক্ষা বহুশতগুণে অধিক সুখ প্রদান করে। বিক্ষুব্ধচিত্তে বিষয়ভোগ করিয়া যে সুখ, প্রশান্তচিত্তে বিষয়ভোগের অনভিলাষে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ হয়। চিত্তবিক্ষোভের নামই দুঃখ, আর চিত্তের প্রশান্ততাই সুখ। এখন দেখ—যদি জগৎকে বা তোমাকে যথার্থ সুখী করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই অসুরকুলকে বা বাসনারাশিকে ধ্বংস করিতে হইবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—"নরকায় চিরায় পাপং ন কুর্ব্বন্তু"—অসুরবৃন্দ বা বাসনাময় চিত্ত প্রতিনিয়ত বাসনায় চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে করিতে চিরকালের জন্য নরক ভোগ না করে। নর যেখানে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাকে নরক বলে। ছোট ছোট বিষয়, ছোট ছোট কামনা লইয়া, মানুষ এমন মুগ্ধ থাকে যে, যথার্থ সুখের সন্ধানই পায় না ; সুতরাং উহাদিগকে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত করা একান্ত আবশ্যক। এবং ইহাই অসুর-নিধনের তৃতীয় উদ্দেশ্য। যাহা যথার্থ সুখ, তাহাকে সম্মুখে ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বাসনাকে সমষ্টীভূত করিয়া, তদভিমুখে পরিধাবিত করিতে পারিলেই নরকীয় বৃত্তিনিচয় বিলয় প্রাপ্ত হয়। সম্মুখ সংগ্রামে অসুর বিনাশের ইহাই রহস্য। ভূমা সুখের আভাস সম্মুখে দেখিতে পাইলেই জীব দুঃখমিশ্রিত ক্ষণস্থায়ী সুখের কামনা

অনায়াসে পরিহার করিতে সমর্থ হয়। মা আমার আনন্দময়ী পরমসুখময়ী মূর্ত্তিতে যখন সম্মুখে দাঁড়ান, তখনই যাবতীয় আসুরভাব বিলয় হইয়া যায়; তাই দেবতাগণ বলিলেন—"অহিতান্ বিনিহংসি"। যাহা অহিত—যাহা আমাদের পক্ষে হিতকর নহে, এরূপ ভাবসমূহকে ধ্বংস করিয়া, আমাদের পরম মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই মায়ের এই সমর-বিড়ম্বনা।

দৃষ্ট্বৈব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেম্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৮॥

অনুবাদ। মা! তুমি দৃষ্টিপাতমাত্রই ত অসুরগণকে ভস্ম করিতে পারিতে, তথাপি তাহা না করিয়া, সমস্ত শত্রুগণের প্রতি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ইহার হেতু শত্রুগণও তোমার অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে। অহো! শত্রুগণের প্রতিও তোমার এইরূপ সাধ্বী মতি রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি তুমি, তোমার ইচ্ছামাত্রেই ত আসুরিক ভাবনিচয় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইতে পারে; তাহা না করিয়া অরিগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপরূপ এই সংগ্রাম-বিড়ম্বনা কেন মা? ওগো, ইহার মধ্যেও যে তোমার সাধ্বী মতি—মঙ্গলময়ী ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে। তোমার স্বহস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়া, উহারা পবিত্র হইবে—নিষ্পাপ হইবে, উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবে—তোমার বর-বপুতে মিলাইয়া যাইবে, এইরূপ অতি উদার ও সাধ্বী মতি লইয়াই তোমার এই সংগ্রামলীলা। শত্রুর প্রতিও তোমার এইরূপ মহতী দয়া ইহা চিন্তা করিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। যাহাকে আমরা নিষ্ঠুরতা মনে করি, তাহা বাস্তবিক নিষ্ঠুরতা নহে; করুণার ছদ্মবেশ মাত্র।

মাগো! তুমি যখন জীবের আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে শস্ত্রপূত করিতে থাক, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা-রাশিকে একটু একটু করিয়া তোমার অভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাক, যখন চিত্তের বৃত্তিগুলি জড়ত্বের মোহ কাটাইয়া, একটু একটু করিয়া বোধময় সত্তার সন্ধান পায়, তখনই ত উহারা স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে থাকে। ইহাই দেবতাগণ ভক্তিবিনম্রকণ্ঠে বলিতেছেন—"লোকান্ প্রয়ান্ত রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ"। মা, আমাদের বহির্মুখ বৃত্তিগুলিকে এইরূপ বিন্দু বিন্দু আনন্দরসের ভোগ করাইয়া, ক্রমে তোমাতে সম্যক্ মিলাইয়া লও। আর তুমি তখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বরূপে বিরাজ করিতে থাক। মাগো! ধন্য তোমার কার্যপ্রণালীর অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা।

খড়্গ প্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতাবিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। মা! তোমার খড়্গপ্রভাসমূহের বিস্ফুরণ, এবং শূলাগ্রভাগসমূহের দীপ্তি যে অসুরগণকে দর্শনশক্তি বিলয় করিতে পারে নাই, তাহার হেতু—অসুরগণ তোমার এই জ্যোতির্ম্ময় ইন্দুকলা-বিভূষিত অতুলনীয় মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মা! স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—এই মহিষাসুরযুদ্ধে তোমার খড়্গপ্রভাসমূহের বিস্ফুরণ এবং শূলাগ্রভাগসমূহের কান্তি, অসুরগণের দৃষ্টিশক্তিকে বিলয় করিতে পারে নাই; আবার সূক্ষ্মভাবেও দেখিতে পাই—তোমার বিজ্ঞান-খড়্গের প্রভা এবং জ্ঞানময় শূলের কান্তিও আসুরিক দৃষ্টির সম্যক্ বিলয় সাধন করিতে পারে না। কেন এরূপ হয়? যে বিশুদ্ধ বোধরূপ শাণিত অস্ত্রের প্রভাবে যাবতীয় দ্বৈতরূপ দৈত্যকুল সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার

আভাস পাইয়াও আসুরিক দৃষ্টির বিলয় হয় না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর নিরূপণ করিতে গিয়া দেবতাগণ বলিলেন—"অংশুমদিন্দুখণ্ড যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং"। মাগো ! তোমার সমুজ্জ্বল মুখচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই অসুর-দৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। মায়ের হাস্যময়ী স্নেহময়ী আনন-সুষমা নিরীক্ষণ করিতে পারিলে, আর দৃষ্টিবিলয়ের আশঙ্কা থাকে কি ? আসুরিক সত্তাও যে চিদানন্দময়ী মাতৃ-সত্তাই, তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ রহস্য সম্যক্ অনুভব করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ আসুরিক ভাবের বিলয় সাধন করিয়া বিশুদ্ধ বোধস্বরূপা তোমার সত্তাকে ধরিতে চাহেন, তাঁহারা হয়ত এ রহস্য উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা করুন। কিন্তু একটু ধীরভাবে দেখিলে, তাঁহারাও অকুণ্ঠীত কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন—মায়ের মুখখানি দেখিতে পাইবার পরও অসুর-দৃষ্টি থাকিতে পারে এবং থাকে, ক্রমে—কালে তাহা সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয়। মাগো, তোমার প্রিয়তম মানব সন্তানগণকে তুমি বুঝাইয়া দেও যে, আসুরিক দৃষ্টি থাকিতেও তোমার স্নেহকরুণাময় বদনসৌন্দর্য্য দেখিবার সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। অতি দুরাচার ব্যক্তিও তোমায় অনন্যচিত্তে ভজনা করিতে পারে। তোমায় দেখিতে না পাইলে, অনন্যচিত্তে তোমার ভজনা হয় কি ? কিন্তু সে অন্য কথা।

মা ! চন্দ্রের দৃষ্টান্তেও আমরা এই সত্যে উপনীত হইতে পারি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"অংশুমদিন্দু" অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—কিরণ ত চন্দ্রের নহে, উহা সূর্য্যের। চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণই চন্দ্রকিরণ রূপে দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ যেগুলিকে আমরা আসুরিক দৃষ্টি বা আসুরিকভাব বলিয়া মনে করি, তাহাও যে মা তোমারই সত্তায় সত্তাবান্, তোমারই প্রকাশে প্রকাশিত, তদ্‌ভিন্ন উহাদের কোন পৃথক্ সত্তাই নাই, এ রহস্য যাহারা যথার্থ অনুভব করিতে পারে, তাহাদের আসুরিক দৃষ্টি বিলয় হওয়া না হওয়া উভয়ই তুল্য হইয়া থাকে।

একমাত্র প্রাণরূপিণী তুমিই ত সুর অসুর উভয় আকারে প্রকাশিত। আমরা তোমায় না দেখিয়া ঐ আকারে মুগ্ধ হই বলিয়াই প্রবঞ্চিত হই। কল্যাণময়ী মা, তুমি আমাদের এই মোহ দূর কর; কল্যাণদৃষ্টি উন্মেষিত কর। প্রাণে প্রতিষ্ঠিত কর।

দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবী শীলম্
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! দুর্ব্বৃত্তগণের বৃত্ত-প্রশমনকারী তোমার স্বভাব, অচিন্তনীয় তোমার রূপ, দেবপরাক্রমবিনাশী—অসুর নিধনকারী তোমার বীর্য্য এবং বৈরিদলের প্রতিও তোমার এইরূপ দয়া, এ সকলের তুলনা একমাত্র তোমা ব্যতীত অন্য কোথাও নাই।

ব্যাখ্যা। মাগো! চিত্তের বৃত্তিসমূহ যতদিন অসৎ বস্তুতে বর্ত্তমান অর্থাৎ আসক্ত থাকে, ততদিনই উহারা দুর্ব্বৃত্ত। একমাত্র সৎস্বরূপা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যতদিন চিত্তক্ষেত্রে বৈষয়িক স্পন্দন প্রকাশিত হয়, ততদিনই বৃত্তিসমূহ দুর্ব্বৃত্ত। কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে সম্যক্ প্রশমিত করাই তোমার স্বভাব। মা! "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" —দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করাই তোমার কার্য্য! কিরূপে ইহা নিষ্পন্ন হয়? তোমার রূপ দেখিলেই দুর্ব্বৃত্ত প্রশমিত হয়। "রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যম্" তোমার রূপ অচিন্তনীয়। চিন্তা—চিত্তধর্ম্ম। তোমার রূপটী যখন প্রকাশিত হয়, তখন চিত্ত বলিয়া কিছু থাকে না, থাকিতে পারে না; সুতরাং চিন্তাও থাকে না। তাই মা, দুর্ব্বৃত্তদিগের বৃত্তপ্রশমন অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহাই তোমার স্বভাব।

সাধক ! তোমরা সে অরূপের রূপ কখনও দেখিয়াছ কি ? পরিচ্ছিন্ন সীমাবিশিষ্ট কোনও রূপ দেখিলে হয়ত বা মুগ্ধ নাও হইতে পার ; কিন্তু সে রূপহীন রূপসাগরে অবগাহন করিলে, নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। একটা তুচ্ছ পার্থিবরূপে মুগ্ধ হইয়া মানুষ কুল শীল মান সকল জলাঞ্জলি দিতে পারে ; আর সেই অপরিচ্ছিন্ন মধুময় প্রাণময় প্রেমময় রূপের সম্মুখে দাঁড়াইলে, জীব কি আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারে ? ওগো এস, সকলে মিলিয়া মায়ের সেই অচিন্তনীয় রূপসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। চিরদিনের পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। সকল দুর্ব্বৃত্ত প্রশমিত হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

মাগো ! তোমার রূপ দেখিলে যে চিত্তবৃত্তি আপনা হইতে প্রশান্ত হইয়া যায়, ইহা যাহারা বিশ্বাস না করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া শুধু কৌশলের সাহায্যে চিত্ত নিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদিগকে তোমার এই রহস্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও। মা বলিয়া, সত্য বলিয়া, প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়া আহ্বান করিলেই, তোমার অচিন্ত্য রূপ রাশি উদ্‌ভাসিত হয়। এমনই মধুময় সে রূপ, এমনই সীমাহীন ভাষাহীন সে রূপ---তাহার প্রকাশ হইলে, চিত্ত আপনা হইতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, দুর্ব্বৃত্ত—অসৎপ্রিয়তা সম্যক্ বিদূরিত হয়। নির্ব্বিকল্পা নিরঞ্জনা ভাবাতীতা মা আমার ! তোমার প্রকাশে সর্ব্বভাব সর্ব্ববিধ বৈষয়িক প্রকাশ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শুধু রূপ নয়, তোমার বীর্য্যও দুর্ব্বত্তদিগের বৃত্ত প্রশমন করিতে সমর্থ। যে আসুরিক বৃত্তি-নিচয় দেবভাবগুলিকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া দেয় তাহাদিগের সেই শক্তিকে একমাত্র তুমিই বিলয় করিয়া দিতে সমর্থ। তোমার যে বীর্য্য, যে মহতী শক্তি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকে, সেই অমিতবীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলেও চিত্তবৃত্তি বিনা প্রযত্নে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

মাগো, যাহারা তোমার রূপহীন রূপের ধারণা করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ যাহারা "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই স্বরূপ লক্ষণ ধরিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না ; তাহাদের জন্য তোমার এই

অমিত বীর্য্য—এই মহতী শক্তিধারণার উপদেশ বিহিত হইয়াছে। তাহারা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই তটস্থ লক্ষণ ধরিয়া, (যাঁহা হইতে জগতের জন্ম স্থিতি লয় হয়,) তাঁহার—সেই লীলাময়ী মহতীশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইবে। ইহা দ্বারাও চিত্তবৃত্তি অনায়াসে নিরুদ্ধ হয়। আর যাহারা ইহাতেও অক্ষম, তাহাদের জন্য "বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্" তোমার অতুলনীয় দয়ার কথাটী স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি বৈরিদলের প্রতিও দয়া বিতরণে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন না, তিনি—সেই তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার পুত্র; সুতরাং আমরা কখনও তোমার দয়ালাভে বঞ্চিত হইব না। মা, জগৎময় যে অসীম দয়া ছড়ান রহিয়াছে, এই নিয়ত প্রত্যক্ষ অতিশয় প্রকটিত তোমার দয়ার সম্মুখে সরলপ্রাণে সত্যজ্ঞানে একবার মা বলিয়া দাঁড়াইলেও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়—অসুরকুল বিলয় প্রাপ্ত হয়।

মা, এইরূপে তোমার রূপ, তোমার শক্তি এবং তোমার দয়া এই তিনটীর যে কোনটীকে আশ্রয় করিলেই চঞ্চলচিত্ত নিরুদ্ধ হয়, দুর্ব্বৃত্ত বৃত্ত অনায়াসে প্রশমিত হইয়া যায়। তাই দেবতাগণ বলিলেন—মা! দুর্ব্বৃত্তদিগের বৃত্তপ্রশমন করাই তোমার স্বভাব। এই তিনটীই মা, অতুলনীয়। অন্য কোন সাধনা অন্য কোন উপায় উহার সহিত তুলনাযোগ্য নহে। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অতুল্যমন্যৈঃ"।

মাগো! আমরা কিন্তু তোর কনিষ্ঠ পুত্র; আমাদের পক্ষে, তোর তৃতীয় উপদেশই একান্ত উপযোগী। আমরা তোর কৃপার ভিখারী। বিশ্বময় তোর যে দয়াময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইতে চেষ্টা করিব। মা বলিয়া, তোর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিব, একদিন তুমি নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে, একদিন নিশ্চয়ই তোমার দয়া উপলব্ধি করিতে পারিব। সেদিন আমাদের দুর্ব্বৃত্ত প্রশমিত হইবে। তারপর বিনা চেষ্টায় তোমার বীর্য্যে বা তটস্থ লক্ষণে উপনীত হইব; সর্ব্বশেষে তুই অরূপের রূপ লইয়া, আমাদের আত্মারূপে—সত্য জ্ঞান আনন্দস্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপে প্রকটিত হইবি, আমাদের মা

ডাক সার্থক হইবে। আনন্দে জয় মা বলিয়া জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের পরপারে চলিয়া যাইব। মাগো! সে দিনের কত দেরী?

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! হে বরদে! তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কোথায়? শত্রুভয়প্রদ অথচ অতি মনোহর এমন রূপই বা কোথায়? চিত্তে কৃপা অথচ সমরনিষ্ঠুরতা, এই ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র তোমাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা। মা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি তুমি, সুতরাং তোমার পরাক্রমের তুলনা নাই; এ কথা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে জগতে যাহা পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বলের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের অশ্রুবিন্দু ভূমিতলে নিপাতিত না করিতে পারিলে, পরাক্রমের সার্থকতাই হয় না। কিন্তু মা, তোমার পরাক্রম ঠিক ইহার বিপরীত। বৈরিদলের প্রতিও অসীম করুণা বর্ষণ করাই তোমার পরাক্রমের ফল। সুতরাং জগতের পরাক্রমের সহিত তোমার পরাক্রমের তুলনা একান্ত অসম্ভব।

তারপর তোমার রূপ—তাহাও অতুলনীয়। ভয়জনকত্ব এবং মনোহরত্ব, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ এই ধর্ম্মদ্বয় একমাত্র তোমার রূপেই বিদ্যমান। জগতে কোথাও এরূপ পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মের সম্মিলন সম্ভব হয় না। যুগপৎ শত্রুর প্রতি ভয়দায়ক ও পুত্রের প্রতি আনন্দদায়ক রূপ একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

রজোগুণজনিত চিত্তবিক্ষেপরূপ শত্রুসমূহ তোমার সেই রূপহীন

রূপ-সাগরে অবগাহন করিতে গিয়া, যেন ভয়ে ভয়ে মিলাইয়া যাইতে থাকে, আবার অন্যদিকে, সেই অচিন্তনীয় রূপের প্রকাশে সাধকের প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্ফুরিত হইতে থাকে। মা! তোমার চিত্তে মহতী কৃপা, অথচ বাহিরে সমর-নিষ্ঠুরতা—শত্রুসংহারের জন্য প্রাণপণে শাণিত অস্ত্রনিক্ষেপ, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একমাত্র তোমাতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জগতে যে রোগ শোক অত্যাচার উৎপীড়ন দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কনিষ্ঠ সন্তানগণ উহাতে কেবল তোমার নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা তোমার স্নেহ-স্তন্য পানে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহারা যুগপৎ তোমার চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা দেখিয়া ধন্য হয়। তুমি যে সমরনিষ্ঠুরতার কঠোর আবরণে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া, জীব সন্তানগণের প্রতি অসীম করুণাধারা বর্ষণ করিয়া থাক, তাহা তাহারা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে এবং সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, একমাত্র তোমার কৃপারূপ অনাবিল আনন্দরস পান করিয়া নিয়ত প্রফুল্ল থাকে।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২২॥

অনুবাদ। মা, তুমি শত্রুসংহার করিয়া এই অখিল ত্রিলোক পরিত্রাণ করিলে, সমরক্ষেত্রে নিহত করিয়া শত্রুদিগকে স্বর্গ প্রদান করিলে এবং আমাদিগেরও উদ্ধত অসুরভীতি বিদূরিত করিলে; মাগো! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! জগতে প্রতি জীবে এইরূপ তিনটী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তোমার দয়াময়ী নাম সার্থক করিয়া থাক। ত্রিলোকের শান্তি, অসুরগণের স্বর্গপ্রদান, এবং আমাদিগের অসুরভীতিবিমোচন, ইহাই

তোমার কার্য্য। তোমার দয়ার ইহাই তঃ বাহ্যফল। আমরা যে বহু জন্ম হইতে কামক্রোধাদির অত্যাচারে—সঞ্চিত সংস্কাররূপ অসুরগণের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছিলাম, তুমি স্বয়ং অসিহস্তে আমাদের হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, সেই অসুরকুলকে নির্ম্মূল করিলে। আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যে অসুরভীতির প্রবল সংস্কার আবদ্ধ হইয়াছিল, যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আমরা প্রাণ ভরিয়া তোমায় মা বলিয়া ডাকিতে পারি নাই, ভাবিতাম—কাম ক্রোধাদি থাকিতে, চিত্তের মলিনতা বিদ্যমান থাকিতে, সংসারাশ্রম বর্ত্তমান থাকিতে, তোমাকে ডাকিতে পারা যায় না, আজ তুমি সন্তানস্নেহে বাধ্য হইয়া আমাদের সে আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছ। প্রাণের সংকীর্ণতা দূর হইয়াছে। সঞ্চিত কামনারাশির বিক্ষোভজনিত চিত্তের আসুরিক চঞ্চলতা আর নাই। যাহারা আমাদের মাতৃ-মিলনের অন্তরায় ছিল, যাহাদিগের প্রতি আমরা বৈরবুদ্ধি পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ দেখিতে পাইতেছি—তাহারাও তোমার স্নেহে সঞ্জীবিত হইয়া—বিশুদ্ধ হইয়া, তোমারই পবিত্র অঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার অপরিসীম দয়ার প্রভাবে তাহারাও আজ "দিবং নীতাঃ" স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। যাহারা ভুরাদি লোকত্রয়ে অত্যাচার করিয়া একদিন অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন দেখিতে পাইতেছি—তাহারাও তোমারই অঙ্গের ভূষণ হওয়ায়, আমাদের সেই ত্রিলোকব্যাপী অশান্তি বিদূরিত হইয়াছে। (ত্রিলোকের অত্যাচার পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তুমি জগৎ পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছ—চতুর্দ্দিকে ক্রমে তাহারই আয়োজন চলিতেছে। ওগো, তুমি বাক্য এবং মনের অতীত—অপরিচ্ছিন্ন: তথাপি এমন করিয়া প্রতি জীব-হৃদয়ে তোমাকে এত ক্ষুদ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ওঃ! তোমার দয়া,—বাক্য এবং চিন্তার অতীত। আমাদের আর কি আছে মা! শুধু প্রণাম লও— "নমস্তে নমস্তে নমস্তে"।

—০—

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৩ ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! শূল খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি এবং ধনুর জ্যাধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে চণ্ডিকে! হে ঈশ্বরি! তোমার আত্মশূল পরিভ্রামিত করিয়া, পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দিকে আমাদিগকে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা। শূল ও খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি এবং ধনুর জ্যাধ্বনি প্রভৃতির আধ্যাত্মিক রহস্য ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুনরায় তাহা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

দেখ—সাধক! তোমারও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, সর্ব্বত্র মাতৃ-শক্তি মাতৃ-আহ্বান বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞান ও নাদ-শক্তিই সর্ব্বত্র বিষয়াকারে বিরাজিত। এস, আমরাও শক্রাদি দেবতা-বৃন্দের ন্যায় সরলপ্রাণে কাতরভাবে প্রার্থনা করি। মাগো! শূল খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি জ্যাধ্বনি প্রভৃতি তোমার যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর! যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যে ঘন জড়ত্বের দুশ্ছেদ্য মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়, এই জড়ত্বরূপ মহা অসুরের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। একমাত্র প্রাণস্বরূপা তুমিই আমাদের চতুর্দ্দিকে পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছ, এ কথাটা আমরা সহস্র আলোচনাতেও ভুলিয়া যাই, জড়ত্বের দ্বারা পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হই, তাহারই ফলে কত লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুর অসহনীয় পেষণ সহ্য করিতে হয়। মা! আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন আমাদের প্রাণস্বরূপিণী মাতৃ-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। আর যেন বিষয়বোধে, বিষয়ভোগ করিয়া ত্রিতাপবিষে বিদগ্ধ হইতে না হয়। মাগো! আমাদের এই জড়ত্বপ্রতীতি

বিদূরিত করিতে, তোমার যত রকম শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাই কর।

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ২৫ ॥
খড়্গশূলগদাদীনি যাণি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। মা! ত্রিলোকে তোমার যে সকল সৌম্য এবং অতি ভয়ানক রূপ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তের দ্বারাই আমাদিগকে এবং এই বিশ্বকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে! খড়্গ শূল গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজিত, সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

ব্যাখ্যা। মা! এই জগতে দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে তোমার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সৌম্যা, অন্য ঘোরা। যখন পার্থিব বা অপার্থিব সর্ব্ববিধ সুখসম্ভার লইয়া, তুমি সৌম্যমূর্ত্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, তখন যেন আমরা সুখের মোহে তোমার স্নেহের পরশটী বিস্মৃত না হই। পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্য এবং অপার্থিব সিদ্ধি শক্তি কিংবা স্বর্গাদি সুখ, যেন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে না পারে। মাগো! সৌম্যমূর্ত্তিতে এই মুগ্ধতার হাত হইতে তুমিই আমাদিগকে রক্ষা করিও। সর্ব্ববিধ সুখরূপে-যে তুমিই উপস্থিত হও, এ কথাটা মুহূর্ত্তের তরেও আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত না হয়। আবার যখন দুঃখ দুর্দ্দৈবের আমানিশা উপস্থিত হয়, যখন রোগে শোকে দারিদ্র্যে লাঞ্ছনায় মৃত্যুভয়ে উৎপীড়িত হইতে থাকি, তখন যেন বুঝিতে পারি—মা, তুমিই ঘোরা মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছ। সে সময় তোমার

সেই ভীতপ্রদায়িনী মূর্ত্তি দেখিয়া যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হই, যেন অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া না পড়ি তোমার অস্তিত্বে—তোমার মাতৃত্বে বিন্দুমাত্র সংশয় না আসে, যত ঘোরা মূর্ত্তিতেই তুমি আবির্ভূত হও না কেন—প্রকৃতি যতই প্রতিকূল বেদন লইয়া উপস্থিত হউক না কেন, তুমি যে যথার্থই আমাদের মা, ইহাতে যেন তিলমাত্র অবিশ্বাস স্থান না পায়! মাগো! এ জীবনচক্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন নিয়তই হইতেছে, হইবে। উহার মধ্যেই তোমার সৌম্যা ও ঘোরা মূর্ত্তির প্রকাশ। এই উভয় মূর্ত্তিতেই আমাদিগকে রক্ষা কর। কেবল আমাদিগকে নয়—"তথা ভুবম্," এই বিশ্ববাসী যেখানে যত জীব আছে, সকলকেই রক্ষা কর মা! সকলকেই রক্ষা কর। একমাত্র তুমিই যে সুখ দুঃখ আকারে উপস্থিত হইয়া থাক, ইহা প্রতি জীবে মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত করিয়া দাও! ইহারই নাম—রক্ষা। কোনও অবস্থায়ই জীব যেন আপনাকে মাতৃহারা নিরাশ্রয় অনাথ বলিয়া মনে না করে। ইহা করিতে গিয়া, মা তোমার যত রকম অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হয়, সকলই কর। ওগো সর্ব্বায়ুধধারিণী মা আমার! তোমার যাবতীয় আয়ুধ প্রয়োগ করিয়াও আমাদিগকে রক্ষা কর। "রক্ষঃ সর্ব্বতঃ"—সকল হইতে রক্ষা কর। এই যে সর্ব্বভাব, এই যে বহুভাব—ইহা হইতে রক্ষা কর। একমাত্র সচ্চিদানন্দময়ী তুমিই যে সর্ব্বভাবে অভিব্যক্ত, তদ্‌ব্যতীত সর্ব্ব বা বহু বলিয়া কিছুই যে নাই—এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর! আমরা যে সর্ব্বাবস্থায়ই সত্যের আশ্রিত, সত্যে স্থিত, এই মহাজ্ঞানরূপে তুমি প্রতি জীবহৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও মা! দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও! জগৎ হইতে দুঃখ ভয় চিরতরে মুছিয়া যাউক।

———

ঋষিরুবাচ

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ২৭ ॥
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দ্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবগণ জগদ্ধাত্রী মাকে এইরূপ স্তব করিয়া, নন্দনবনসম্ভূত দিব্য কুসুম, গন্ধ এবং অনুলেপন দ্বারা পূজা করিলেন। সমস্ত দেবতা ভক্তির সহিত দিব্য ধূপের দ্বারা দেবীকে সৌরভাকুলিত করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রসন্নমুখী দেবী প্রণত দেবতা-বৃন্দকে বলিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ এইরূপ স্তব করিয়া, গন্ধ পুষ্প ধূপাদি দ্বারা জগৎ বিধারিণী মহাশক্তির পূজা করিলেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও দেখিতে পাওয়া যায়—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাবসমূহরূপ নন্দন কুসুম, বিবেকানলে জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় দাহজনিত সুরভি ধূপ, এবং শ্রদ্ধা নির্ম্মমতা বিরাগ শুচিতা প্রভৃতি গন্ধানুলেপন দ্বারা জগদ্‌বিধারিণী মায়ের পূজা করিয়া থাকেন। তিনিও এইরূপ পূজায় প্রসন্ন হইয়া, বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন। এইস্থানে পূজাসম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গীতায় উক্ত হইয়াছে—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি"। এই দেবীমাহাত্ম্যেও অনেক স্থানে পত্র পুষ্পাদি দ্বারা পূজার উল্লেখ আছে। এতদ্‌ভিন্ন যাবতীয় স্মৃতি সংহিতা পুরাণাদি শাস্ত্রে পূজার বিধান বহুধা উক্ত হইয়াছে। অথচ অন্যত্র দেখিতে পাই—"বাহ্যপূজাধমাধমা" এইরূপ উল্লেখও আছে। কেহ কেহ বা এই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র ধ্যানের সাহায্যে পরমাত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা করিয়া থাকেন! এ সম্বন্ধে আমরা কি বুঝিব?

আমরা বুঝিব—যতদিন আহার নিদ্রা আছে, যতদিন অনুকূল প্রতিকূল বোধ আছে, যতদিন লঘু গুরু জ্ঞান আছে, ততদিন বাহ্য পূজা থাকিবেই। শুধু ফুল বেলপাতা ছাড়িলেই বাহ্যপূজার পরিত্যাগ হয় না। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—পুজাটী যেন কেবল বাহ্যরূপা রূপেই অনুষ্ঠিত না হয়। বাহ্যপূজা যে যথার্থই অধম হইতেও অধম, ইহা খুবই সত্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“উপাস্য একজন, আর উপাসক আর একজন, এইরূপ ভেদজ্ঞান নিয়া যাঁহারা দেবপূজা করেন, তাঁহারা দেবতাদিগের পশু”। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন—“অন্য দেবতার পূজা করিলে, উহা অবৈধ হইয়া থাকে”। ভেদজ্ঞান নিয়া পূজার নামই বাহ্যপূজা। যতদিন “বাহ্য” বলিয়া একটা ঘন বোধ থাকে, ততদিন যথার্থ পূজার অধিকার হয় না। বাহ্য বলিয়া কিছু নাই, “সবই যে অন্তর” এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তখন আর বাহ্যপূজা থাকে না। ইহা শুধু মুখে বলিলে হয় না—এই জগৎকে অন্তর বলিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। শুধু ঐ অন্তর বাহির ভেদজ্ঞান দূর করার জন্যই যত কিছু সাধনা আরাধনা। স্থূল মূর্ত্তি অবলম্বনে পূজা করিলে, অতি সহজে অন্তরবাহ্য ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের যুগপৎ অনুশীলনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি থাকিত, তবে ঋষিগণ এদেশে ঐরূপ মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিতেন না। কিন্তু সে অন্য কথা :—

যতক্ষণ এই অন্তর বাহ্য ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ দেবতার সহিত পরিচয়ই হয় না, সুতরাং কাহার পূজা করিবে? “দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ” আবার “জাতে পরিচয়ে দেবে পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি”। দেবতার সহিত পরিচয় হইলে, তখন আর তিনি পূজার আকাঙ্খাই করেন না। সুতরাং “উভয়োরেপি পক্ষয়োঃ পুজাং পশ্যামি দুর্ঘটাং” উভয় পক্ষেই পুজাটী অসম্ভব হইয়া পড়ে। পূজ্য এবং পুজকরূপ ভেদজ্ঞান নিয়া পুজা করিলেই, উহা অজ্ঞানের অধম পুজা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার যিনি প্রাণ, আমার যিনি আমি, তাঁহাকে পুজা করিতেছি—এইরূপ বোধ লইয়া পুজা করিলে,

সে পুজা কখনও ব্যর্থ হয় না। যদিও এইরূপ অভেদে ভেদজ্ঞান লইয়া পূজার আরম্ভ করিলে ক্রমে ভেদজ্ঞান শিথিল হইতে থাকে, পূজার বিঘ্ন হইতে থাকে, বিধি লঙ্ঘন হইতে থাকে ; যদিও তখন শাস্ত্রোক্ত পূজার ক্রমগুলি বিস্মৃত হইতে হয়, ধূপ দিতে গিয়া, ফুল দিয়া বসিতে হয়, তথাপি উহাই পূর্ণ পূজার ফল। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"দেব এবেতি ধিয়া বিস্মৃতে পূজনক্রমে। পূজায়াং জায়তে বিঘ্নঃ পূর্ণপূজাফলং হি তৎ ॥"

এখনও এদেশের কোটি কোটি নর নারী পূজা করিয়া থাকেন, ঐ পূজা যে নিস্ফল হয় ইহা বলিতেছি না। তবে দেখিতে পাওয়া যায়—অনেকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পূজা করিয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য শেষ করার মত যেন পূজাটিও শেষ করিয়া যান ; আর যাঁহারা মাত্র অর্থের লোভে পূজার অভিনয় করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেন এরূপ হয়—কেন পূজা করিয়া জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে পারে না ? ঐ পরিচয়ের অভাব। যাঁহার পূজা করা হয়, তাঁহার সহিত পরিচয়ের অভাব। "তিনি কে ? তাহা ত জানি না, তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন ? তাহাও জানি না, নিতান্ত করিতে হয়, তাই আভ্যাস রক্ষার জন্য পূজা করিয়া যাই" এইরূপ একটা ভাব থাকে বলিয়াই পূজাগুলি আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না। 'পূজাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে পূজাবিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিষদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এদেশের নিত্যক্রিয়া পূজা হোমাদি কর্ম্মকাণ্ড যেন একটা মৃত-কর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মনে হয়—আবার যদি এ দেশের কর্ম্মকাণ্ড উজ্জ্বল জ্ঞান ও পরাভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সঞ্জীব হইয়া উঠে, তবে বুঝি দেশের এই হাহাকার, এই অভাব উৎপীড়ন দূরীভূত হইয়া যায়। একবার ধর্ম্মের নির্ম্মল রসের আস্বাদ পাইলে, লোক আর ধর্ম্মহীন হইতে পারে না। ধর্ম্মহীন না হইলে, সকল সুখই মানুষের সহজলভ্য হয়। এ দায়িত্ব প্রধানতঃ

ব্রাহ্মণগণের উপরই পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ ব্রাহ্মণগণই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, কর্ম্মকাণ্ডকে এখনও বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারাই ঐ প্রাণহীন অস্থিকঙ্কাল-বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ করিয়া, আবার সজীব ও সফলতাময় করিয়া তুলিবেন। আবার তাঁহারা আদর্শ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত ভ্রাতৃবর্গকে আদরে ডাকিয়া কোলে লইবেন, সকলেই ধর্ম্মময় হইবে, সকলেই কর্ম্মময় হইবে। আবার সকল কর্ম্ম ই জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞান আবার পরাভক্তির সুস্নিগ্ধ ধারায় মধুময় হইবে। এ বিশ্বরাজ্য ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হইবে। অসত্য বিদূরিত হইয়া, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই আশায়ই সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ বরাভয় হস্তে মা আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

ঐ দেখ সাধক! দেবতাগণের পূজায় প্রসন্ন হইয়া, মা আমার বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন—"প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান প্রণতান সুরান্"। পূজা করিতে পারিলে,—প্রণত হইতে পারিলেই মা আমার প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভাবিও না—তিনি কেবল দেবতাদিগের পূজা ও প্রণতিতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদের মত ভক্তিহীন শ্রদ্ধাহীন জ্ঞানহীন দুর্ব্বল অবিশ্বাসী সন্তানের পূজা প্রণতিও তিনি পরম আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অবিশ্বাসিযুগেও তিনি প্রকট হন, বরাভয় প্রদানে সন্তানকে আদর করেন। এস জীব! এস সাধক। এস, মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন আমরা সকলে মিলিয়া, মা বলিয়া মায়ের চরণতলে প্রণত হইয়া পড়ি; নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়ই মা আমাদের প্রতিও এইরূপ প্রসন্ন হইবেন।

LIBRARY
No..........
Shri Shri ... BANARAS

দেব্যুবাচ।

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্॥ ২৯॥

দেবা ঊচুঃ।

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে দেবগণ! তোমরা আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর (১)। দেবগণ বলিলেন—ভগবতী কর্ত্তৃক সকলই নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, যেহেতু আমাদের শত্রু মহিষাসুর নিহত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা। ঠিক এইরূপই হয়। মা যখন বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বরপ্রদান করিতে উদ্যত হন, তখন সন্তান বলিয়া উঠে—না মা, কিছুই চাই না! আমাদের কিছুই বাকী নাই! কিছুরই অভাব নাই! পূর্ণ স্বরূপা তুমি আবির্ভূত হইয়াছ, আর আমাদের কিছুই চাহিবার নাই, শুধু তুমি থাক। শুধু চিরদিন এমনই করিয়া আমাদের সম্মুখে থাক। চাহিবার কিছুই ত নাই মা, হৃদয় যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে! অন্তরের অন্তস্থল অন্বেষণ করিয়াও ত কোন অভাব দেখিতে পাই না! "ন কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে"। কিছুইত অবশিষ্ট নাই।

সাধক মাত্রেরই এই অবস্থা হয়। যত কামনা বাসনা নিয়াই মায়ের পূজায় ব্রতী হউক না কেন, মাকে একবার দেখিতে পাইলে, আর কিছুই মনে থাকে না, তখন মনে হয়—সবই পাইয়াছি, আবার চাহিব কি? বালকযোগী ধ্রুবেরও ঠিক এইরূপ অবস্থায়ই হইয়াছিল। রাজ্য কামনায় সাধনা আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু যখন পদ্মপলাশলোচনের সাক্ষাৎ লাভ হইল, তখন বলিলেন—"আমি কাচের অন্বেষণ করিতে গিয়া অমৃত লাভ করিয়াছি, আমার চাহিবার কিছুই নাই প্রভু।"

---

(১) "দদাম্যহমতিপ্রীত্যা" ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোক মূল সংহিতায় নাই। প্রাচীন টীকাকারগণও উহার উল্লেখ করেন নাই।

সাধক। মনে করিও না—এরূপ ঘটনা কদাচিৎ কখনও কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়। তাহা নহে—প্রত্যেকে প্রতিদিন এইরূপ ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ ও পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে পারে। ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। আরে, তিনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুপ্রকট ও সুপ্রসন্ন। ইচ্ছামাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে শুনিতে পাও—দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে তবে ভগবদ্-দর্শন হয়, উহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার। "আমি ভগবান্‌কে যথার্থই চাই" শুধু এইরূপ একটী ইচ্ছার উদ্বোধ করিবার জন্যই দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল কেন—বহু জীবন সাধনার আবশ্যক হয়। যদি কাহারও ঐরূপ ইচ্ছার আভাসও আসিয়া থাকে, তবে সে অচিরেই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু সে অন্য কথা।ঃ—

এই মন্ত্রটীর আর একটি গূঢ় অর্থ আছে। "ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বম্ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে" এস্থলে নঞ্‌টী পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অন্বয় করিলে, উহার অর্থ অন্যরূপ হইয়া যায়। "ভগবত্যা কৃতং কিন্তু সর্ব্বং ন, কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে"। মা। তুমি আমাদের জন্য অনেক করিয়াছ, কিন্তু সকল কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। মহিষাসুর বধে জীবত্বের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। শুম্ভবধ আবশ্যক। তাহা এখনও হয় নাই, তাই দেবতাগণ বলিলেন—"কিঞ্চিদবশিষ্যতে।"

যদি বাপি বরো দেয় স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩১ ॥
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈ র্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎ প্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। হে মহেশ্বরি। তবে যদি একান্তই আমাদিগকে

বর দিবে, তবে এই করিও—যেন সতত আমরা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি, এবং তাহারই ফলে, আমাদের পরমাপদসমূহ যেন দূরীভূত হইয়া যায়। আর যে মানুষ এইরূপ স্তবদ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, হে অমলাননে! হে অম্বিকে! তুমি তাহার প্রতি সতত প্রসন্না থাকিও, এবং জ্ঞান ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ধন ও পুত্রাদি বিষয়ক মঙ্গল বিধান করিও।

ব্যাখ্যা। সন্তান যখন মাকে দেখিতে পায়, তখন আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে, চাহিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না বটে, কিন্তু মা যে সন্তানের অভাব অভিযোগ সকলই জানিতে পারেন। তাঁহার সর্ব্বদর্শি নয়নত্রয়ের অন্তরালে থাকিতে পারে, এমন কিছুই যে কোথাও নাই! তাই মা নিজেই বর গ্রহণ করিবার জন্য সন্তানের হৃদয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্ববিস্মৃত অভাবটী ফুটাইয়া তোলেন। ঠিক এইরূপ হয়। প্রথমদর্শন মাত্রেই সাধকের সকল অভাববোধের বিস্মৃতি ঘটে; কারণ, মা যে আমার পূর্ণতমা! তারপর যখন ধীরে ধীরে সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে—একদিক দিয়া মা যখন অপ্রকট হইতে থাকেন, অন্যদিক দিয়া তখন চকিতের ন্যায় অভাবের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, এই অভাববোধ হওয়ার নামই বরপ্রার্থনা। মাকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যদি কোনরূপ অভাববোধ জাগে, তবে বুঝিতে হইবে—অচিরাৎ সে অভাব বিদূরিত হইবে। মা এমনই সন্তানস্নেহে মুগ্ধা যে, মুখে কিছু না বলিলেও, সন্তানের অন্তরের লুক্কায়িত অভাববোধ দূর করিয়া থাকেন। নির্ব্বিচারে অভীষ্ট বর প্রদানে ধন্য করিয়া থাকেন। আর আমরা এমন অকৃতজ্ঞ এমন সংকীর্ণ হৃদয় সন্তান যে, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্যা, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও অতি অকিঞ্চিৎকর অভাব অভিযোগের ফর্দ্দ উপস্থিত করি। মাগো কতদিনে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা সম্যক্ বিদূরিত হইবে?

এস সাধক! আমরাও দেবতাগণের ন্যায় বলি—হে মহেশ্বরি!

আমরা যেন সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করিতে পারি এবং তুমিও আমাদিগের পরমাপদ দূর করিও।

"পরমাপদ" শব্দে আমরা পরমের আপদ বুঝিয়া লইব অর্থাৎ আমাদের পরমস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পক্ষে যাহা অন্তরায় তাহাই যথার্থ পরমাপদ। "আমি সর্ব্বদা পরমাত্মরূপে অবস্থান করিব" এই ব্রাহ্মী স্থিতির প্রতিকূলে যত কিছু বিঘ্ন আছে, তাহাই পরমাপদ। এক কথায় মাকে ভুলিয়া থাকাই পরমাপদ। যথার্থ ই আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব বোধ হয় আর কিছুই নাই। মা! তুমি এত নিকটে এত প্রত্যক্ষ, তবু আমরা তোমাকে ভুলিয়া জগতের ধূলি লইয়া চরিতার্থ হই, আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বিপদ্ আর কি থাকিতে পারে? তাই প্রার্থনা করি মা! "সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ"! তোমায় যেন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে পারি, আর তাহারই ফলে—আমাদের পর-স্বরূপের বিঘ্ননিচয় যেন প্রতিহত হইয়া যায়।

আর একটি কথা—যদি সত্য সত্যই মা! "অস্মৎ প্রসন্না" আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে সেই প্রসন্নতার ফল এই বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ুক! মা! তোমার এইরূপ হাস্যময় অমলানন, এইরূপ স্নেহময়ী অম্বিকা মূর্ত্তি, জগতের প্রত্যেকেই দেখিয়া ধন্য হউক। জগতে যাহারা সাধারণের চক্ষুতে দুরাচার বলিয়া পরিচিত, তাহারাও এইরূপ স্তবস্তুতির সাহায্যে তোমার নিত্যপ্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হউক। এবং তাহারই ফলে—ধনদারাদিরূপ ভোগ ও জ্ঞানৈশ্বর্য্যরূপ অপবর্গলাভে ধন্য হইয়া যাউক। যদিও জীব-জগৎ মর্ত্ত্য—মরণধর্ম্মশীল, তথাপি তোমারই কৃপায় অমরত্বের আস্বাদ লাভ করুক। মাগো! তুমি এমনই করিয়া প্রতিজীবহৃদয়ে ভোগ-মোক্ষ-বিধায়িনী নিত্যপ্রসন্না অম্বিকা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। জগৎ হইতে দুঃখের রোদন চিরতরে অপসৃত হউক!

ওগো চাহিয়া দেখ—তোমার জীবসন্তানগণ মোক্ষ ত দূরের কথা, ভোগ করিতেই জানে না। কেবল ভোগের আশা ও সঞ্চয়

করিয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে বিনাশের চিন্তায়, অভাবের তাড়নায় উৎপীড়িত হইতেছে। পর্ণকুটিরবাসী কদন্নসেবী ভিক্ষুক হইতে, রাজপ্রাসাদবাসী পলান্নপুষ্ট ধনী পর্য্যন্ত সকলেই অভাবগ্রস্ত। কেহই পূর্ণ প্রাণে সরল হৃদয়ে বিষয় ভোগের যে পরিতৃপ্তি, তাহা পাইতেছে না। শুধু উপভোগ করিয়া যায়—ভোগের সমীপস্থ হয় মাত্র। প্রাণপাত পরিশ্রমে ভোগ্য সম্ভার সমাহরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে, ভোগ করিতেই জানে না। তাই বলি মা! তুমি একবার ভোগময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াও, সন্তানগণ প্রাণ ভরিয়া একবার সত্যজ্ঞানে মাতৃস্নেহরূপ বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হউক, এ বিশ্বের দারুণ ক্ষুধার নিবৃত্তি হউক। তখন তুমি অনায়াসে জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমন্বিত অপবর্গ-প্রদায়িনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবকে অমরত্বের আস্বাদ ভোগ করাইবে।

মাগো! আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রাণে চাহিবার কিছুই নাই! চাহিবার কিছু বাকীও রাখ নাই। শুধু তোর চরণে প্রণত হইয়া, সকাতরে প্রার্থনা করি—'হউক মাগো বিশ্বের মঙ্গল!'

ঋষিরুবাচ

ইতি প্রসাদিতা দেবৈ র্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভুবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে নৃপ সুরথ! দেবতাগণ এইরূপে জগতের এবং আপনাদিগের জন্য দেবীকে প্রসন্না করিলে, ভদ্রকালী দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে ভূপ! পুরাকালে দেবতাবৃন্দের শরীর হইতে ত্রিলোকমঙ্গলবিধায়িনী দেবী যেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট এই বলা হইল।

ব্যাখ্যা। জগতের মঙ্গলের জন্য অনাদিকাল হইতে দেবতাবৃন্দ এইরূপে দেবীর প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে নানারূপ সাধনা—স্তব স্তুতি করিয়া থাকেন। জগতের মঙ্গল হইলেই দেবতাগণের আত্মমঙ্গল সাধিত হয়। আত্মাই ত জগদাকারে প্রকাশিত হইয়া নিয়ত ত্রিতাপ দুঃখ ভোগের কল্পিত অভিনয় করিতেছে। এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই আত্মারই প্রীতিসাধন বিধেয়। আত্মা—মা যে আমার নিত্যপূর্ণা নিত্যতৃপ্তা! তাহাতে যে কোন দুঃখেরই সংস্পর্শ নাই, ইহা বুঝিতে পারিলেই আত্মপ্রীতি লাভ হয়। এবং তাহারই ফলে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই, দেবতাগণের চেষ্টায় মঙ্গলময়ী ভদ্রকালী মা প্রসন্না হইলেন। দেবতাবৃন্দ বিশ্বমঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। মা "তথাস্তু" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

জীব! সাধক! ইহা কল্পনা নহে উপাখ্যান নহে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। যেরূপ ব্যষ্টীতে প্রতিজীব-হৃদয়ে এইরূপ সংঘটন হয়, ঠিক সেইরূপই সমষ্টিতেও দেবতাবৃন্দ জগতের মঙ্গলের জন্য—মাতৃ-প্রসন্নতার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন। যদি কাহারও হৃদয়ে এখনও ঐরূপ সংঘটন না হইয়া থাকে, অথচ ঐরূপ সংঘটন দেখিবার জন্য প্রাণ একান্ত লালায়িত হয়, তবে সরল প্রাণে অন্বেষণ কর। মায়ের নিকট প্রার্থনা কর। সে মহাসম্মিলনক্ষেত্রের সন্ধান পাইবে। সে দেবলীলায় সহচর হইয়া জীবনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? কিন্তু সে অন্য কথা :—

বিজ্ঞানময় গুরু মেধস এইবার রাজা সুরথকে বলিলেন—হে নৃপ! তুমি মহামায়ার উৎপত্তি কার্য্য ও স্বভাব ইত্যাদি বিবরণ শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলে, পূর্ব্বে মধুকৈটভনিধন প্রসঙ্গে তাঁহার তামসী মহাকালী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আর এইবার সেই মহামায়া কিরূপে দেবতাবৃন্দের শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া রাজসী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিতে ত্রিজগতে মঙ্গল বিধান করেন, কিরূপে জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা দেখিতে পাইলে; কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই :—

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্ট দৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৩৫ ॥
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামিতে॥ ৩৬ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিস্তুতিঃ।

অনুবাদ। পুনরায় সেই মহামায়া শুম্ভ নিশুম্ভ এবং অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের নিধনপূর্ব্বক লোকরক্ষা ও দেবতাবৃন্দের উপকারের জন্য যেরূপ গৌরীদেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে তোমাকে বলিতেছি। তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিকমন্বন্তরীয় উপাখ্যানে
দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে শক্রাদিস্তুতি সমাপ্ত।

ব্যখ্যা। আবার মহামায়াকে গৌরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে হইবে। এখনও জীবের রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় নাই, এখনও জীব সম্যক্ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এখনও দুষ্ট অসুর শুম্ভ নিশুম্ভ এবং তৎসহচরগণ জীবিত, এখনও দেবকুল সম্যক্রূপে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। এখনও লোকরক্ষা বা ধর্ম্মরাজ্য পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাই মাকে আবার আসিতে হইবে। আবার গৌরীরূপে—মহেশ্বরের অঙ্কস্থা সৌম্যা শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইতে হইবে। এস বৎস সুরথ! এস জীব! মায়ের সেই গৌরীমূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও। হৃদয়-আসন আরও পবিত্র, আরও বিধৌত কর। মা আসিতেছেন, দেখিও যেন মলিন আসনে উপবেশন করাইও না। দেখিও যেন মায়ের আমার সেই ভাবাতীত নির্ম্মল বপুকে সংস্কারের ছিন্ন বসন পরাইতে যাইও না। ধীরে অবহিতচিত্তে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা কর। সত্যই মা আসিতেছেন।

মনোময়গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে—নামরূপের মোহ কাটিয়া গিয়াছে,

নামরূপ যে সত্যই মা ব্যতীত অন্য কেহ নহে, ইহা অনুভব করিয়াছ—বুঝিতে পারিয়াছ। সুতরাং নিত্য নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার উৎপীড়ন দূরীভূত হইয়াছে—সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এইবার প্রাণময় গ্রন্থিও ছিন্ন হইল। একমাত্র প্রাণই যে নাম রূপের আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে। প্রাণ বলিলে এখন আর একটুখানি সঙ্কীর্ণ অব্যক্ত চৈতন্যের আভাসমাত্র বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বব্যাপী মায়ের প্রাণ—গুরুর প্রাণই যে তোমার প্রাণরূপে অভিব্যক্ত, এইবার ইহা অনুভব করিতে পারিলে। তোমার বিষ্ণুগ্রন্থি বা প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইল। বিষয়মাত্রই যে প্রাণের মূর্ত্তি, ইহা দেখিতে পাইলে। এখন প্রাণ বলিলেই বিশ্বময় চিৎসত্তা অনুভব করিতে পার। অতএব নাম রূপের প্রতি—বিষয়ের প্রতি যে একটা বিশেষ মমত্ববোধ—অনুরাগ কিংবা বিদ্বেষ, তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারগুলি এইবার দগ্ধ-বীজবৎ হইয়া পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদন বা ফলপ্রসব করিবার সামর্থ্যহীন হইয়াছে। সাধক! তুমি একদিনে প্রাণে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে।

এইবার আমরা জ্ঞানময়গ্রন্থির সমীপস্থ হইব। ইহাই জীবমহীরূহের শেষ বন্ধন। মায়ের কৃপায় এইটি বিচ্ছিন্ন হইলেই অজ্ঞান অন্ধকার সম্যক্ বিদূরিত হইবে, জীবের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সুরথ! তুমি মা বলিয়া আত্মসমর্পণ-যোগের সাহায্যে, মুক্তি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ! দুইটি তরঙ্গ তোমার উপর দিয়া চলিয়া গেল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি যে অভিমান ছিল, তাহা দূরীভূত হইল। আর একটীমাত্র অবশিষ্ট আছে। মায়ের কৃপায় তহোও অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিবে। তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এস সাধক! এস জীব! সকলে সমবেত কণ্ঠে মা বলিয়া অগ্রসর হই। যিনি আমাদিগকে এই দুর্জ্জয় অসুরের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ করিয়া, স্নেহময় বক্ষে ধরিয়া আনন্দ-মন্দিরে লইয়া যাইতেছেন,

এস তাঁহার চরণে প্রণত হই। প্রণাম্ ব্যতীত আমাদের আর কি আছে। এস, অভিমানের উচ্চশির সম্যক্ অবনত করিয়া বলি—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্যব্যাখ্যায় বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ সমাপ্ত।